পিনাকী ভাদুড়ী

বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি. কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

অবকাশে নিযুক্ত আছি

রসিকেষু

অনেক বাঙালি কিশোরের মত কবিতা লিখে সুরু করলেও পিনাকী ভাদুড়ী গদ্য রচনাতেই মনোনিবেশ করেছেন। নানাবিষয়ে মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। তার অনেকটাই রবীন্দ্র-বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গবেষণাই ছিল তাঁর থিসিস্।

তবে একইসঙ্গে রসরচনা লিখেও তিনি সুখ পান। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রসরচনার এই নির্বাচিত সংকলন পড়ে যদি পাঠকেরাও সুখ পান, তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে স্বস্তির কারণ হতে পারবে।

বিয়ের পঁচিশ বছর

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষস্য ভাগ্যং নির্ধারিত হয়ে যায়। বিয়ের পঁচিশ বছর পরে বসে ভাবলে মনে হয় যে শেষ সুখের দিনটি চলে গেছে পঁচিশ বছর আগে, তার পর থেকে গৃহপালিত বন্দী জীবন চলেছে। পরশুরামের লেখা গল্পে বংশলোচনবাবু ফাঁক পেলেই যে বইটি পড়তেন, সেটি হলো- How to be happy though married. আমরা দুই বন্ধুতে কথা বলছিলাম এ নিয়ে। দুজনেই প্রায় একই সময়ে বিয়ে করেছিলাম, একজন প্রেম করে, অন্যজন সম্বন্ধ করে। দুজনেরই এখন স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে যাবার মুখে। আমরা দুই স্বামীই এখন আসামীর কাঠগড়ায়। নিজের বিয়ে করা পুরুষটি ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত পুরুষই বউকে খুশি করতে পারে। এ বিষয়ে বিড়লা এবং রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও কোন তফাৎ হবার কথা নয়। বিড়লার বউ একথা ভাবতেই পারেন যে তাঁর স্বামী টাকা ছাড়া কিছু চেনে না, আর রবীন্দ্রনাথের বউ বলতে পারতেন যে তাঁর স্বামী তো শুধু কবিতাই লেখে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছেন। রাত করে ফিরে দেখলেন ভাত ঠাণ্ডা, বউ গরম। এটা আমাদের সবার সঙ্গেই মিলবে।

আমার বউ এ বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল পাতানো সম্পর্ক, এ কখনোই সারাজীবন টিঁকবে না। তবু তাই নিয়েই চালিয়ে গেলাম। অফিসে বর্বর এবং বাড়িতে বর্বরা এরাই বরাবর আমার জীবন বিশ বছরের বেশি বিষ করে দিয়েছে। কোনদিনই বউ আমার বশ হল না, মতান্তর দাঁড়াল মনান্তরে। আমার যখন শীত করে, বউয়ের তখন পাখা চালাবার দরকার হয়। আবার যদি আমি পাখা চালাতে চাই, বউ তখন এমন আপত্তি করে যে পেরে উঠি না। আমি যা খেতে ভালবাসি, বউ ঠিক সেইটিই দুচক্ষে দেখতে পারে না। আমি এবং আমার বন্ধু উভয়ের চালচলন বিপরীত। আমি সন্ধ্যার পরেই বাড়ি ফিরি, আমার বন্ধু তখন বেরোয়। আমার বউ বলে, ঘাড়ের ওপর বসে থাকো কেন, কোথাও যেতে পারো না। দেখো তো তোমার বন্ধুকে, কেমন বাইরে বাইরেই থাকে। ওদিকে বন্ধুর স্ত্রী বলে রাত করে কোথায় ঘোরো। বাড়িতে থেকে একটু

সাহায্যও তো করতে পারো। আমার এক জ্যাঠাইমা বলতেন, পুরুষমানুষ বাইরে থাকবে, দরকার মতো টাকা পাঠাবে ব্যস।

বিয়ের পর বছরখানেক বেশ কেটেছিল। প্রথম বার্ষিকীতে বউকে শাড়ি দিলাম, বন্ধুদের মিষ্টি খাওয়ালাম। পরের বছর থেকেই সেসব উঠে গেল। এখন বিয়ের তারিখে দুজনেই খুব সংযত হয়ে থাকি যাতে ঐদিনটা অন্তত কোন ঝগড়াঝাটি না হয়। গোমড়ামুখেই থাকি, কেউ এসে পড়লে হাসিমুখ দেখাই, আমার কোন মজার কথায় বউ হাসেও তখন। অর্থাৎ ধোঁকার টাটি বজায় রাখি।

আমার বউয়ের মতে আমার মাত্র তিনটে দোষ—অকম্মা, নির্বোধ এবং স্বার্থপর। আমি এসবের কোন জবাব দিই না। কারণ এর জবাব দিতে গেলে রাগতে হয়, আর আমি যদি রেগে যাই তবে বউ এমন ক্ষেপে যায় যে ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে যেতে হয়। একবার বউকে কি একটা অনুযোগ করেছিলাম, করেই বুঝলাম ভুল করেছি। কারণ বউ এমন আপসোতে লাগল যে ভয় পেয়ে গেলাম। আমাকে নাকি যথেষ্ট যত্নই করা হয়, এতেও যদি মন না ওঠে তবে আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। সে প্রায় নাটকীয় অভিসম্পাতের দৃশ্য।

আমার সেই লোকটির কথা মনে হয়, যে জাঁক করে বলেছিল, ঝগড়ার শেষে রোজই তার বউ মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এইটুক বলেই সে ভেবেছিল যে বাহবা পাবে, কিন্তু সবাই জানতে চাইল, যে বউ কি বলেছিল তখন। সকলের চাপাচাপি এড়াতে না পেরে ইতঃস্তত করে তাকে বলতেই হল যে বউ হেঁকে বলেছিল—খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আয় মুখপোড়া।

দেখেশুনে, অনেক খবরাখবর করে, শাঁখায় সিঁদুরে যে মেয়েটিকে ঘরে এনে তুললেন, সে কিভাবে অপনার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ওঠে, বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা মেলে না। আমি একজনকে দেখেছি স্ত্রী ত্রিসীমানায় না থাকলেও সে চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খেতে পারে না, কারণ তার স্ত্রীর ওটা পছন্দ নয়।

আরেকজনকে দেখেছি তার স্ত্রী তাকে কখনো একলা ছাড়ে না, লোকটি বলেছিল যে নরকে গিয়েও বোধহয় রেহাই মিলবে না। আমার সেই ভদ্রলোকের কথা মনে হয় যাঁকে তাঁর ছেলে প্রশ্ন করেছিল—বাবা, একটা বিয়েতে কত খরচ হয়? জবাবে তিনি বলেছিলেন বলতে পারি না। আমি তো এখনো খরচ করে যাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে আমার দেখা একটি বিজ্ঞাপনের কথা বলি। পলাতকা স্ত্রীর স্বামী কাগজে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি আমার বউকে নিয়ে পালিয়েছেন, তাঁকে আমি খরচ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি তিনি বউকে

ফেরৎ দিতে চান, তাহলে আমি তাঁর নামে অপহরণের মামলা করব। বোধহয় এইজন্যই এক স্ত্রী যখন তাঁর স্বামীর কাছে আহ্লাদ করে জানতে চেয়েছিলেন যে কখন আমাকে তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে, তখন স্বামী বলেছিলেন যখন তুমি বাপের বাড়ি থাকো। স্বর্গরাজ্যেও বিবাহিতদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি যখন স্বর্গের দরজায় টোকা দিয়েছে, তখন দরজা খুলে তার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে সে বিয়ে করেছে কিনা। সে হ্যাঁ বলায়, প্রশ্নকর্তা স্বীকার করলেন, তবে তো তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ
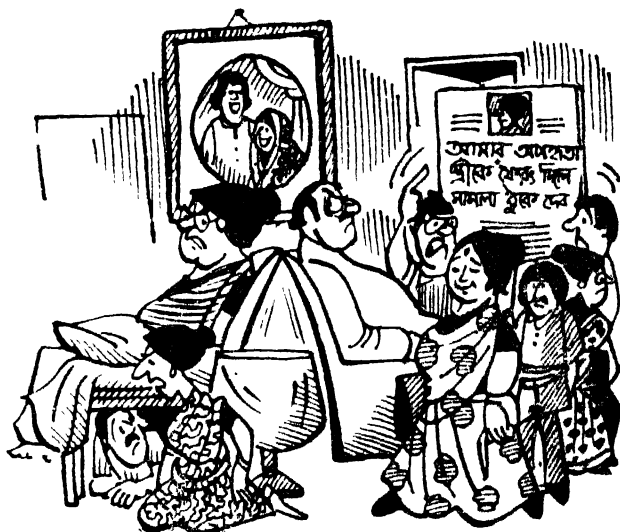
এসো স্বর্গে এসো। কিন্তু তার পরে যে লোকটি এসেছিল, সে যখন বলেছিল যে সে দুবার বিয়ে করেছে, তখন তার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলা হয়েছে যে স্বর্গে কোনো মূর্খের স্থান নেই।

আমি অনেকবার ভেবেছি স্ত্রীর মোকাবিলা কিভাবে করা যায়। সিলভার জুবিলিতে এসে কবুল করি যে বিয়ের সিলভার লাইনিং হল শ্যালিকা। স্ত্রীর টোটকা হল স্ত্রীর বোন। বিয়ের সংকীর্ণতা সে কাটিয়ে দিতে পারে। যে মেয়ের বোন নেই, তাকে বিয়ে করা আর বনে যাওয়া একই। বনে বাঘ, বিয়েতে বাঘিনী। শ্যালিকা অবধারিত আপনার অনুরাগিনী। আপনাকে দিয়েই সে তার বয়ফ্রেণ্ডের মহড়াটা দিয়ে নেয়। দিদির হাতে জামাইবাবুর দুর্দশা দেখে তার করুণাই আপনার জীবনকে মরু হতে দেবে না। কখনো সে মরীচিকা, কখনো মরূদ্যান। আশায়, তামাশায় আপনাকে জুইয়ে রাখবে ঐ শ্যালিকা। বৌ নানা খোঁটা দেবে, বলবে তোমাকে নাচিয়ে

হাসাহাসি করছে, বুঝছ না! কিন্তু আপনার তাতেই সুখ। পুরনো বউয়ের জন্য নতুন শাড়ি কেনার কোনো মানে হয় না, বরং শালীকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলে ভাল লাগবে। অবশ্য এসব করেও আপনি বৌকে শেষপর্যন্ত টেক্কা দিতে পারবেন না। কারণ তখন বৌ বলবে, সেই তো আমার বোনের কাছেই যেতে হল।

শ্যালিকা অবশ্য তার দিদির কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। সে সুন্দরী এবং সুমিষ্টভাষিণী। আপনাকে আবদেরে গলায় বলবে—চলুন আপনার বিয়ের তারিখে সবাই মিলে হোটেলে যাই। বিষম লাগবে গলায়, তবু এই অসম খরচে দমকা নেমে পড়তে হবে। শুধু শালীকে নিয়ে গেলে যা হতে পারত মহার্ঘ, সবাইকে নিয়ে যেতে হলে তাতেই টান পড়বে মহার্ঘ ভাতায়। সকলেই অতিথি, আপনি গৃহস্থ। আর সকলে নারায়ণ, আপনার কপালে নারায়ণসেবা। সুকুমার রায়ও বলে গেছেন—আমি আছি, গিন্নী আছেন—গিন্নীর বেলায় সম্ভ্রমসূচক 'আছেন', উনি আছেন বলেই তো আমি আছি।

বিয়ের পঁচিশ বছর এইভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল ডিভোর্সটা করে ফেললে কেমন হয়। কিন্তু শাদির পয়লা রাতে বেড়াল মারা হয়নি, এখন ডিভোর্সের হুমকিতেও কাজ হবে না। হয় মোটা খোরপোষ বার করে নেবে, নয়তো বলবে, ডিভোর্স দেখাতে এসেছ? কে তোমায় ডিভোর্স দের দেখি একবার। তোমার বুকে বসেই দাড়ি ওপড়াব।

সঙ্গিনী নিয়ে সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছি। অবশ্য আমার আর এক যুগলের কথা মনে পড়ে, তাঁরা আমাদেরও টেক্কা দিয়েছেন। এখন তাঁরা উভয়েই গতায়ু। পরপারে তাঁদের দেখা হয়েছে কিনা জানি না। সেই মহিলা তাঁর স্বামীর নামে অভিযোগ করে প্রবাসী পুত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি অবিকল উদ্ধৃত করি—

'তোমার বাবার জন্য আমার শান্তি নাই। সর্বসময়ে পিছনে লাগিয়া থাকে। কোথায় যাই, কি করি, কাহার সহিত কথা বলি, একেবারে গোয়েন্দার মতো নজর করে। ধমক দিয়া সরাইতে হয়।

অবশ্য কথাও শোনে। এই চিঠি সেই লিখিয়া দিতেছে।'

স্ত্রীর মুখ থেকে চিঠিটির ডিকটেশন নেবার সময়ে স্বামী কি ভেবেছিলেন তা কোনদিনই জানা যাবে না। তবে, আনুগত্যের এই ক্লাসিক উদাহরণটি উপহার দেবার জন্য এঁদের উভয়কে জানাই কৃতজ্ঞতা।

স্বামী এবং প্রেমিক

মেয়েদের জীবনের ট্র্যাজেডি হল তার প্রেমিক থাকে অতীতে আর স্বামী রয়েছে বর্তমানে। যে কোনো প্রেমিককে বিয়ে করলেই সে স্বামী হয়ে গেল এবং তখন আর প্রেমিককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রেম করেছ যার সঙ্গে, তার সঙ্গে যেন বিয়ে না হয়, এই সাবধানবাণী অনেকে উচ্চারণ করে গিয়েছেন। বিয়ে করেছ যাকে, তার সঙ্গে প্রেম করো না, ঠিক একথা স্পষ্ট করে না বললেও এটা ঠিকই, যেমন প্রেম হলেই বিয়ে হয় না, তেমনি বিয়ে হলেই প্রেম হয় না।

সেই প্রেমিক-প্রেমিকাকে স্মরণ করি, যারা স্বামী-স্ত্রী হয়েছিল। তাদের বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হবার সময়ে কী করা যায় এ নিয়ে আলোচনায় বসেছিল তারা। মেয়েটি বলল, 'ভালো করে মুরগীর রোস্ট বানাব, খাওয়াব সবাইকে।' ছেলেটি বলল, 'পঁচিশ বছর আগে আমরা একটা ভুল করেছি, তার মাশুল দেবে ঐ নিরীহ মুরগীগুলো? এদের প্রাণ নেওয়া কি ঠিক হবে?'

আর একটি গল্প। স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেড়াতে একটি নির্জন ঝোপের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ঝোপের আড়ালে দু'টি ছেলেমেয়ে বসে কথা বলছে। তাদের কোনো কিছু জানা নেই, কেউ তাদের দেখছে বা তাদের কথা শুনছে সে সব তারা খেয়ালই করছে না। এই যুগল সেসব শুনতে পাচ্ছে না। স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'এই তুমি ওদের সাবধান করে দাও। মনে হচ্ছে ছেলেটি বিয়ের প্রস্তাব করবে এখনই।' স্বামী রাজি হল না, 'আমাকে কে সাবধান করে দিয়েছিল?'

প্রেমিককে বিয়ে করার পর প্রেমিকা দেখতে পেল যে স্বামী হিসেবে তার প্রেমিক বড্ড রুক্ষ। সে একদিন বলে ফেলল স্বামীকে, 'তোমার এমন স্বভাব তা তো আমি বুঝতে পারিনি। মা আমাকে কতবার বারণ করেছিল, তখন শুনিনি।' স্বামী অবাক হয়ে বলল, 'তোমার মা তাহলে এ বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন। জানতাম না তো, ওঁকে আমি ভুল বুঝেছিলাম দেখছি।' অর্থাৎ স্ত্রীর মতো স্বামীও হতাশ।

সোজা কথায়, যখন প্রেমিক থাকে, তখন ছেলেটি কেমন সেজেগুজে রোজ

দেখা করত মেয়েটির সঙ্গে। গরমকালে স্টাইলিশ শার্ট-প্যান্ট, শীতকালে স্যুট অথবা পাঞ্জাবির ওপরে গরম শাল। নিখুঁত দাড়ি কামানো। রেস্তোরাঁয় চা-পান। বিয়ের পরেই তার খালি গা দেখা যেতে লাগল সারাদিন। সে কী জীর্ণ, সে কী শীর্ণ। চা পানের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। বাড়ির দমবন্ধ করা রান্নাঘরে চা এখন নিজেকেই বানাতে হয়। এই চা কি চাওয়া যায়? বরং চাপান-উতোর চলে সারাদিন। স্বামী রোজ দাড়িও কামায় না। টাকাও যে বেশ কামায়, এমনও বলা যায় না। এরই সঙ্গে এতদিন ঘুরেছি? স্বপ্ন দেখেছি একে নিয়ে? প্রেমে পড়ে মনে হচ্ছে কাদায় পড়েছি। প্রেমে
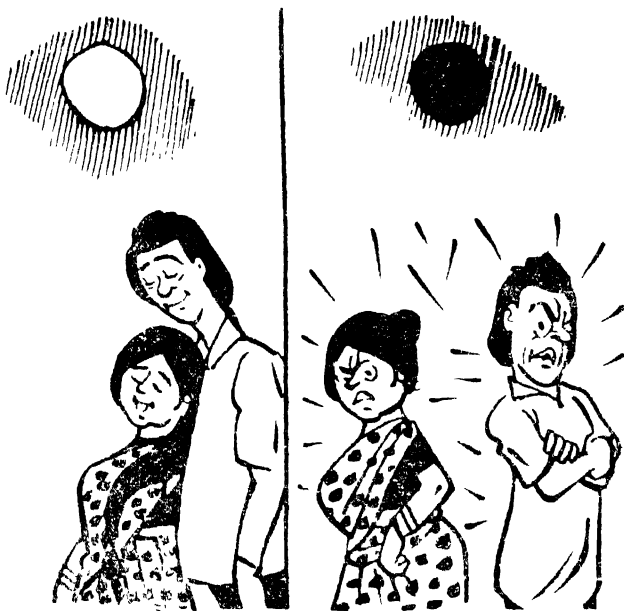
তাই বিয়ের সূর্যোদয়, কিন্তু বিয়েতে প্রেমের সূর্যাস্ত। যা নিয়ে এককালে অভিমান করত মেয়েটি, আজ তাই নিয়ে করে অভিযোগ। স্বামী আর মান ভাঙায় না। বরং মেয়েটির দোষ খুঁজে খুঁজে ভ্যাঙায়। যাকে প্রেমিক হিসেবে মনে হতো ঝকঝকে স্মার্ট, কেমন বুদ্ধিমান, স্বামী হিসেবে তার মতো নির্বোধ আর চোখে পড়ে না। এমন নির্বোধ হয়েও কী করে সে পৃথিবীতে দিন কাটাচ্ছে, এইটে ভেবেই হতবুদ্ধি হয়ে যায় তার স্ত্রী। সে নিজেও খেয়াল করে না যে সেও আর প্রেমিকা নেই, সে এখন যে কোনো একজন স্ত্রী মাত্র।

যারা প্রেম না করে বিয়ে করে, তারাও প্রেম করতে চায়। স্বামীকেই বানাতে চায় প্রেমিক। তার পাশে শুয়েই তাকে স্বপ্ন দেখে। এই ঘোর কেটে যায়, এসে পড়ে ঘোর দুর্দিন। সে দুর্দিন শুধু অভাবের নয়, স্বভাবের। দু'জনের স্বভাবের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মহাযুদ্ধের উপাদান। কখন কে ঘান ফেলবে আর খান খান হয়ে যাবে সংসারের সাজানো সংটুকু, তা কেউ বলতে পারে না। অথবা সকলেই বলতে পারে। বলে না। কারণ বলে কোনো লাভ নেই। বিয়ে যখন হয়েছে, তখনই তো কুরুক্ষেত্র প্রস্তুত হতে চলেছে। বিয়ের সময়ে যখন সাত পাক ঘুরলো বউ, তখন হঠাৎ ঝপাং করে শব্দ হল একটা। কী হল? মেয়ে জলে পড়ল।

তবু প্রেমে পড়ে বিয়ে করার ইচ্ছে কম নয়। অথবা বিয়ে করে প্রেম প্রেম খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও থাকে সকলের। প্রেম করলে অভিভাবক বা সমাজের রক্তচক্ষু কেমন অগ্রাহ্য করেছে মেয়েটি, এখন বিয়েটা অগ্রাহ্য করলে তো মুখ থাকে না। যাকে ভালবেসেছি, সদ্য বিয়ের পরই সে তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে। ভুল হয়েছে, বুঝতে পারছে মেয়েটি। একে না বিয়ে করে অমুককে বিয়ে করলেই হতো। আহা, এখনো সে কেমন ছলছল চোখে তাকায়। মেয়েটি বোঝেনি, অমুককে বিয়ে করলে নিজেরই চোখ শেষ পর্যন্ত ছলছল করে উঠত। কারণ ঐ ছলছলানি তো ছলনা। যাকেই বিয়ে করা গেছে, অন্য কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধলেও এ-ই হতো। গোলমালটা তো ব্যক্তিটি নিয়ে নয়, গোলমাল ঐ বিয়ে ব্যাপারটাই। এটা বুঝতে গেলে অবশ্য কিছুকাল বিবাহিত হয়ে দেখতে হয়, কিন্তু তার পরে আর অবিবাহিত তো পুনরায় হওয়া যায় না। ডিভোর্স করলেও না। বিবাহবিচ্ছেদ আপনি জেদ করে করতে পারেন, তাতে আপনাকে কেউ কুমারী বলবে না। কুমারী হবার রহস্য আর ফিরে আসবে না আপনার মধ্যে। তবে ডিভোর্সেও একটা গ্ল্যামার আছে। ডিভোর্সী শুনলেই দেখবেন অনেকে ঘেঁষে বসবে আপনার কাছে। ডিভোর্স করা পুরুষকে লোকে কাপুরুষ ভাবে। মনে করে, ওর বউ পালিয়েছে। মেয়েদের বেলায় কিন্তু উল্টো। সে যেন ইবসেনের নোরা। এই ইনসেন দুনিয়ায় সে একজন সেন্ উওম্যান। স্ত্রীর পত্রের মৃণাল যেমন। দেখবেন তখন তাকে বিয়ে করতে চাইছে আরো অনেকে। আবার বিয়ের ফাঁদে যদি মেয়েটি পা দেয়, তবে তার সর্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল, তা পুরো হবে। কারণ তাকে যারা বিয়ে করতে আসবে তারা কেউ সার্থক প্রেমিক নয়, তারাও সবাই ব্যর্থ স্বামী। আসল প্রেমিক কখনো বিয়ে করে না, কারণ বিয়ে এবং প্রেম ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া, দু'জনের সম্পর্ক কর্ণ আর অর্জুনের মতো। হিংসার আকারে দু'জনে টানছে

দু'জনকে। প্রেম হলেই। বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে ওঠে সবাই, আর বিয়ে হলেই প্রেম শুধু ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে তুলে রাখতে হয়। সব স্বামী-স্ত্রী বিয়ের পরে স্টুডিওতে গিয়ে হাসি হাসিমুখে ছবি তোলে, পরে দু'জনেরই গলায় ফাঁসি লেগে যায়। প্রেম যদি হয় রেসের ঘোড়া, বিয়ে তবে ছ্যাকরা গাড়ি।

রেস যেমন সবাই খেলে, কিন্তু কেউ জেতে না, প্রেম ব্যাপারটাও তাই। রেস খেলতে গেলে জ্যাকপটের শেষ বাজিতেই সবাই চোট খায়, প্রেম করেও বিয়ের আসরেই হোঁচট খেয়ে পড়ে সকলে। এক প্রেম থেকে অন্য প্রেম, প্রেম এতেই অনন্য। প্রেম বরণীয় এবং স্মরণীয় হতে পারে, বিয়ে কিন্তু অবিস্মরণীয়। একে ভোলা যায় না। কাঁটার মতো বিঁধে থাকে গলায়। অস্বস্তি যায় না কিছুতে। যেখানে আপনি বরের পাশে শুয়েও পুরনো প্রেমকে চুপি চুপি স্মরণ করতে পারেন এবং তাতে তৃপ্তি পান, সেখানে যদি ঐ প্রেমিকই হতো স্বামী, তবে তাকে আলাদা করে মনে করতে হতো না, সর্বদাই সে জ্বালা ধরিয়ে রাখত বুকে। দু'জনের দিল্ কখনোই আর দিলরুবা হয়ে বাজত না।

যদি আপনি বিয়ের বাইরে বিয়ের চেয়ে বড়ো কাউকে আবিষ্কার করতে পারেন, তবেই এর সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। স্বামীর বন্ধু বা বন্ধুর স্বামী, অমুকদা বা তমুকবাবু—এদের কারো সঙ্গে যদি একটা স্বতন্ত্র সখ্য গড়ে নিতে পারেন, তবে আপনার ঘরে আর একটা বড়ো জানলা খুলে গেল। বিয়ের থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিচ্ছেদ নিয়ে আরেকটা নিকা করতে যাওয়াটা ন্যাকামি না হলেও, বোকামি হয়ে দাঁড়াবে। বরং বিয়ের চৌহদ্দির বাইরে এমন কাউকে খুঁজে নিন, যে আপনাকে আকাশের কী রং তা বলে দেবে।

স্বামী এবং প্রেমিক, দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে দু'টিকে রেখেই যদি আপনি জীবনের দাঁড়ি টানতে চান, তাহলে কথা দিচ্ছি, আপনার পাল্লায় পড়তে আমি রাজি আছি।

বৌয়ের বদলে প্রেমিকা

সেদিন বউয়ের সংগে জোর চটাচটি হয়ে গেল। একপাটি চটি নিয়েই হল। বিয়েবাড়ি থেকে যখন ফিরলাম, তখন আবিষ্কার করা গেল যে আমার একপাটি জুতো বদল হয়ে গিয়েছে। একপাটি আমার, আর একপাটি একটি লেডিজ চটি। দেখেই হেসে ফেলেছিলাম। সেইটেই কাল হল। বউ লেডিজ চটির পাটি দেখে বলল, 'হাসিতে যে দাঁত কপাটি লেগে গেল। কার চটি ওটা?' আমি বললাম, 'কার আমি জানব কি করে?' বউ ততোধিক ঝাঁঝিয়ে বলল, 'তা জানবে কেন? এত ভাব যে চটি বদলে গিয়েছে জানো না। ফষ্টিনষ্টি করার বয়স আছে নাকি এখনো?' আমি এবারে রাগব কিনা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'তার মানে?' বউ উত্তর দিল না।

মন খারাপ হয়ে গেল খুব। এই আমার বউ? মনে হয়েছিল একে বিয়ে করলে স্বর্গসুখ পাব। বিয়ের পরে এতরকম উপসর্গ দেখতে পাচ্ছি যে মনে হচ্ছে বিসর্গ নয়, একেবারে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে।

এই ভুল অনেকেই করে। আমাকে বহু অভিজ্ঞ লোক বলেছিলেন, 'প্রেম করছিস কর, খবরদার বিয়ে করতে যাবি না। দেখে শেখ। ঠেকে শিখলে তখন আর উপায় থাকবে না।' আমি শুনিনি। তখন আমার অল্প বয়েস, আমার বউ যে হবে তারও অল্প বয়েস। কাঁচা বয়স, কচি নজর—বুঝতে পারিনি। গোঁ ধরে বসলাম এই মেয়েকেই বিয়ে করব। তখন একজন আমাকে বঙ্কিমচন্দ্র খুলে দেখালেন। দেখলাম বঙ্কিমচন্দ্রও বলে গিয়েছেন যে পুরুষের পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল বিবাহ। আমি বললাম, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র দু'বার বিয়ে করেছিলেন কেন? আমার হিতৈষী বললেন, সেইজন্যই উনি বিয়েটাকে ঘেঁটে দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

কিছুতেই কিছু হল না। বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ হয়। নয়তো এ কাজ কেউ করে? এখন সব ব্যাপারেই খিটিমিটি লেগে থাকে। ভাল কথা কখনো বলে না। আমি যে প্রতিনিয়ত আমার অপদার্থত্ব দেখাচ্ছি, এ কথাটা আমার বউ সব সময়েই বলছে। মনে হয় বাড়িতে একজন টেররিস্ট ঢুকে পড়েছে। আমি ছোটবেলায় এক ভদ্রলোককে দেখেছি, যিনি তাঁর বউকে

হিটলার বলতেন। আমার বউ তো হিটলার নেপোলিয়ন মুসোলিনী, এই ব্রাহ্মস্পর্শের মিক্সচার। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সবাই তাই বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন। আমি দেখেছি ছেলের মা নয়, বাবাই চায় ছেলের বিয়ে দিতে। বাবা বোধহয় ভাবে, সারা জীবন আমি বিয়ে করে জ্বলেছি, ছেলে কেন আরামে থাকবে? আর মা জানে যে বিয়ে হলে মেয়েরা কেমন জ্বালাতে পারে, সে আর ছেলেকে সহজে ঠকতে দিতে চায় না।

এখন কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। বউয়ের হাত থেকে রক্ষে পেতে গেলে আর একটি প্রেম করুন। বউ আপনাকে দুঃখ দিতেই এসেছে। সে চাইবে না আপনি কোথাও সুখ পান। তাই যদি আপনার বান্ধবী জোটে, সে অখুশি হবেই। আপনাকে ভালবাসে বলে নয়, আপনাকে ভালবাসে না বলেই। এইটি যদি করতে পারেন তবে আপনি জোঁকের মুখে নুন ছড়িয়ে দিতে পারবেন। সারাদিন বাড়িতে ধমক ধামক খেলেও আপনার মুখের হাসি কখনো ফুরোবে না।

বিয়ের আগে হবু বউকে দু'দিন না দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন করত। এখনো করে। তবে এখন করে বউকে দেখতে পেলে। দেখলেই মনে হয় সাইরেন বাজছে বুকের মধ্যে, এখনই এয়ার রেড্ হবে। আগে যখন বুকের মধ্যে হাঁচোড় পাঁচোড় করত, ভেবে পেতুম না কি করব। আমার কবি বন্ধু বলত, কবিতা পড়ো, ডাক্তার বলত বাই কার্বোনেট অফ সোডা খাও দু'চামচ। তখন কি জানতুম অম্বল হলেও ওরকম বুক ধড়ফড় করে। ভাবতুম বিরহে হচ্ছে বুঝি। মনে হতো বিরহ যে সহে সে রহে। তাই ওষুধ খেতুম না, কষ্ট করতুম। হায়, তখন যদি একটু সোডা খেয়ে নিতুম, তাহলে আজ এমন বোদা মেরে থাকতে হতো না।

এখন বউ রোজ আমায় দুষছে। আমার প্রতি কাজে দোষ। তাই তার প্রতি কথায় রোষ। আমার মত এমন বুদ্ধিহীন অপদার্থ সে দেখেনি। আমি মনে মনে বলি, তোমায় এমন লোক ছাড়া কে বিয়ে করত শুনি? দেখা হলেই এখন হা রে রে করে আসে, যেন ডাকাত পড়েছে। মেয়ে ডাকাত কেমন হয়, তা তো বউকে দেখেই বুঝেছি। এক এক সময়ে মনে হয় ঘুমের ঘোরে মেরে দেবে না তো। বেঘোরে প্রাণটা যাবে? আমার এক বন্ধু বলল, তা মারতে পারে তোর বউ। এখন তুই মরলে কিছু টাকাও পেয়ে যাবে। তোর টাকাটা রইল, অথচ তোর অসুবিধেটা রইল না, এর চেয়ে আরামের আর কি হতে পারে?

এইজন্যই ওই প্রেমে পড়ার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবছি। আপনারাও এগিয়ে যান। বিয়ের দুঃখ ভুলতে হলে ইয়ের সুখ তৈরি করতে হবে। বন্ধুর বউ বা বউয়ের বন্ধু, বন্ধুর বোন অথবা বোনের বন্ধু—এইভাবে ভাবতে থাকুন।

এদের মধ্যে কে আছে যে আপনার দুঃখের কথা শুনবে? ভাবুন, নাছোড়-বান্দা হয়ে ভাবুন। আপনার প্রতি পদে এখন বিপদ। যে করে হোক, একটি প্রেমিকা ভাগিয়ে আনুন। পাবেন না এমন নয়। যদিও আপনার শরীরে সে জৌলুস আর নেই, মনেও তাগদ কমেছে, এখন প্রেমিকার সঙ্গে বেড়াতে গেলেও লুকিয়ে একটা আধটা ওষুধের বড়ি খেয়ে নিতে হয়, তথাপি দেখবেন ঐ প্রেমটাই ওষুধের কাজ করছে।

স্বামী নিয়ে যে বিরক্ত এমন কোন বউ বেছে নিন, দেখবেন সে আপনাকেই কত ভাল ভাল কথা বলছে। এমনকি এও বলতে পারে যে আপনাকে বিয়ে করতে পারলে সে সুখী হতো! আঁতকে উঠবেন না, আর একবার বিয়ে তো

আর সত্যি সত্যি আপনাকে করতে হচ্ছে না, শুধু বানিয়ে বানিয়ে কিছু ফাঁকা আওয়াজ করা। আর সেই ফাঁকে ভুলে যাওয়া যে আপনার ঘরে বউ বসে আছে।

বিয়ের ভয় পায় অনেকেই, পরে সেটাই ভয়ের বিয়ে হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ফাঁদই বটে। ঘুঘু চরিয়ে দিচ্ছে জীবনে। বঁড়শি যেমন গলায় বিঁধে গেলে খোলা যায় না, বিয়েও তেমনি ছাড়ানো যায় না। এক একটা টান দেয় বউ, আর আরো একটু গলায় বসে যায় বঁড়শি।

ঝগড়ার সময়ে শেষ পর্যন্ত আপনাকেই হার মানতে হয়, বউ থামবে না। সে হাতের নোয়া খোয়াতে রাজি আছে। তবু শির নোয়াবে না।

আর অন্য উপায় নেই, আপনাকে আবার একটি প্রেম করতে হবে। এ প্রেমে বিয়ে নেই, তবে ক্রমে ক্রমে বিয়ের ব্যথা কমে যাবে। বউকে খুশি করতে যাবেন না, কারণ বউ কখনো খুশি হয় না। বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে, যেন ডক্টর জেকিল আর মিসেস হাইড। বিয়ের আগে আপনার সব ভাল ছিল, আর এখন আপনার সব খারাপ। মাঝে মাঝে মনে হবে, ভুল করে অন্য মেয়ে বিয়ে করে ফেলেননি তো। আসলে যাকেই বিয়ে করবেন, সেই হবে অন্য কেউ।

আবার বলি, প্রেমে পড়ার জন্য এগিয়ে যান। একবার প্রেম করে আপনার প্রেমের ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছে, তবু দেখবেন এবারের প্রেমটা ভয়ানক হবে না। কাঁদো কাঁদো মুখে গিয়ে বসবেন, তারপরে হাসি হাসি মুখে চাইবেন। গলা তুলে প্রশংসা করবেন, তারপরে একবার টক করে বলে দেবেন যদি আগে আমাদের দেখা হতো। এতেই কাজ হবে। ঘনিয়ে বসবেন কাছে। হাত নিয়ে নেবেন হাতে।

দেখবেন আবার সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে বেরোতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে এবারের মত জীবন একেবারে বৃথা যায়নি। বউ না হলেই মেয়েরা কত ভাল হয়, তা একবার জেনে নিন। তারাও নিজেদের সংসারে বিপর্যস্ত। আপনার মতো কাউকে পেলে তারাও সুখী হবে।

পুরোনো কালের, অর্থাৎ আপনার যৌবন কালের প্রেমের ছবি আবার দেখুন প্রেমিকার সঙ্গে। হা হুতাশ করবেন না, আশ মিটিয়ে তৃপ্তি খুঁজে নিন।

এ বিষয়ে আর একটা টিপস দিই। রেসের মাঠের টিপস নয় যে দিনের শেষে মাথা টিপ টিপ করবে। এ টিপসের মার নেই। আর কাউকে না পান, নিজের শালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করুন। দুই বোনেই হয়তো আপনাকে অকর্মা বলে জানে, তবু এই বোন ফিরিয়ে দেবে যৌবন। মাতিয়ে দেবে জীবন।

আমি এক ভদ্রলোককে জানি, যিনি নিজের শালীর সঙ্গে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। রাস্তার মোড়ে হঠাৎ দেখি তাঁর শালী দাঁড়িয়ে আছেন। জানতে চাইলাম, এখানে? উনি বললেন, না এই দিকে যাচ্ছিলাম, তাই। আমি অবাক হলাম, যাচ্ছেন এইদিকে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন ওইদিকে। বুঝতে না পেরে হাঁটা ধরেছি হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে চলেছেন সেই দিকে, যেখানে তার শালী দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝলাম ওঁরা অল্প বয়সের মত খেলতে চাইছেন। ভারি তৃপ্তি পেলুম। বোঝা গেল ওঁরা আবার বাঁচতে চান।

বান্ধবী

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে রিকশাওলার সঙ্গে দর করছিল। রিকশা যে চালায় সে বলছে, এক টাকা লাগবে। রিকশা যারা চাপবে তারা বলছে, বারো আনা। এই নিয়ে খানিকটা তর্কাতর্কি চলার পরে অবশেষে রিকশাওলা বলল, 'ঠিক হ্যায়, বারা আনাই লেগা।' ছেলেটি মহা খুশি হয়ে মেয়েটিকে বলল, 'চলো, উঠে পড়ো রিকশায়।' রিকশাওলা তার খুশিতে জল ঢেলে দিয়ে বলল, 'লেকিন পর্দা নেহি লাগায়গা।'
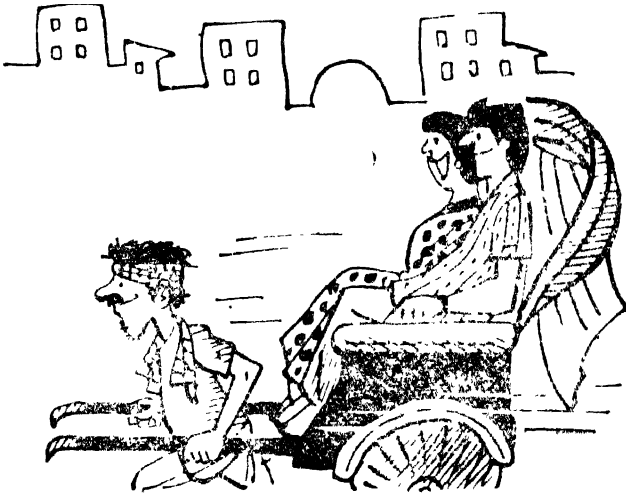
এইটাই হল বান্ধবী আর প্রেমিকার তফাত। বান্ধবীর সঙ্গে রিকশায় যেতে হলে পর্দা ফেলার দরকার নেই, প্রেমিকার বেলায় পর্দা ফেলতে না পারলেই সব বে-ফায়দা। প্রেমিকার সঙ্গে থাকার সময় শুধু প্রেমই জীবন, বান্ধবী যখন সঙ্গী তখন জীবনটাই বন্ধু। মুশকিল এই যে বান্ধবী শুধু বন্ধু হয়ে থাকে না, হয় সে বউ হয়ে যায়, নয়তো একেবারে লোপাট

হয়ে যায় জীবন থেকে। স্ত্রী পুরুষে বন্ধুত্ব কেবল সমাজে নয়, বায়োলজিতেও ঘটানো শক্ত।

আমাদের বাবা কাকাদের কোন বান্ধবী ছিল বলে আমার জানা নেই। তাঁরা সকলেই সামাজিক দিক থেকে যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন। পরিচয়ে, মেলামেশায়, আনন্দে, ফুর্তিতে তাঁরা কেউ কম যেতেন না। তবু তাঁদের জীবনে বান্ধবী বলতে বড়ো জোর কোন শালিকা, অথবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাজিন। সে পরিচয়ও শুধুমাত্র ভদ্রতার সংকোচের আবরণেই জড়ানো, তার কোন ছড়ানো ব্যাপ্তি ছিল না। পাড়ার ক্লাবে তাঁরা যখন থিয়েটার করতেন, তখন মেয়েদের পার্ট করত ছেলেরাই। কদাচিৎ কোনো মেয়ে যদি বা অভিনয় করতে আসতেন, তাঁর আড়ষ্টতা দেখে দুঃখ হতো। তাঁর অভিনয় করার শখ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে প্রেমে পড়ার ভয়।

অথচ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেবার ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষের আড্ডার মতো মনোরম আর কিছু হতে পারে না। কেবল পুরুষরা এক হলে সেখানে অবধারিত এসে পড়বে অফিসের গল্প, অথবা রগরগে কেচ্ছা। আবার মেয়েরা এক হলে সেখানে শাড়ি গয়না অথবা স্বামীর আসন্ন প্রমোশনই হবে বিষয়বস্তু। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে বিষয় থাকলেও, বস্তু থাকবে না। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ এক হলে পুরুষেরা সতর্ক এবং মার্জিত হবে, মেয়েরাও স্থূল নিয়ে হুলস্থূল বাধাবে না। এও সত্যি কথা, মেয়েদের শক্তি পুরুষের চেয়ে বেশি। সেই যে গল্প আছে, দুই জমিদার মামলা লড়ছে। এক জমিদার উঠেছে কাজীর বন্ধুর বাড়িতে। প্রতিবাদী জমিদার উঠলেন কাজীর বান্ধবীর বাড়িতে। মামলা হারলেন বাদী। সবাই বলল, ‘কাজীর বন্ধুর বাড়িতে উঠেও সুবিধে করতে পারলে না?’ তিনি বললেন ‘বান্ধবীর সঙ্গে পারবো কী করে? এগেনস্ট নেকেড্ আর্গুমেন্ট আমি কি যুক্তি দিতে পারি?’

এবারে আমার নিজের কথা বলি। আমাদের সময়ে বান্ধবীর আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদের জীবনে। কিন্তু শুধু বান্ধবী হয়েই তারা থাকেনি, কোন না কোন সময়ে, কারো না কারো সঙ্গে তারা প্রেমে পড়েছে, অথবা প্রশ্রয় দিয়ে আশ্রয় পেয়েছে কারো হৃদয়ে। তথাপি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় থেকেছে। আমাদের সঙ্গেই আড্ডা দিয়েছে, বেড়াতে বেরিয়েছে। সে-সব সময়ে তাদের যারা প্রণয়ী, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়েছে। কারণ তারা তখন তাদের নতুন পাওয়া অধিকারবোধ থেকেই ওই মেয়েদের দেখেছে, বন্ধুত্বের ব্যাপার তাদের মধ্যে তখন অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। এমনও দেখেছি, যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে পরিচয়ে খুশিতে ভরে উঠত, বিয়ের পরে তার স্বামী, যে আমাদেরও বন্ধু—সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল বন্ধুদের আড্ডা থেকে।

সে কি ভেবেছিল যে তার স্ত্রী এবং আমাদের বান্ধবী, এই দুই টানাপোড়েনে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে? আবার এমনও দেখেছি যে মেয়েটির সঙ্গে আমাদেরই মধ্যে একজনের বিয়ে হবে বলে স্থির হয়ে আছে, অত্যধিক সময় নেওয়ার ফলে সেই বিয়ে আর হয়নি। এ্যাজ এ রেজাল্ট, সে আর আমাদের বান্ধবীও রইল না। ওদিকে যে ছেলেটি আমাদের বান্ধবীকে বিয়ে করেছিল, তারা এখন কিভাবে আছে, আমি জানি না।

বান্ধবীকে বিয়ে করার দুটি চমকপ্রদ ঘটনা এখানে বিবৃত করতে পারি। আমাদের এক বন্ধু যে বান্ধবীর সঙ্গে হৃদয়গতভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, তাকে এসে মেয়েটি বলল, 'আমার বিয়ের ঠিক হচ্ছে, তুমি কিছু কর।' ছেলেটি দেখা করল মেয়েটির বাবার সঙ্গে। ভদ্রলোক ছেলেটির লেখাপড়ার ব্যাপারে খুশি ছিলেন, সমাদর করে বসালেন তাকে। কিন্তু যখন শুনলেন যে ছেলেটি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তখন তাঁর ধৈর্য রইল না। উত্তম সুচিত্রার অনেক ছবিতে সুচিত্রার বাবার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসকে যেসব কথা বলতে শুনেছি, বিশ্বাস করুন সেই কথাগুলোই অবিকল বললেন ভদ্রলোক। সমাজে সিনেমার প্রভাব কতটা, এ থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি বিয়ে করবে আমার মেয়েকে? জানো ওর মাসে কসমেটিকসের খরচ কত?' ছেলেটি ছবি বিশ্বাসের মতো সংলাপ ছবির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনেনি, জবাবে বলেছিল, 'বিয়ের পর কসমেটিকস মাখার তো আর দরকার থাকবে না। কেননা বিয়েই তো হয়ে গেছে।' বলা বাহুল্য সব মেয়ের বাবার মতই এ মেয়ের বাবাও তাতে রাজি হননি। বলেছিলেন, 'বড় রোজগেরে পাত্র চাই।' ছেলেটি বলেছিল, 'ব্যাপারটায় দেরি হয়ে গেছে। অন্য কিছু করা তো সম্ভব হচ্ছে না। তবে একটা ফরেন সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়ে দেখতে পারি।' বাবা বলেছিলেন, 'দেখাও।' ছেলেটি সেই পরীক্ষায় প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ হয়ে পেয়েছিল মেয়েটিকে।

আর একটি ঘটনা কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। এক্ষেত্রে ছেলেটি যে মেয়েটিকে বান্ধবী থেকে বৌ করতে চায়, তার বাবা মদ্যপান করেন এবং সঙ্গে রিভলবার রাখেন। ছেলেটির পক্ষে প্রস্তাব করতে যাওয়াই আশঙ্কাজনক। অগত্যা সে একটি অন্য পথ ধরল। মেয়েটির বাবার সঙ্গে তার পরিচয় ছিলই, ভদ্রলোক দোস্তির সুরে তার সঙ্গে কথা বলে থাকেন। এক সন্ধ্যায় যখন ভদ্রলোক সুরা নিয়ে বসেছেন, তখনই ছেলেটি সাদীর কথা বলবে বলে উপস্থিত হল। ভদ্রলোককে বলল ছেলেটি, 'দেখুন, একটি মেয়েকে ভালবাসি। কিন্তু তার বাবাকে কিছুতেই বলতে পারছি না।' ভদ্রলোক বললেন, সে কি রে তোর মত ছেলেকে জামাই হিসেবে পেলে তো যে কেউ বর্তে যাবে।

ছেলেটি এই কথায় আশা পেলেও পুরো ভরসা পায়নি। ভদ্রলোক এবারে বললেন, 'মেয়ের বাবার কোন উইকনেস আছে নাকি রে? রেস টেস খেলে? মদটদ খায়?' ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ, একটা উইকনেস আছে। উইকের সব দিনেই মদ নিয়ে বসেন ভদ্রলোক।'

'তবে তো হয়েই গেছে। একদিন খপ করে বাবার পা চেপে ধর।' এইটুকু বলতেই ছেলেটি ভদ্রলোকের পা চেপে ধরেছে। ভদ্রলোক একটু চমকেছেন, 'আরে আমার পা ধরছিস কেন? যাকে বিয়ে করতে চাস, তার বাবার পা ধর।' ছেলেটি তখন মরিয়া, 'তাই তো ধরেছি।' এর পরে আর বিয়ে না হয়ে যায় না। আমার খালি জানতে ইচ্ছে করে এই বান্ধবীদের বিয়ে করার পরে ওরা কেমন আছে। একটি ছেলেকে জানি যে বান্ধবীকে বিয়ে করার পঁচিশ বছর পরে বলেছিল, 'যদি লাখ দুয়েক টাকার যোগাড় হতো, তবে টাকাটা বউয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতাম, আমায় মুক্তি দে।'

এই জন্যই বান্ধবীকে বিয়ে করতে নেই। ছেলে মেয়ের বন্ধুত্বে রহস্য থাকে, আর থাকে বলেই তার বিশেষত্ব এত বিশেষ। আমাদের সঙ্গে কখনো কোন বন্ধুর বোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তার মধ্যেও রং লাগেনি এমন নয়, তবু এক ধরনের সখা হয়ে উঠেছিলাম আমরা। আজও দু'জনে দুই সংসারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই অসম্পূর্ণ বন্ধুত্বের কথা মনে করে রোমাঞ্চিত হই। নানা ভালো লাগা আর ভালো না লাগার কথা বলতে পারার সুখ পাই এখনো।

আজকে যখন পরবর্তী প্রজন্মকে দেখি, মনে হয় এখন বান্ধবী পাওয়া বোধহয় অপেক্ষাকৃত সহজ। তবু এর মধ্যে যেন অতিরিক্ত উন্মুক্ততা এসে পড়ল। প্রথম বয়সে বান্ধবী মেলে না সহজে, যদি মেলে তবে তার মধ্যে যদি কোন রোমান্টিকতার ছোঁয়া না থাকে তাহলে তো সে যে কোন পুরুষ বন্ধুর মতই হয়ে গেল। প্রেম নয়, কিন্তু আকর্ষণ—বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করার সুখ এবং গল্প করতে না পারার দুঃখ, এর ভেতর কোথাও একটা সীমারেখা আছেই। সেটাই আবিষ্কার করতে পারার মধ্যেই এই পরিচয়ের সার্থকতা। সেটা আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা পেয়েছে কিনা তারাই বলতে পারবে। এটা খুবই সত্যি যে বান্ধবীর সঙ্গে মেলামেশা প্রায় ট্র্যাপিজের দড়ির ওপরে হাঁটার মত, একটু এদিক ওদিক হলেই অধঃপতন। বন্ধু থেকে প্রণয়ী। লোকে বন্ধু হয়, আবার প্রেমেও পড়ে। প্রেমেই পতন।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা এ কথার যাথার্থ বুঝতে পারবে কিনা বা বুঝতে চাইবে কিনা, এসব কথা তারাই বলতে পারে। আমাদের অল্পবয়সের

বান্ধবীদের যখন মাঝে মাঝে দেখতে পাই তখন তাদের সংসারে পরিবর্তই দেখি। পুরোনো বন্ধুত্বের কথা আমাদের দু'জনেরই মনে হয়, বিশ্ব সংসারের দায় থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারি না। তবু হঠাৎ একটি পুরোনো কণ্ঠস্বর যেন স্মৃতি থেকে উঠে এসে পথের মাঝে ডাক দেয় 'আরে, তুমি কেমন আছ?' একসঙ্গে দু'দণ্ড বসতে পারলে ভাল হতো, যদিও তা আর হয়ে ওঠে না, এর ওর সংসারের খবর নেওয়াই কৃত্য হয়ে দাঁড়ায়। যেন আমাদের নিজস্ব আলাপটা কিছু নয়।

এর মধ্যে একদিন এক বান্ধবীর খোঁজ পেলাম বহুদিন পরে। টেলিফোনে তার খবর নিতে গিয়ে জানতে পারলাম যে তার স্বামী মারা গেছে, সে এখন একা। আমি কি বন্ধুত্বের সূত্রে এখন তার কাছে যেতে পারি? ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

আরেক বান্ধবীকে আবিষ্কার করলাম ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসছে। তার হার্টের গোলমাল দেখা দিয়েছে। তার সঙ্গে সহৃদয় হবার ইচ্ছে থাকলেও তার বর্তমান হৃৎকম্প সম্পর্কে কী করতে পারি? সকালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন দেখি আমাদের আর এক বান্ধবী লেকের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে। একে দেখে একদিন অনেকেই বিচলিত হয়েছিল, আজ আমিও হলাম। তবে ভিন্ন কারণে। মেয়েটির ব্লাড সুগার হয়েছে। শেষের ঘণ্টা বেজে উঠেছে নাকি?

এখন আর নতুন করে বান্ধবী হবার সম্ভাবনা কম, যদিও প্রয়োজন বেশি। আমি সেই মাহুতের গল্পটা মনে করি। হাতির খাবার চুরি করত বলে রাজা মাহুতের প্রাণদণ্ড দিলেন। মাহুত কাকুতি মিনতি করে বলল, 'আমায় বাঁচতে দিন। আমি হাতিকে দিয়ে কথা বলাব।' রাজা তাকে এক বছর সময় দিলেন। মাহুতের বন্ধুরা তাকে বলল, 'তুই এটা মেনে নিলি কেন?' মাহুত বলল, এক বছরে কত কি হতে পারে। রাজা মরে যেতে পারে, আমি মরে যেতে পারি। কে জানে হয়তো হাতিটা কথাও বলে ফেলতে পারে।

আমি তাই অপেক্ষা করছি। কে জানে হয়তো বান্ধবী জুটে যেতেও পারে।

নববর্ষের সুখদুঃখ

মানতেই হবে যে বাংলা নববর্ষ ইংরেজি নববর্ষের তুলনায় খানিকটা পিছিয়ে আছে। ইংরেজি নতুন বছর শীতকালে হয় বলে ফূর্তি ভাল জমে। বেড়ানো, খাওয়াদাওয়া, হৈ-হৈ, যাই বলুন, সবেতেই যথেষ্ট সুখ। পয়লা বৈশাখে গরম, ঘাম, চড়া রোদ। যাবেন কোথায়, খাবেন কি? যে কোনো উৎসবের মূলেই রয়েছে ভাল খাওয়া দাওয়া। এই গরমে দু-তিনটে কোল্ড ড্রিংক অথবা দই, এছাড়া কিছু মুখে দেওয়া যায় না। জমা দই ছাড়া জমেই না নতুন বছর। কত দিন থেকে যে নববর্ষে দই কিনছি, মনেও করতে পারি না। 'বাটি হাতে এ ঐ / হাঁক দেয় দে দৈ'-এই পংক্তিটি বোলপুরের কোনো বৈশাখী পংক্তি-ভোজনে বসে লেখা কিনা জানিনা, তবে হতে পারত।

কিন্তু দই তো খাব শেষপাতে, তার আগেও তো বিশেষ কিছু চাই। বচ্ছরকার দিনে মোচ্ছব করতে গেলে পাঁঠা বা মুর্গী আনতেই হয়। দাম যাই হোক না কেন, আপনিই সেই পাঁঠা, যাকে বৌ মুর্গী হিসেবে জবাই করে। সবাইকে খুশি করতে গিয়ে নিজের মুখে ঘুষি মারা ছাড়া উপায় থাকে না। এখন ঘুষি মারবেন না ঘুষ-ই নেবেন, এটা ভেবে দেখুন। জীবনের সবচেয়ে বড়ো নাটক মুদ্রারাক্ষস,—মুদ্রা আনতে না পারলে সবাই আপনাকে রাক্ষসের মতো গিলে খাবে।

যাঁরা হার্ড ড্রিংক করেন, নববর্ষ তাঁদের কাছে কোন বিশেষ দিন নয়। কারণ তাঁরা মাত্র দুটো দিন পানীয় নিয়ে বসেন, যেদিন গরম পড়ে, আর যেদিন পড়ে না। তার ফলে তাঁদের প্রায়শই গেলাস নিয়ে বিলাসের শ্রমটুকু স্বীকার করতে হয়। নববর্ষ তাঁদের কাছে কোনো আলাদা অকেশন নয়।

কেউ কেউ নাকি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে নববর্ষ হিসেবে পয়লা বৈশাখ তারিখটা ঠিক হয়নি। ওটা নাকি হওয়া উচিত ছিল চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে। ব্যাপারটা আমি বুঝিনি, অঙ্ক চিরকালই আমার কাছে আতঙ্কের। তবু কথাটা আমার মনে ধরেছে। চৈত্রের প্রথমে যদি নববর্ষ হতো, তবে হাওয়ায় ওরই মধ্যে একটু শিউরোনো ভাব থাকত। অবশ্য এখন বসন্তকাল খুব একটা টের পাওয়া যায় না—বসন্তরোগের সঙ্গে সঙ্গে ওটাও প্রায় দূরীভূত। কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান। তবু হাওয়া দেয়, দিনের তাপ

মাত্রা ছাড়ায় না, ঈষদুষ্ণ বাতাসে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি। শরীরে যদি কষ্ট না থাকে, মন থাকে হৃষ্ট, নববর্ষে এর চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আর কি হতে পারে ?

নববর্ষ সবার কাছে সমান নয়। ছেলেকে দেখে বাবা, আর মেয়েকে দেখে মা ভাবেন আমাদের ছেলেমেয়েরা কেমন বড়ো হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও যে গোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন সেটা খেয়াল থাকে না। ছোটদের জীবনে প্রীতি, বড়দের শুধু জীবনস্মৃতি।

আর আসে হালখাতার নেমন্তন্ন। এটাও ছোটদের কাছে মজার, বড়দের কাছে মজানোর। ছোটদের জোটে সরস খাবার, বড়দের জোটে বিরস বদন। কারণ এই উপলক্ষ্যে আসলে এক লক্ষ্যভেদের শিকার হন তাঁরা। স্বীকার না করে উপায় থাকে না, অনেক পুরোনো ধার শোধ করতে হয়, এবং/অথবা ধারণ করতে হয় নতুন ধার। নিজেদের কর্মেই সেই অনিবার্য কর্মধারয় সমাস। মাস মাস যার চুক্তি। বৌয়ের উক্তিতে যার শুরু, গুরুভার সেই ঋণ থেকে কবে আপনার মুক্তি তা কেবল খোদায় মালুম। ক্রমশ সেই ধার এধার ওধার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। খুবই ছোঁয়াচে। ছোঁ মেরে আপনার পকেট সাফ করেই হাঁফ ছাড়বে ঐ ঋণভার।

কিন্তু এহো বাহ্য। আগে কই এবার। নতুন বছরে বৌকে শাড়ি দেবেন, না ঐ ছুতোয় শালীকেও নিয়ে যাবেন সিনেমায়। বৌয়ের সুতোয় টান মেরে শালীর সঙ্গ সুখ পাবার এই লোভ আর গেল না আপনার। এ ব্যাপারে অবশ্য সতর্ক হয়ে প্রস্তাব করতে হবে আপনাকে। বৌ যদি উত্তমকুমারের কোনো পুরোনো ছবি এসেছে বলে সেটা দেখতে চায়, তবে সেটাই উত্তম বলে মেনে নিতে হবে। আপনি যদি আঁতলেমো দেখিয়ে কোনো আর্ট ফিল্ম দেখতে চান, তবে সব নষ্ট। তার পরে উত্তমের ছবির টিকিট কেটে আনলেও বৌ কিছুতেই যাবে না আপনার সঙ্গে। আপনি ভুল করে ভাববেন, বৌ রাগ করেছে, তা কিন্তু নয়। সে আসলে অভিমান করেছে। রাগ জল হয়, অভিমান ভাঙাতে হয়। অনুরাগেই মানভঞ্জন পালা। কিন্তু যখন বৌ বলবে, 'তুমি তো সংসারের কুটোটি নাড়ো না, তোমাকে সংসারে কিসের দরকার', তখন সে রেগেছে। যদি কোনোদিন প্রমাণ দিতে পারেন তবেই এর জবাব হবে, নচেৎ নয়। ততদিন চুপ করে থাকুন। ফোঁস করতে যাবেন না, শেষ পর্যন্ত ফোঁসফোঁস করতে হবে।

নতুন বছরে বৌকে নতুন করে ভালবাসা জানানোর নিয়ম আছে। বিয়ের প্রথম কয়েক বছরে এসব আপনি নিজে থেকেই করেছেন, ক্রমশ এসবে ভুল হতে থাকবে। কারণ এখন বৌ আর আপনি, সংসারে পরিষ্কার দুটি পৃথক

শিবির। বৌ আর ছেলেরা একদিকে, আপনি আর কপনী আরেকদিকে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, আপনি আবার কে? উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন শুধু। ছেলেরাই বৌয়ের নিজের সৃষ্টি। আপনাকে অনাসৃষ্টি ছাড়া কেউ কিছু ভাবে না। আপনার মনে হতে পারে সেই হতাশ স্বামীর গল্পটা। সে তার বন্ধুকে জিগ্যেস করেছিল, 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের মেয়াদ কতদিন?' বন্ধু বলেছে, 'কুড়ি বছর'। স্বামী জানতে চাইল— 'আমার তো তার চেয়ে বেশিদিন হল বিয়ে হয়েছে। তবে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?' অথচ যখন বিবাহ হয়েছিল, তখন 'শুভ বিবাহ' বলেই সে

বিয়ের কার্ড ছেপে বিলি করেছিলেন বাপ-মা। এখন যদি আপনি বৌকে জাঁহাবাজ বলেন, তবে আপনার দুটো শাস্তি পাওনা হয়। একটা বৌকে অপমান করার জন্য, আর একটা ঘরের কেচ্ছা ফাঁস করে দেবার জন্য।

তথাপি নববর্ষে বৌকে নরম গলায় শুধোতে হবে, 'কি চাই তোমার?' এখন আপনি ঘরে আলো জ্বালালে বৌ ঘুমোতে পারে না, আপনি মশারির ভেতরে শুতে যান, বৌ শোয় বাইরে, তবু নতুন বছর বলে কথা। অতএব সব ভুল গিয়ে আজকের মতো সন্ধি করুন। কোনো অভিসন্ধি করবেন না। বলা যায় না, আপনার বৌয়ের মেজাজও হঠাৎ ভাল হয়ে যেতে পারে। সেও হয়তো আপনার জন্য কোনো উপহার নিয়ে হাজির হবে। একটু ভেবে নিয়ে নববর্ষ বরং যত্ন করে কাটান। কোন হুজ্জুতে যাবেন না। অবশ্য আগেই

বলেছি, বাংলা নববর্ষ ইংরেজি নিউ ইয়ার্সের থেকে বেশ পিছিয়ে গেছে। নিউইয়ার যেমন জমে, নববর্ষ তেমন নয়, বরং দমে যেতে হয়। কোনটা আগে চালু হয়েছে,—নিউইয়ার না নববর্ষ—জানি না। 'বটল' কথাটায় যেমন জোর পাওয়া যায়, 'বোতল' কথাটায় তেমন জোর কমে যায়, নিউইয়ার শুনলেই যেমন ইয়ারদের কথা মনে হয়, নববর্ষ কথাটা তেমন হর্ষ আনে না। 'সিনসিয়ারিটি' শব্দটার হাজার মাইল দূরে দিয়ে চলে যাওয়া বাংলা হল 'নিষ্ঠা', নিউইয়ারের বাংলা নববর্ষ কথাটা তেমনি দুবলা। নিউইয়ারে সার্কাস দেখা যায়, নববর্ষে নিজেদেরই সার্কাস দেখতে হয়। ট্রাপিজের খেলার মতো প্রাণ হাতে করে নিয়ে নামতে হয় নতুন বছরকে আহ্বান করতে। ওরই মধ্যে কাগজ খুলে 'এ বছর কেমন যাবে' তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি যদি কোথাও এই ছন্নছাড়া জীবনের নোঙর মেলে। সব আছে তাতে। ভারতে কতবার জিনিসের দাম বাড়বে, পৃথিবীতে কতবার যুদ্ধ লেগে যাবার মতো হবে, কতগুলো খুন হবে যার একটা খুনীকেও ধরা যাবে না, সামনের বছরে কোন নতুন অভিনেতা নেতা সেজে বসবেন মাথার উপরে, এসব খবর হুবহু পাবেন। পাকা জ্যোতিষী যে সেই বলে দিতে পারে, সামনের বছরে কি হবে, আবার বছর শেষে বলে বুঝিয়ে দিতে পারে কেন সেগুলো হল না। কিন্তু এত সবের মধ্যে কোথাও আপনার সুখ-দুঃখের কথা নেই। যেটুকু সুখের ইশারা আছে, সেটুকু আবার কাটান দিয়ে গেছে কোন দুঃখের ভাবনা। এও হয়, ও-ও হয়। সারা পাতা দুবার নয়, বার বার পড়েও আপনি বুঝতে পারবেন না যে, আপনার কপালে আগামী বছরে কি আছে। অথবা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, কপালের নাম গোপাল। না গোপাল নয়, রাখাল। রাখালকেই তো জেলে যাবার সময়ে মাসীর কান কামড়ে ধরতে হয়েছিল। আপনার অবশ্য নিজের কান ধরা ছাড়া গতি নেই।

নববর্ষ যে বসন্তের পরে আসে এতেই বোঝা যাবে যে, নতুন বছরে আমাদের জন্য রইল শুধু লড়াই। শুধু পুড়ে ছাই হওয়া। তার আগে আগুনের রঙে সব লাল করে দেওয়ার কাজ আমাদের। যাতে পরবর্তী বসন্ত নিশ্চিত হয়।

তাহলে আপনি কি করবেন? পাকে পাকে দুর্বিপাকে ভরা সংসারে অভিমন্যুর মতো ঢুকে পড়েছেন—এতদিনে জানতে পেরেছেন যে এখান থেকে জ্যান্তো বেরোতে পারবেন না। বীরের মতো লড়ে যান তাহলে। প্রতি বছর নতুন বছরকে বুকে তুলে নিন। নববর্ষ ওরফে ১লা বৈশাখ। ডাক নামেই এর নাম-ডাক। শাঁখ বাজিয়ে ঘরে আনুন তাকে। বাড়িতে একটু ভালমন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। গাড়ি বাড়ি দিতে পারেন নি নিজের নারীকে।

অন্তত একটা শাড়ি দিন। যদি সবাই চায়, তবে দল বেঁধে থিয়েটার দেখতে যান। সন্ধ্যাবেলায় যখন রোদ পড়ে আসবে, তখন শহরের প্রান্তে বেড়াতে যেতেও পারেন। হঠাৎ মনে হবে, বসন্ত যায়নি এখনো। ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশে তারা ফুটে উঠতে দেখবেন। দেখবেন আলো জ্বালিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটি এরোপ্লেন। সেই সঙ্গে উধাও হবে আপনার মন। আপনার সঙ্গে থেকে কত ব্যথা সয়ে যৌবন সাঙ্গ করে দিল যে মেয়েটি তার জন্য মায়া হবে আপনার। তারও দয়া হবে আপনার উপরে। অথবা যদি সকলে চায়, তাহলে ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়ুন কালীঘাটে বা দক্ষিণেশ্বরে। ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখ দেখার জন্য দক্ষিণা নিন হাতে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেউই আপনাকে সামাল দিতে পারবেন না, তবু বৌকে সামলাতেই বেরোতে হবে। সেখানে অসংখ্য কামনাতুর মানুষের ভিড়ে দেখতে পাবেন বিদেশ থেকে এসেছে এক সাহেব। এত মোসাহেবদের মাঝখানে সে চায় নতুন কোনো দিক্‌দর্শন। নানা দিক ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের দর্শন পেতে সে ছুটে এসেছে এইখানে। শুধু তাই নয়, ভালো করে মিশবে বলে সে বাংলাও শিখেছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে বাংলার নানা পীঠস্থান। নতুন বছরের এই মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সাহেব বাংলা শিখেছে শুনে অনেকেই তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। সাহেব বলল, সে বিষ্টুপুরের মন্দিরে রাধাকৃষ্ট দেখে এসেছে। বাংলা যখন শিখছেই, তখন সাধু ভাষাটাও শিখুক, এ জন্য তাকে বলে দেওয়া হল, বিষ্টুপুর না বলে বিষ্ণুপুর বল। রাধাকৃষ্ট না বলে বল রাধাকৃষ্ণ।

সাহেব শুনল মন দিয়ে। মনে মনে কি ভেবে নিল। তারপরে বলল, 'আচ্ছা এত গরম, এখন যদি বৃষ্কি না হয়, তবে তো ভীষণ কষ্ণ হবে।'

বড়ো দিন থেকে নিউ ইয়ার

আমাদের দুটো নববর্ষ আছে। একটা ইংরেজি, একটা বাংলা। একটা মদের, একটা গাঁজার। জানুয়ারিতে মদ খেয়ে বেদম, বৈশাখে গাঁজায় দম। ঠাণ্ডায় মদ ভালো জমে, গরমে গাঁজা। আপাতত জানুয়ারির কথাই বলি।

সায়েবরা অনেকদিন চলে গেলেও তাদের জীবনের স্মৃতি এখন অনেক মোসাহেবদের জীবনস্মৃতি। বড়োদিনের বড়ো আসর এখন অবশ্য ছোট হয়ে এসেছে। প্রতি বড়োদিনেই ছোট হয়ে আসছে আপনার দিন। শরতের বেলার মতই আপনার জীবনেরও বেলা পড়ে এল বইকি। এখন বেলাবেলি ঘরে ফিরে কাঁথামুড়ি দিয়ে বসে মুড়ি চিবোনোই ভাল। অন্যকিছু করা বা অন্যকিছু খাওয়া বোধহয় সইবে না। তবু ছোটদের মতো হৈ হৈ করার ইচ্ছে হয় এক একবার। মনে হয় হোটেলে যাই, কেক কিনি। বড়োদিন থেকে নিউইয়ার্স ডে—সারা সপ্তাহ এখন কত যে কেকের দোকান গজিয়ে ওঠে, তার ইয়ত্তা নেই। বাজারে যে আলু বেচে, সেও কয়েকটা কেকের প্যাকেট নিয়ে বসেছে। আলু কিনতে এসে কেউ কেউ কেকও কিনছে। সাহেবদের পিঠেপুলি। পেটে দিয়ে দেখা যাক। আলুর সঙ্গে কিনলে একটু সস্তাও হতে পারে। এগুলোকে অবশ্য কেক না বলে কিকও বলা চলে। জোরালো কিক মেরে তা দিয়ে ফুটবল খেলা চলে। অথবা ক্রিকেট ব্যাটের আঘাতে বাউণ্ডারীও করা যায়। ইঁটের মতো শক্ত, আঠার মতো চটচটে। চিনির মতো বড়ো বড়ো দানা, গুড়ের পানার মতো স্বাদ।

দেখে শুনে ঐ কেকই আপনি দুটো কিনে এনেছেন। তাতেই দুটো দাঁত যে ছিটকে যায়নি, এই যথেষ্ট। কেক দেখে ছেলেমেয়েরা প্রথমে মুচকি, তারপরে হো হো করে হাসলো। বৌ বলল, 'তোদের বাবাকে আগে খেতে বল তারপরে দেখা যাবে আমরা মুখে দিতে পারি কিনা।' এর চেয়ে ভালো কেক কিনতে গেলে যে বৌ বিক্রি করতে হতো সেকথা আর যাকেই হোক, বউকে তো বলতে পারবেন না। তাই চুপ করেই রইলেন আপনি। বৌ বলল, 'তোমার কাজের পেছনে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। একটা করে

ফেললেই হ'ল। চিরকাল সংসারের লায়াবিলিটিই রয়ে গেলে।' কথাটা ঠিক, আপনি কোনো এবিলিটিই দেখাতে পারেননি। বড়োদিনে তাই বড়ো লজ্জা পেতে হল ছেলেমেয়ের কাছে। খদ্দের পেলে না হয় বৌকে বেচেই ভাল কেক আনার চেষ্টা করা যেত। আপনিও বাঁচতেন কথায় কথায় খোঁটা শোনার হাত থেকে।

আমাকে এক ভালমানুষ ভদ্রলোক তাঁর বৌয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'এমন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলতে পারে যে কী বলব মশাই!' আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম 'দুঃখ করবেন না, আমারটিও তাই। চারপাশে চেয়ে দেখুন, সকলেরটিই তাই। বধূ মোটেই মধু নয়, শুধু বিষ। ঐ এক বিষ চারশো বিশেরও বেশি।'

যাক্. বাড়ির বৌ ছেড়ে বন্ধুদের দলে ভিড়তে চাইবেন এবারে আপনি। ছেলেবেলার কোন ইয়ার এখন আর আশেপাশে নেই। তবু নিউইয়ার
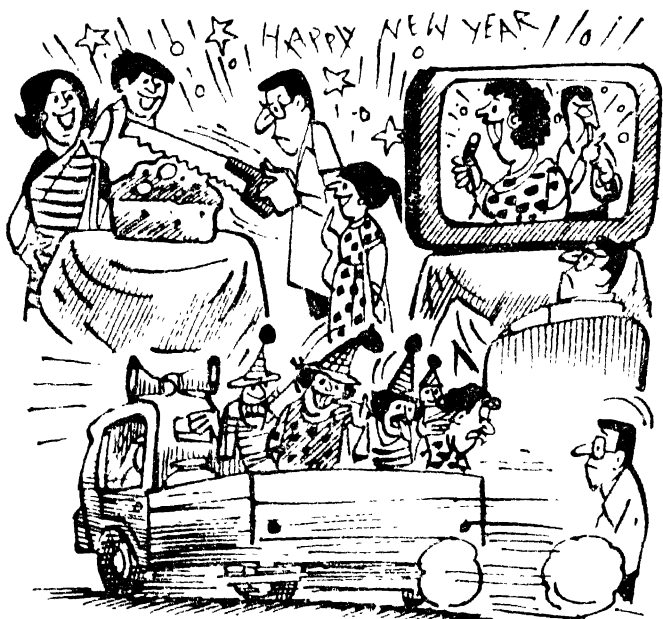
এলে মনে পড়ে যায় ছেলেবেলায় শোনা রাত বারোটার ভেঁপু। এখনো ভেঁপু বাজে, তবে মনে হয় শিঙে ফুঁকছে কেউ। তবু একবার চলো ও পাড়ায় যাই। বিলিতি হোটেলের সামনে। তারা কেউ আর এখন বিলিতি নেই, এমন কি সেখানে যেসব বিলিতি মদ বিক্রি হয়, তাও এদেশের তৈরি।

অত দাম দিয়ে আর কে যাবে ওখানে? তার চেয়ে বাড়িতেই ছোট ছোট পেগের ভোগ দেওয়া যাক। বাড়ির বৌ যতই ঠোঁট উল্টোক আর চোখ গরম করুক, গেলাসে ঠোঁট ঠেকালে মনে হবে সব ঠিক হ্যায়। সন্ধ্যা থেকে চালিয়ে যাও, মাঝরাত্তিরে মনে হবে, পাশে বসা বন্ধুকে ঝাপসা দেখাচ্ছে যেন। বন্ধুকে বারণ করা উচিত, বড্ডো বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে ওর।

এই সঙ্গে শুরু হবে দূরদর্শনের দুর্দশা। নিউইয়ারের নামে বস্তাপচা আয়োজন। কাতুকুতু দেওয়া হাসির চুটকি, হাসির না বলে হাস্যকর বললেই ঠিক হয়। যারা ঐসব চুটকি বলে, তারা নিজেরাই খুব হাসে। তাদের হাসিটাই দেখার মত হয়। হাসাতে এসে নিজেরাই হাসছে, এই ব্যাপারটাই হাসির। হয়তো এতেই হাসিল হয় তাদের প্রোগ্রাম। এই সঙ্গে শুরু হয় আজব গান এবং নাচের হুল্লোড়। মেসিনগানের সঙ্গে কেউ নাচতে চাইলে যা হয়, অনেকটা সেই রকমই দেখায়। গান শুনে অজ্ঞান হই, নাচ দেখে প্যাঁচে পড়ি। তবু মদের গুণে (না দোষে?) সব সয়ে যায়। রাত একটা পর্যন্ত কেঁদে ককিয়ে হাসাহাসি করে শুতে যাই কোনো রকমে। হঠাৎ ঐ রাতে ফোন বাজে। চমকে উঠি। নেশা ছুটে যায়। এখন কে ডাকে, কেন ডাকে? কেউ এল, এমন তো হবে না, নিশ্চয় কেউ গেল। ফোন ধরে জানা গেল না তা নয়। দূরদর্শনের অনুষ্ঠান কেমন লাগল এই সমীক্ষা করছেন কারা যেন। চড়াৎ করে মাথাটা ধরে গেলেও সজোরে ফোন রেখে দেওয়া ছাড়া কিছু করার থাকে না।

বড়োদিন বা নিউইয়ার, এই দুটো দিনের যা অবশ্য করণীয়, তা হল বোটানিক্স বা চিড়িয়াখানায় যাওয়া। এখানে না গেলে যেন তীর্থযাত্রা বাকি থেকে যায়। পয়লা বৈশাখে যেমন কালীঘাট, পশ্চিমে ডিসেম্বর বা পয়লা জানুয়ারি তেমনি এই দুটি। কেউ বা কালীঘাট হয়ে রেসের মাঠেও আসেন, কালীবাড়ির প্রসাদ এই মাঠেই বিলিয়ে দিয়ে যান। যে রিক্ততা দূর করবেন বলে এসেছিলেন, তার চেয়ে বেশি তিক্ততা নিয়ে ফিরে যান বাড়িতে, ক্ষিপ্ত বৌয়ের মুখোমুখি হতে।

চিড়িয়াখানায়, সেদিন মানুষের ভিড় দেখে জন্তুরা সেঁধিয়ে যায় খাঁচার ভেতরে, চিড়িয়ারা পালায় ত্রিসীমানা ছেড়ে। এত জন্তু তো জঙ্গলেও পাওয়া না। পায়ের ধুলোয় বোটানিক্সের গাছের রং সবুজ থাকে না, তবু আর যে কিছু আমরা শিখিনি। নিউইয়ারে করার মতো নিউ কিছু তো জানিনা কেউ।

তবে আপনার বৌ জানে। সে বড়োদিনের আগেই বড়ো বড়ো চোখ মেলে বলে রেখেছে, পয়লা জানুয়ারি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে হবে। ঐদিন সেখানে

কল্পতরু উৎসব। কল্পতরু হলে তো সবই পাওয়া যেত, এখন তো এটা কল্পনাতরু। অল্প না, এখানেও প্রচুর ভিড়। ইংরেজি বছরের প্রথম তারিখের সঙ্গে বাংলা ধর্মের এই মিশ্রণ ইংরেজি কায়দায় বাংলা খাবার মতো। সচকিত, সেই সঙ্গে পুলকিত হবার মতো ব্যাপার। ন্যাশনাল থেকে ইণ্টারন্যাশনাল ইনটিগ্রেশনে প্রোমোশন। বড়োদিনে যীশুখৃস্ট, নিউইয়ারে রামকৃষ্ট, দেখেশুনে হৃষ্ট হতেই হয়। সত্যি সত্যি কি সত্যযুগ এসে গেল? রাত বারোটাতে গীর্জায় বেজেছে মা মেরির জয়ধ্বনি, আর রাত পোহালেই মা কালীর সামনে এই প্রার্থনার সুরে উচ্চ নিনাদের জয়স্তম্ভ —স্তম্ভিত না হয়ে উপায় থাকে না। কে বলে আমরা অবিশ্বাসী? হয়তো অবিশ্বাস আমাদের নিজেদের ওপরেই। অফিসের মোসাহেব আর বাড়িতে বৌ, এদের হাতে পড়ে নিজেদেরই আর বিশ্বাস করি না। সব ধর্মেই খুঁজি আশ্রয়। বড়োদিনে মাতি, নিউইয়ারে লাফাই, কালীঘাটে যাই, দক্ষিণেশ্বরে কাঁদি। কাকে ডাকলে ফল হবে জানিনা, কে প্রশ্রয় দেবে, কোথায় আশ্রয় হবে - তার হদিস খুঁজে বেড়াই। প্রতিবারই এই একই খেলা আমাদের, প্রতিবার সেই একই লীলা ঈশ্বরের। এবারো তাঁরা মুখ ফিরিয়েই রইলেন। বৌয়ের কাছেই ফিরে আসতে হল। বৌয়ের হাতেই আমাদের জীবন, বৌয়ের হাতেই আমাদের মরণ।

এই নিউইয়ারের এক পিকনিকে প্রথম প্রেমে পড়েছিলুম। পড়ে আর উঠতে পারিনি। যার হাতে পড়েছি হাত পা বেঁধে রেখে দিয়েছেন তিনি।

ঈশ্বরও তাঁর দক্ষিণমুখ সরিয়ে নিয়েছেন। তার কারণ এ নয় যে, আমাদের ভগবানে বিশ্বাস নেই, আসলে ভগবানই আমাদের বিশ্বাস করেন না আর।

মদ খাওয়ার সেকাল ও একাল

যারা মদ খায়, তাদের মদ ভাল লাগে। আর যারা মদ খায় না, তাদের ভাল লাগে মাতাল। মাতালদের কাণ্ড নিয়ে কারখানা বানানো যায়। একটা ঘটনা বলি।

বাসে একটা মাতাল উঠেছে। বুঁদ হয়ে বসে আছে সে। কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতে কোনক্রমে চোখ দুটো খুললো, তারপরে পয়সা বার করে দিল। তাকে টিকিট দিয়ে কণ্ডাক্টর পাশের লোকটির কাছে হাত বাড়িয়ে বলল, 'টিকিট?' মাতালটি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'টিকিটতো কাটলুম বাপু।' কণ্ডাক্টর বিব্রত হয়ে বলল, 'আরে আপনাকে নয়', আবার চোখ বুজল মাতালটি।

এবার কণ্ডাক্টর আরেকটি লোকের কাছে হাত বাড়াল 'টিকিট?' এবারো মাতালটি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এইতো বাপু টিকিট কাটলাম। কতবার বলব?' 'আরে আপনাকে না।'

কণ্ডাক্টর যার কাছেই টিকিট কাটতে যায়, কী করে যে মাতালটির কানে যায় কে জানে, সে একইভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এইতো টিকিট কাটলাম।' শেষে দেখা গেল কণ্ডাক্টর সবার কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলছে, 'টিকিটটা নেবেন।'

মাতাল প্রথমে মদ খায়, পরে মদ তাকে খায়। যারা বুদ্ধিমান, তারা মদ বেচে দুধ খায়। যারা বুদ্ধি ছাড়াই বাঁচার হিম্মত রাখে, তারা দুধ বেচে মদ খায়। মদেই সব দুঃখ ভোলা যায়, হলাহলেই ভোলা বাবা। যদি মন খারাপ হয়ে থাকে তবে ড্রাউন ইট ইন অ্যালকোহল।

মাতালের সেই বিখ্যাত গল্প সবার জানা। এক পুরুত এসে বসেছে হোটেলে। পাঁচু খানসামা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। এখানে সে কি দেবে পুরুতমশাইকে?

'আপনাকে কি গরম দুধ এনে দেব?'

'না, দুধ নয়।'

'তা হলে এক কাপ চা?'

'না, চা নয়।'

'কফি ?'

'না, কফি নয়।'

ইতস্তত করে পাঁচু বলল, 'হুইস্কি সোডা ?'

পুরুত বললেন, 'না, সোডা নয়।'

আর এক মাতালের কথা বলে নিই। চিত হয়ে শুয়ে সে অবিরাম গান গাইছে। খানিক বাদে সে গান থামিয়ে উপুড় হয়ে শুল। তাকে জিগ্যেস করা হল, 'হঠাৎ উপুড় হলে যে ?' জবাব এল, 'এবারে রেকর্ডের উল্টো পিঠটা বাজবে।'

এই সূত্রে এক জ্ঞানী যুবকের কথা বলা চলে। তৃতীয়বারও তাকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন পাদ্রী। পাত্রীকে বললেন, 'বারবার একে মাতাল অবস্থায় আনছ কেন ? এ অবস্থায় আমি বিয়ে দিতে পারি না।'

পাত্রী তখন করুণ স্বরে বলল, 'মাতাল না হলে ওকে যে রাজি করাতেই পারি না।'

মাতালের দায়িত্বজ্ঞানও উল্লেখযোগ্য। কাগজে একজন বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, সে হিমালয় অভিযানে যাবে, যারা যেতে চায় এসে দেখা করতে পারে। রাত বারোটার পরে এক মাতালের চোখে পড়ল সেই বিজ্ঞাপন। তৎক্ষণাৎ সে হাজির হল ভদ্রলোকের বাড়ি। কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল সবার। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল মাতাল,—'আপনি এই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ?' ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন নিজের দায়িত্ব পালন করল মাতাল, 'আমি জানাতে এলাম যে আমি যেতে পারব না।'

মাতালের মনে হঠাৎ পরোপকারের ইচ্ছা জাগলে তা কিন্তু মারাত্মক হয়ে ওঠে। এক ভদ্রলোক পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছিলেন। কিন্তু পরস্ত্রীটি স্বামীত্যাগ করতে রাজী হয়নি। ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর এই দুঃখের কথা শুনে এক মাতাল সহসা ক্ষেপে গেল। 'প্রেমের জন্য সব করা যায়' –এই বলে সে রওনা হল, মেয়েটির স্বামীকে খুন করতে। তাহলে নিশ্চয় মেয়েটি ভদ্রলোককে বিয়ে করতে রাজী হবে। ফিরে এসে সগর্বে বলল, 'স্বামীটাকে মেরে ফেলেছি।' ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'কেউ দেখেনি তো ?'

'একটা মেয়ে দেখেছে।'

'কি রকম দেখতে ? সবুজ চোখ, ছড়ানো চুল, নাকটা সরু ?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

'তবে তো সর্বনাশ।'

'আরে না না কেউ টের পাবে না। আমি মেয়েটাকেও মেরে দিয়েছি।'

কিন্তু এহ বাহ্য। মাতালদের বুদ্ধিও কম নয়। এক মাতাল বার-এ মদ্যপান করে ওয়েটারের সঙ্গে গল্প করল খানিকক্ষণ। তারপর যখন সে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছে—তখন ওয়েটার তাকে বলল, 'আপনার দামটা?' মাতালটা একটু অবাক হয়ে তাকাল, তারপর বলল, 'দাম তো আমি দিয়ে দিয়েছি।' এই ঘটনাটাই শুনে নিয়ে আরেক মাতাল এসে হাজির ঐ দোকানে। খানিকটা মদ্যপান করে ওয়েটারকে ডেকে বলল, 'চট করে আমার ব্যালান্সটা দিয়ে দাওতো ভাই, আমার তাড়া আছে।'

মাতালদের শিভালরিও কম নয়। বাস-এ এক মাতাল টলতে টলতে উঠেছিল। পরেরদিন তাকে এক বন্ধু বলল, 'তুমি কাল বাস-এ এক মহিলাকে সীট্ ছেড়ে দিয়ে খুব বিপজ্জনকভাবে রড ধরে দাঁড়িয়েছিলে। লোকটি বলল, 'আমি কখনোই শিভালরি দেখাতে পিছপা হই না।' বন্ধু বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু কাল তো সব সীটই খালি ছিল।'

মাতালের ইংরেজি জ্ঞানও প্রবল। পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে দেখে মদের গেলাস ছেড়ে দৌড়ে এসে দমকলে ফোন করল মাতাল, 'শীগগির আসুন। এখানে ভীষণ ফায়ারিং হচ্ছে।'

মদের গুণ অনেক। যেমন দুঃখ ভোলায়, তেমনি জোর বাড়ায়। এক সাধুবাবা পড়েছিলেন একদল অসাধুর হাতে। তারা তো সাধুকে মেরেই ফেলে আর কি। তবে তারা সাধুকে তিনটে অপশন দিল। এগুলো করলে বেঁচে যেতে পারে সাধুজী। এক নম্বর, সুন্দরী স্ত্রীলোকের সঙ্গে

নিশিযাপন। সাধু এটা পারল না, সে ব্রহ্মচারী। দুনম্বর, মাংসভক্ষণ। এটাও পারল না সে, সে যে নিরামিষাশী। তিন নম্বর, মদ্যপান। ভেবে চিন্তে এটায় রাজি হল সাধু। মুনিরাও তো মদ খেতেন। এতে দোষ নেই। মদ এল। এক গেলাস খেয়েই সাধুর মনের জোর বেড়ে গেলে অনেকটা। সে চেঁচিয়ে উঠল, লে আও দুনম্বর। মদের সঙ্গে দুনম্বরটা মুখে দিয়েই দিল; খুলে গেল তার। বলে উঠল, লে আও এক নম্বর।

আগে যাঁরা মদ খেতেন, তাঁরা লুকিয়ে খেতেন সন্ধ্যাবেলা। ধরা পড়লে বলতেন, ডাক্তারের কথাতেই এটুকু খেতে হচ্ছে ভায়া। পেটে জল, আর দিনে জ্যোৎস্না দেখা, এই ছিল এঁদের শেষ হয়ে যাবার আগে শেষ কথা।

এখন আর সে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই, লোকে এখন ঢাক বাজিয়েই খায়। মাল না খেলেই লোকে গাল দেয়। বাড়ি গেলে সে জানতে চায়—হুইস্কি না শেরী। কক্‌টেল পার্টি দেওয়াই এখন সবচেয়ে বড়ো আর্ট। এ যুগের হুজুগই হল এক্সিকিউটিভ ড্রিংকস। বাংলা খেয়ে পড়ে থাকার দিন চলে যাচ্ছে, ইংরেজি খেয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় এখন। জীবিকাতেও উঁচুতে উঠছে সবাই এইভাবে। সুরার সঙ্গে কাব্য আর কেউ চায় না। সুধাই সব, সুধাময়ী চাইনে।

এজন্য মদ নিয়ে আর গল্প হয় না। কোন মেয়ে আর কারো হৃদয় ভাঙে না, কোন মদ কারো হৃদয় জুড়োয় না। কেউ মাতাল হয় না, শুধু একটু আউট হয়। বড়ো জোর একটু সাউট করে। এখনকার মাতালরা তালে ঠিক থাকে। অন্‌ দি রক্‌স এখন অবলীলায় খায় এরা। ঐ লীলাই এদের খেলা।

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ প্রেসক্রাইব করেছিলেন—এক ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি। শতাব্দীর মধ্যভাগে চারুদত্ত আধারকার মেশালেন অর্ধেক জিন, সিকিভাগ ফ্রেঞ্চ ভারমুথ, সিকিভাগ ইটালিয়ান। একফোঁটা বিটার্স, তার সঙ্গে খুব খানিকটা বরফ।

রেসিপির সেসব ট্রায়াল এখন শেষ। জীবন শুধু ট্রায়াল ব্যালেন্সের প্রফিট লস্‌। ডেলিশাস নয়, প্রেস্টিজিয়াস মাত্র। কে যেন বলেছিলেন মদ্যপানের কুফল বোঝাবার জন্য দেবদাস বইটা পড়লে হয়। ভদ্রলোক ভুল বলেছিলেন। মাতাল হলেও, অথবা মাতাল বলেই দেবদাস এখনো বাঙালীর সবচেয়ে রোমাণ্টিক নাম। প্রেমের নেশা আর নেশার প্রেম—এই দুয়ে মিলে দেবদাস সব মেয়েরই দেবদা। দেবদাস উন্নতি করেনি, নতি স্বীকার করেছিল। প্রেমে ডুবতে গিয়ে সে মদে ডুবেছিল। প্রেম তাকে ছেড়েছে, কিন্তু সে মদ ছাড়েনি।

অনেকে তাই বলেন, মদ কখনো ছাড়া যায় না। আমি একথা মানি না। মদ ছাড়া খুব সোজা। আমি তো বহুবার ছেড়েছি।

৯-কার যেন ডিগবাজি খায়

শিরোনামের এই পংক্তিটি সকলেরই চেনা। অ-আ-ক-খ চেনাতে গিয়ে যে অসামান্য ছড়াগুলি এইভাবে লেখা হয়েছিল, সেগুলো এখনো কেউ ভুলে যাননি। ভারি মজাদার ছড়া, সঙ্গে সুন্দর ছবি। অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে, তারপরই আমটি আমি খাব পেড়ে। সব মনে পড়ে যাচ্ছে না?

এই ছড়ার মধ্যে আমি '৯-কার যেন ডিগবাজি খায়', এটাই ধরতে পারতাম না। 'ঋষিমশাই বসেন পুজোয়', এই পর্যন্ত ঠিক আছে, তবে ৯-যে কেন ডিগবাজি খাবে, তা কে বলবে? আসলে তখন খেয়াল করে দেখিনি যে ৯ নয়, আসলে '৯-কার' ডিগবাজি খাচ্ছে। অর্থাৎ লিকার। এবারে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। লিকার মানে যে মদ এটা ধরতে পারলেই এটাও ধরা গেল যে মদ খেলে ডিগবাজি খেয়ে পড়তে হবে। ঐ শিশুকালে এটা বুঝিনি, তবে তখন থেকে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে মদ খেলে কি হয়।

এখন বুঝলেও, মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি এমন নয়। বরং বাড়িয়েছি। কারণ ঐ ডিগবাজি খাওয়াতেই যে মজা। রোজ যেভাবে চলি, যে কথা বলি, ডিগবাজি খেলে তার উল্টোটা করা যায়।

মদ খাওয়া যে বাড়ছে, তার কারণ এইটাই। এখন আমাদের জীবনে রোজ ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসে। আমি ভেবে দেখেছি। আপনারাও ভেবে দেখুন। আপনি স্কুলে কলেজে ভর্তি হতে পারবেন কিনা কেউ জানে না। ভর্তি হলেও পাশ করতে পারবেন কিনা তাও কেউ বলতে পারে না। কেউ পড়ায় না, কেউ খাতা দেখে না, কেউ নম্বর জমা দেয় না। তাই কেউ পাশ করে না, কেউ কাজ পায় না। আপনি যে কাজ চাইছেন, সে কাজ নেই। যে কাজ আছে, সে কাজ আপনাকে কেউ দেবে না। যদি ব্যবসা করতে যান, তবে কাজ করে টাকা পাবেন না, পেলেও ঘুষ দিতে হবে। এতসব কাণ্ড দেখে যদি মন ভোলাবার জন্য একটু লিকারে চুমুক দেন, তবে আপনাকে কেউ দোষ দেবে না। এ লিকার তো চায়ের লিকার নয় যে এক চুমুকেই শেষ হবে, এ তো খেয়ে যেতেই হয়। চুমুকের পর চুমুক। অনেকটা চুমুর মতো। খেয়ে খেয়ে আর আশ মেটে না। এত খেলে একটু বে-এক্তিয়ার হতেই হয়, তখনই সব উল্টে যায় চোখের সামনে। তখনই

তো সুখ। বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ, মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

'৯-কার যেন ডিগবাজি খায়', এই আশ্চর্য পংক্তিটির ঠিক আগেই যে

পংক্তিটি লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সেটিও কম আশ্চর্যের নয়। সেটি হল 'ঋষিমশাই বসেন পুজোয়'—ঋষিমশায়ের পুজোয় বসার পরেই ৯-কার সহযোগে ওলটপালট খাওয়ার ইতিহাসটিও উল্লেখযোগ্য। আপনারা জানেন, প্রাচীনকালে সব ঋষিরাই কারণ পান করতেন। এবং তা অকারণে নয়। তপস্যা করার মেহনত তো কম নয়। তার ওপরে সেই তপস্যা ভঙ্গের জন্য দেবতারা কম ঝামেলা করতেন না। সে সব সামাল দিতে গেলে শরীরে মনে যে তাগদ এবং হিম্মতের জোগান চাই, তা দেবে কে—লিকার ছাড়া।' তাছাড়া ঐ তপস্যার মধ্যেই এসে হাজির হতো স্বল্পবসনা অপ্সরার দল। তাদের দেখে মুণ্ডু ঘুরে যায়। তখন এক-আধ পাত্র চড়িয়ে নিলে তবেই ঐ মেয়েদের মোকাবিলা করা সম্ভব। মদ আর মেয়ে—এ দুটোই একেবারে পাশাপাশি থাকে, অনেকটা Q আর U-এর মতো। Q দিয়ে যে শব্দই লিখতে যান, পাশে U লিখতে হবে। মদ খেলে তাই মেয়ের কাছে যেতেই হবে বা মেয়ে দেখলে মদ খেতেই হবে। সে আনন্দেই খান আর দুঃখেই খান। ঐ দুবারই তো মানুষ মদ খায়। হয় দুলতে, নয় ভুলতে।

নিজের বৌ-য়ের গঞ্জনা ভোলায় মদ, পরের বৌ-কে পাবার কল্পনা জোগায় যে, সেও হল মদ। দুটোতেই আপনি রোজকার দুনিয়াকে উল্টে দেন, অর্থাৎ ডিগবাজি খেয়ে হাতের ওপরে হাঁটেন।

ঠিক এইজন্যই আমাদের সব অনুষ্ঠানে লিকারের চল চালু হয়ে যাচ্ছে। অফিসের পার্টি, ক্লাবের গেট-টুগেদার, পাড়ার পিকনিক।

এমনকি বিয়ে বাড়ির এক কোণে আজকাল একটা ঘেরা জায়গা থাকে, সেখানে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিংকসের নলচে আড়াল দিয়ে সাহেবদের হাতে মোসাহেবরা তুলে দেয় হার্ড ড্রিংকস ওরফে লিকার। একটু পরেই বেসামাল হয়ে পড়েন সাহেবরা। কেউ বা গান ধরেন, কেউ বা ধরেন কলীগের বৌকে। সাব-অর্ডিনেটের বৌ-রাও থাকেন সেখানে, তাঁদের সঙ্গেও কো-অর্ডিনেট করেন এক্সিকিউটিভরা। উঠতি জুনিয়রকে প্রশ্রয় দেন পড়তি সিনিয়র। সে ভারি মজা। ঐ ঘেরা জায়গাতেই কখন যে সুন্দরীতমা কোন মিসেসকে ঘেরাও করে ফেলেছে সবাই, তা সেই সুন্দরীও বুঝে ওঠার আগেই কম্ম ফতে। লিকারের সম্ভাবনা তাই প্রচুর। সারাদিন কাঁধে মাল টানে যে মজুর, সেও রাত্রে মাটির ভাঁড়ে মাল টানতে বসে যায়। যে সাহেব সারাদিন অফিসে কসরত করেছে, সে যায় ক্লাবে। সেখানে সে সিপ্ করে খায় রামের গেলাস। হয়তো রামধুনও গায় এক আধবার। তারপর যখন নেশা হয়, যখন ডিগবাজি খেয়ে সারা পৃথিবী দোলে চোখের সামনে, তখন সে অন্যের বৌকে নিয়ে বেরোয় তার ফ্ল্যাটে। আরেকবার ডিগবাজি খেয়ে যখন ফিরে আসে, তখন তার নিজের বৌ-ও ফিরে আসে অন্যের মারুতি চ'ড়ে। সেই চড়েই তার নেশা ভাঙে তখনকার মতো শুধু। পরের রাতে আবার সেই একই বাজি ফেলে ডিগবাজি খাওয়ার চেষ্টা।

লিকার খেয়ে মানুষ তাই মজা পায় খুব। নইলে খায় কেন। প্রথম চুমুক দিয়ে সকলেই বলে, ইস্ ভারি তেতো। একটু পরেই কেমন শুধু চুমুক নয়, চুমুকের পরে চুমুক। চোখ ঢুলঢুল হয়ে আসে, বলে, আরো দেতো। তখন হুঁশ চলে যায়। স্বপ্নে ভাসে দু নয়ন, শেষকালে অবশ্য বমিতে ভাসে সব বসন।

মদ না খেলে আজ আর কেউ জাতে ওঠে না। সন্ধ্যাবেলা কিসের পেগ্ তুলছেন মুখে, তাতেই জানা যাচ্ছে আপনি কুলীন কিনা। কতটা খেয়ে কতটা খাড়া থাকতে পারেন আপনি, তাতেই বোঝা যাবে আপনার ক্যালিবার —আজকের ভাষায় যাকে বলে ক্যালি।

জল না মিশিয়ে কতটা খাবার এনথু আপনি ধরেন, তার পরীক্ষাও হয়ে যাবে এখানেই। আপনি যদি প্রোমোশন পেয়ে অফিসার হন, তবে আপনাকে বাড়ির ফ্রিজে রাখতে হবে মদের বোতল। কেউ এলে তাকে

এগিয়ে দিতে হবে ড্রিংক্স। আগে মেয়েরা নিতেন সফ্ট, এখন তাঁরাও কড়া মাল পছন্দ করেন। তাঁরাও এখন হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, নাচান। গোড়ায় যা বলেছি, জীবনে এখন প্রতিদিন মহা টেন্শন যেজন্য সবসময়েই অ্যাটেনশান হয়ে চলতে হয়। পেন্শন পেলেও শান্তি নেই, তখনো কোনো না কোনো ফ্রাস্ট্রেশন আমাদের কুরে কুরে খায়। তাই আমরা মদ খাই। প্রথমে শুরু করি অবশ্য কৌতুকে বা কৌতূহলে। পরে ঐটাই জীবনের একমাত্র যৌতুক হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের বাজিতে হেরে গিয়ে মদের ডিগবাজিকেই আশ্রয় করতে হয়।

মদ খাওয়ার গল্পও অনেক। যে লোকটা বাড়ি থেকে বেরোত শাদা চোখে, সে যখন ফিরে আসত রাত্রে, তখন সে নেশায় টং। পথের মধ্যে উল্টে পড়ার পরে তার খেদোক্তি শোনবার মতো হয়—'যখন বেরোই তখন নর্দমাগুলো থাকে রাস্তার ধারে, যখন ফিরে আসি, তখন যে কি করে ব্যাটারা রাস্তার মধ্যিখানে এসে যায় কে জানে। বাড়ি ফেরার উপায় থাকে না।'

তুলসীদাস তাঁর কবিতায় লিখে গেছেন মদের মাহাত্ম্যের কথা – গলি গলি গোরস ফিরে, মদিরা বৈঠাল বিকায়ে। দুধ বেচতে হলে বাড়ি বাড়ি যেতে হয়, মদ এক জায়গায় বসেই বিক্রি হয়ে যায়। কথাটা সত্যি। আজ যখন দাম বাড়ছে বলে দোকানে বাজারে বিক্রি কম, তখন মদের দোকানে কিন্তু ভিড় কমেনি। কাজ ফেরতা মানুষ গাড়ি থামিয়ে, পায়ে হেঁটে—যেভাবেই থাক না কেন, ঠিক একটা বোতল কাগজে মুড়ে কিনে নিচ্ছে। যেদিন হরতাল তার আগের দিন মদের দোকানে প্রচণ্ড ভিড় আর হইচই। আপনি যদি ভাবেন যে পিকেটিং হচ্ছে, তাহলে বোকা বনবেন, আসলে মার্কেটিং হচ্ছে - হরতালের স্টক তুলে রাখা হচ্ছে আজ।

কি করবেন এছাড়া? এখন বেঁচে থাকার বড় জ্বালা। সে জ্বালা জুড়োতে এই তরল আগুনে ঝাঁপ দিন। সোজা হয়ে যখন হাঁটেন, তখন দুনিয়াটা অনেক কঠোর। তার চেয়ে ডিগবাজি খেয়ে শীর্ষাসন করে দেখুন, সব পাল্টে যাবে। দুনিয়াকে পাল্টাবার জন্য কত মানুষ কত সাধনা করেছে। দিয়েছে কত ফতোয়া। কিন্তু দুনিয়া একটুও পাল্টায়নি। বরং কষ্ট বেড়েছে। কেষ্ট মেলেনি। রাধাও নাচেনি।

এই লিকারে চুমুক দিয়ে দেখুন কত সহজে দুনিয়া ডিগবাজি খেয়ে বদলে যাচ্ছে। লিকার কোন বিকার নয়, বরং একপ্রকার যুদ্ধ জয়ের স্বীকার। আপনার বৌ আপনি মদ খেলে রাগ করে। আসলে সে ভয় পায় তখন। বৌকে ভয় দেখানোর এই একমাত্র সুযোগ ছাড়বেন না।

ঘোড়ায় পাসন্দ

এক ভদ্রলোক অফিসের ক্যাশ ভেঙেছিলেন। সে জন্য খুবই বিপদে পড়েছিলেন তিনি। চাকরি থাকবে কিনা এই চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছিল। দুদিন পরে সায়েব তার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলেন যে ভদ্রলোক অফিসে নেই।

'কোথায় গেছেন?' সাহেবের প্রশ্ন।

'আজ্ঞে, রেসের মাঠে।'

'সে কি।'

'আজ্ঞে উনি ক্যাশ মেলাবার শেষ চেষ্টা করতে গেছেন।'

বোঝাই যাচ্ছে যে, ক্যাশ উনি মেলাতে পারেন নি বরং শেষ পর্যন্ত চাকরিটি খুইয়েছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে কয়েক বছর বাদে আমার দেখা হয়েছিল। শীর্ণ শরীর আরো জীর্ণ হয়েছে। মজার কথা এই যে, উনি রেস ছাড়েন নি। বেশ খেলে যাচ্ছেন। সমবেদনার সুরে বলেছিলাম, এতদিন শুধু শুধু রেস খেললেন, কি হল? উনি হাসি মুখে বললেন, 'কেন? চারটে বাড়ি করলাম যে।' আমি তো বিশ হাত জলের তলায়, 'চারটে? কোথায়?' জবাবে শুনলাম, 'কেন? রেসের মাঠে ক্লাবের যে নতুন চারটে বাড়ি হয়েছে, সে তো আমাদের দৌলতেই হল।'

ক্রমাগত রেস খেলার পরিণতি এই রকমই। তবু এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। শুনেছি কেউ কেউ এর মধ্যে গণিতের নিয়ম বার করতে চেষ্টা করেন। ব্যাপারটার মূলে পৌঁছে যেতে চান, যাতে কোন ফর্মুলায় ফেললেই রেসের রেজাল্ট হবে নির্ভুল, অভাব হবে নির্মূল। এখনো কেউ সেটা বার করতে পারেনি, সেই চেষ্টা করতে গিয়ে সংসার থেকে বার হয়ে যেতে হয়েছে বরং, তবু অনবরত খেলে যাচ্ছে সবাই। কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও। অনেকে বলেন, এ খেলাটা আসলে টাকাওয়ালাদেরই খেলা, কারণ জলেই জল বাধে, তবু সবচেয়ে বেশি খেলে তারাই, যাদের মোটেও টাকা নেই।

আমি যেবার রেসের মাঠে গিয়েছিলাম সেবারে এত ভয় পেয়েছিলাম যে মাঠে ঢুকতেই আমার সব সাহস ফুরিয়ে গিয়েছিল, রেস খেলার জন্য

কোন সাহসের তলানিও বাকি ছিল না। তাই গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে শুধু রেস খেলা দেখছিলাম। আমার এক ওস্তাদ বন্ধু ছিল সঙ্গে। সে কোন রেসে কোন্ কোন্ ঘোড়া দৌড়বে, কি তাদের স্পার্ট (এটা যে কি বস্তু তা আমি জানি না), কি তাদের হিস্ট্রি (এটাও এক মিস্ট্রি) কোনটা এবারে জিততে পারে (আন্দাজে ছাড়ছে), এসব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ঘোড়ারা এসে যখন স্মার্টলি দাঁড়াল, তখন লোকদের জয়ধ্বনি উঠল চারদিকে, যার অনেকটাই পরে হরিধ্বনিতে পরিণত হবে। ঘোড়া যখন বাঁক ঘুরে সামনে দিয়ে ছুটছে, তখন আমারও বুকের মধ্যে কেমন যেন দুরদুর করে উঠল। কে জিতবে এটা জানতে না পারলে যেন নিস্তার নেই। বিস্তর ভাবতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল, আরে আমি তো কোন বাজিই ধরিনি, তবে এ-সব বাজে ভাবনা ভাবছি কেন? আসলে ঐ রকম আবহ-ই তৈরি হয়ে গিয়েছিল, বহতা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন মানুষও দৌড়চ্ছে। চেহারা দেখে আমি যে ঘোড়াটা পছন্দ করেছিলাম, মানে ভেবেছিলাম যে এর আর মার নেই, সেই দেখলাম সবাইকে পেছন থেকে প্রায় মারতে মারতে তাড়া করে নিয়ে এল। নিজে লাস্ট হলেও আর সবাইকে ফাস্ট দৌড় করাল সে। দূরদর্শনের বাংলা সিরিয়ালের মত, যে ঘোড়াটাই ধরব ভাবি, সে কোন প্রাইজ ধরতে পারে না। ভারি সারপ্রাইজিং।

গ্যালারিতে আমার পাশেই এক যুবককে দেখলাম উত্তেজিত হয়ে লুইস, লুইস বলে চ্যাঁচাচ্ছে। আমি তো যদ্দুর জানি, লুইস বলে কোন ঘোড়া নেই। তাহলে? আমার বন্ধু আমায় বুঝিয়ে দিল যে, লুইস কোন ঘোড়ার নাম নয়, লুইস হল জকির নাম, যে ঘোড়াটাকে চালায়। বুঝলাম ইনি যথেষ্ট ঘুঘু ব্যক্তি, বাস্তু না বেচে ছাড়বেন না, নইলে সরাসরি জকিকে চীয়ার আপ করেন?

এর পরেই অন্তত একটু বিয়ার খেতে হয়। হয় হারলে, নয় জিতলে, এই দু'বারই মাত্র। হয় মন ভোলাবার জন্য, নয় মন ভাল করবার জন্য শনিবারেই এই সোমরস পান।

আমি অবশ্য বহুবার আমার বন্ধুকে বারণ করেছি রেস খেলতে। কিছুই লাভ হয় না, অনর্থক টেনশন যার কোন প্রি-কশন বা প্রিভেনসন্ নেই। ঘোড়ার বই নিয়ে যখন হিসেব করতে বসত আমার বন্ধু মনে হতো যেন আহ্নিক করতে বসেছে। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। অথবা যেন টেস্ট পেপারের কঠিনতম পেপার নিয়ে বসেছে। যেন টেস্ট ম্যাচের সেই জটিল সিদ্ধান্ত— হাত ওঠালে আউট, না আউট হলে হাত ওঠানো? হিসেবের কড়ি বাঘে হয়তো খায় না, কিন্তু বাগে পেলে ঘোড়াতে খায়।

তারপর প্রতিবারই যথারীতি সেই যথাযথ সংলাপ, 'ইস্ একটুর জন্য জ্যাকপটটা গেল। কেবল লাস্ট লেগটা যদি মিলত।'

ঘোড়ার লেগ্ লাস্ট পর্যন্ত মেলে না, পায়ে ধরলেও না। বাঘে ছুঁলে মোটে আঠারো ঘা ঘোড়ায় ছুঁলে সর্বাঙ্গে ঘা, অ্যাগা বাঁধব কিসে? ঘোড়ার নলেজ কোনো প্রিভিলেজ নয়, লেজের ঝাপটা খাওয়া ছাড়া আর কিছু জোটে না।
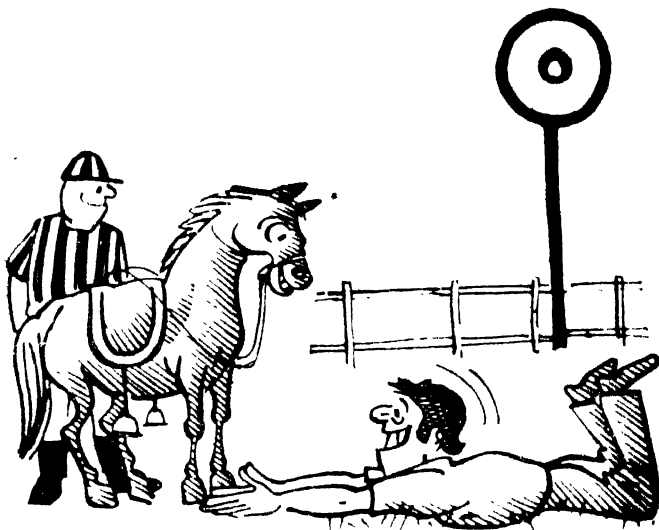
তবে গল্প শুনেছি একজন নাকি রেসের ফল বলে দিতে পারত। সবাই আসত তার কাছে টিপস নিতে। কেন এত লোক আসে তার কাছে সে কথা জানতে পেরে তার বউ খুব যাচ্ছেতাই করতে লাগল। ছি ছি ছি, লজ্জা করে না, ভদ্রলোকের ছেলে রেস নিয়ে মেতেছ। তাই আমার সংসার চালাতে এমন দুরবস্থা।

লোকটি শেষ পর্যন্ত বলল, 'আরে আমি তো নিজে রেস খেলি না।'

'না, খেল না! ওরা তাহলে আসে কেন?

'ওরা আসে টিপস্ নিতে।'

'টিপস নিতে!'

বউ টিপ্পনি কাটল, 'তোমার কাছে কেন?'

'আমার টিপ্স নিয়ে ওরা ফল পায়, তাই।'

'তুমি ঠিক বলতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'ওমা ওমা ওমা! তবে তুমি নিজে খেলো না কেন?'

এই হচ্ছে রেসের মজা। হারলে গাল খাও, জিতলে গালে চুমু খাও। একবার ব্যাঙ্গালোরে বেড়াতে গিয়ে রেসের মাঠে ইণ্টারস্টেট রেস খেলেছিল আমার বন্ধু। ঘোড়া দৌড়চ্ছে হায়দ্রাবাদে, বাজি লড়ছে মানুষ ব্যাঙ্গালোরে। খবর আসছে রিলেতে। প্রায় জিতে যাবার অবস্থা। আমার তো উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে গেল, নাকের ডগায় দেখা দিল ঘাম। জিতলে ট্রেনের টিকিট বাতিল করে প্লেনে ফিরব ভাবছি, কিন্তু শেষকালেই শেষ হয়ে গেল সব। আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। যে ঘোড়াটাকে দেখতে পাইনি, গোড়া থেকে তারই পিছু পিছু ছুটে শেষ পর্যন্ত নীচু হতে হল।

বারণ করা সত্ত্বেও আমার বন্ধু রেস খেলা ছাড়েনি। হয় মাঠে, নয় বুকির কাছে। খোকাখুকি নয় যে, কারো কথা শুনবে।

একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ও খবর দিল, জ্যাকপট লেগেছে। তবে বাইরে খেলেছি, মাঠে নয়। তাই একটু কম হবে। তাও হাজার পাঁচেক হবে।

শুনেই আমার বুকের মধ্যে হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠল। ইস্ যদি আমিও খেলতাম। যাকগে যাক, এখন বন্ধুর সঙ্গে হিসেবে বসলাম। উৎপাতের টাকা চিৎপাতে যাওয়াই ভাল। ওর আর দরাদরি না করে সরা-সরি ফুর্তি বরাবর এগিয়ে যাওয়াই ঠিক। সেই হিসেবে কোন হোটেলে কেমন গুড ফুড পাওয়া যায় তাই ঠিক করতে লাগলাম।

পরের দিন ফুড পয়জনিং হবার যোগাড়। বন্ধুর মুখ দেখলাম আষাঢ়ের মেঘের মত কালো। ভাবলাম কালই হয়তো এত বেশি মদ খেয়ে ফেলেছে যে, লিভারটা ভার ভার হয়ে গেছে, মুখে তাই কালো ছাপ।

আসলে মুখে ছাপ নয়, মনে চাপ। টাকা পায়নি ও। যে ঘোড়াটা সেকেণ্ড হয়েছিল সে অবজেকশন দিয়েছিল। অবজেকশন সাসটেন্‌ড, আর আমাদের জয় সাসপেণ্ড। ঐ সেকেণ্ড ব্যাটা এক সেকেণ্ডের জন্য নাকি ফার্স্ট হয়ে গেছে।

তুই তো বলি, কেন যে রেস খেলিস?

বইমেলা মেলা বৈ আর কিছু নয়

প্রতি বছর বইমেলা হলেই মনটা আনচান করে। মেলা বই আসে, মেলা লোকও আসে, মেলা স্ত্রীলোকও আসে। ওখানে ঘুরি ফিরি, এটা ওটা নাড়াচাড়া করি, কিন্তু কিছু কিনি না। যারা কোনদিন বইয়ের পাতা উল্টিয়েও দেখে না, তারা হঠাৎ পাতার পর পাতা পড়বার জন্য বই কিনছে, এটা দ্রষ্টব্য হলেও এতে কর্তব্য করা হয় না। সাহিত্যের সঙ্গে দায়িত্বের যোগ আছে, তা যেমন লেখকের তেমনি পাঠকেরও। পাঠক যদি ঠক হয় তাহলে বইমেলা একটা মেলা বৈ আর কিছু নয়।

সত্যি বলতে কি, কেনার মতো বই কোথায়? সেই রামায়ণ-মহাভারতের পরে হালফিলের যুগে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর তো সবই হুজুগ। তাই এখন বই কিনে দেখেছি পড়ার উৎসাহ বা সময় কিছুই হয় না। সারাদিন বান্দারা পয়সার ধান্দায় ঘোরে, বই পড়ার ক্ষমতাও নেই, মমতাও না। এখন স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে বই কেনে সবাই। বেশ বড় প্যাকেটে করে নিয়ে আসে বাড়িতে। তারপর খুলেও দেখে না কেউ অথবা শুধু দেখেই। পড়ে না। আমি আগে বই কিনতাম, কিন্তু অতো বই রাখার জায়গা কোথায় বাড়িতে? এখানে ওখানে গুঁজে রাখি, তারপর মনেও থাকে না। এখন ওইসব বই গুছিয়ে সামলিয়ে রাখতে গিয়ে আমার বউ তো রেগে কাঁই? সেই কাঁইবিচি নিয়ে খেলার সময় থেকে বই পড়ি, কিন্তু এখন বই রাখি, না বউ রাখি? বউ যদি বলে বইগুলো রাখার ব্যবস্থা করো, তবে আমার মার্ক টোয়েনের গল্পটা মনে পড়ে যায়। তাঁর বাড়িতে ছিল বিস্তর বই। তবে সবই ছিল ছড়ানো ছিটানো। র‍্যাকে, টেবিলে, মেঝেতে, বিছানায়। বন্ধুরা তাঁকে বলল, একটা বড়ো আলমারি করতে পারোনি? এত বই এনেছ, অথচ আলমারির অভাবে সব নষ্ট হচ্ছে।' মার্ক টোয়েন বলেছিলেন—'বই যেভাবে যোগাড় হয়েছে, আলমারি তো আর সেভাবে যোগাড় করা চলে না। আলমারি তো আর কারো কাছে ধার চাওয়া যায় না।'

বোঝাই যায়, বই নিয়ে কেউ ফেরৎ দেয় না। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা

স্মরণ করি। এক ব্যক্তি তাঁর সমাধিতে কি লেখা হবে, তা স্থির করে দিয়েছিলেন এইভাবে—Here lies one who always returned the book he borrowed. মজার কথা এই যে বই চোরকে ঠিক সাধারণ চোর হিসেবে কেউ গণ্য করে না। চোর হলেও তাকে যেন একটু ইজ্জতের চোখেই দেখা হয়। আহা, চুরি করলেও লোকটা বিদ্বান। সে-ই যথেষ্ট পণ্ডিত, যে ভালো চুরি করতে পারে। একটা বই থেকে চুরি করলে যে চোর, দশটা বই থেকে চুরি করলে সে পি-এইচ-ডি।

যা বলছিলাম, এখনকার বই আর পড়ার উপযুক্ত নেই। এমন বই লেখা হয় না, যা উপুড় হয়ে পড়ে ফেলা যায়। সেই জন্যই এখনকার বই এমন সাজিয়ে বের করা হয় যে বই না বউ বোঝা শক্ত। কি সুন্দর গেট-আপ। এটা করতেই হয়, কারণ Get upয়ের পরেই তো Sit down। এভাবে দামটাও বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

মাছের দামও বেড়েছে, সেটা তো খেতেই হয়, জুতোর দাম শুনলে মনে হয় এর চেয়ে জুতো মারলে ভাল হতো। TV VCR Tape Recorder এসবও যথেষ্ট দামি। প্রতি বাজেটেই জেট প্লেনের গতিতে এদের দাম বাড়ছে, কিন্তু এগুলো তো কিনতেই হয়, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তো পরিচয় রাখতেই হবে। বই কেনার শখটাকে আর প্রশ্রয় দেওযা যায় না। এছাড়া ভাল বই তো এখন দেখাই হয়ে যাচ্ছে, TVতে তো রামায়ণ মহাভারতের ব্যাপারগুলো বেশ মজা করেই তোলা হচ্ছে, তাই আমাদের মজিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রকেও অনেক সিরিয়ালেই burial দেওয়া হয়েছে। TVর বাক্সে বাক্স বাক্স ইডিয়ট আমাদের ভজিয়ে দিচ্ছে সব বিখ্যাত কাহিনীর বি-rupee-করণে। যেখানে দেবদূতেরা যেতে ভয় পান, সেখানে fools rush in—TV তাই এত বিউটিফুল। এতেই আমরা সব জানব। কে যেন আমায় জিগ্যেস করছিলেন—Marxয়ের Das Capital পড়েছ ? আমি বললাম—'না, TVতে দেখে নেব। ওরা নিশ্চয় তুলবে ওটা।' এর ফলে জ্ঞান সঞ্চয় অনেক সহজ হয়ে গেছে।

তবে আর বইমেলার ঝামেলায় কেন যাই ? বইমেলাই বা কেন ? আসলে এসব মেলা শীতকালের সার্কাসের মতো। প্রতিবারই হয়, প্রতিবারই যাই, আবার প্রতিবারই ভুলে যাই। নতুন বই পড়ার কি আছে ? পুরোনো বই-ইতো পড়লাম না একটাও। পাঠ্যবই যা ছিল, তাও তো পড়িনি, সে সবের Notes পড়েই উৎরে গিয়েছি পরীক্ষা। মূল বইয়ের মূল্য আমরা কবে দিলাম ?

তবে বইমেলায় বান্ধবীর সঙ্গে যাওয়ার মধ্যে একটা শিহরণ আছে। বেশ জ্ঞানী জ্ঞানী মনে হয় নিজেকে। দু'জনে অনেক স্টলে ঘুরি, কোথাও

Stalled হই না, শেষ পর্যন্ত রেস্তোরাঁয় বসি দু'জনে। কেনার মত বই নেই, খাবার মতো কাটলেট আছে। সেখানে লেট করি না, বইয়ের দোকানকে কাট করে চলে আসি খাবারের খবর নিতে। বইয়ের অরণ্যে ঢুকে যে ক্লান্তি এসেছিল, খাবার খেয়ে তা দূর করি। সব ক্লান্তি এই খাবারই ক্ষমা করে দেয়। সেই যে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর জন্য জন্মদিনের উপহার কিনতে গিয়ে মুস্কিলে পড়েছিলেন, তাঁর করুণ কাহিনী মনে করুন। ভদ্রমহিলার স্বামী বড়ো ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। দেশ বিদেশ ঘুরে তাঁর বাড়িতে সব জিনিসই আসে। দোকানদার ভদ্রমহিলাকে যা দেখায়, সব দেখেই ভদ্রমহিলা বলেন

—'এতো ও'র আছে একটা।' TV. VCR Tape Recorder, Two-in-One কিছুই দেখাতে বাকি রাখেনি সেই দোকানি। কিন্তু সবই ও'র আছে একটা। পৃথিবীতে যত গ্যাজেট বেরিয়েছে সবারই গেজেট যেন উনি। তাহলে কি উপহার দেওয়া যাবে না? ক্লান্ত দোকানী শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই একটা ঝকঝকে বই বের করে আনলেন মহিলার সামনে—'এই বইটা দিন আপনার স্বামীকে।' মহিলা এবারো নিরাশ গলায় বললেন—'বই? সেও তো ও'র একটা আছে।'

এই গল্পটা শুনেই আমার কল্পনা উজ্জীবিত হল। সত্যিই তো, একখানা বই আমাদের সকলেরই আছে। বর্ণপরিচয়। অক্ষরের বর্ণনা শুনেই তো সব পরিচয়ের সহজ পাঠ নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের। ভদ্রলোকের একটা বই আছে, তাতেই তাঁর প্রয়োজন মিটে গিয়েছে। আর আমি দরকারি অদরকারি কত বই যে জড়ো করেছি, তার কি হবে? শিশি-বোতলওয়ালাদের কাছে দিয়ে দিলেই হয়, তবু মায়া যায় না। ছেলেবেলার উপক্রমণিকা বইটা এখন তো আর লাগে না—সংস্কৃত ভাষাটাই মৃত ভাষা হয়ে গেছে, অপসংস্কৃতির যুগ এখন। হোমিওপ্যাথি শিখব বলে দুটো হোমিওপ্যাথি মেড্ ইজি কিনেছিলাম, এই চিকিৎসাটাই দেখি সকলেই পারে। ভেবেছিলাম বিদ্যালয়ে যেমন বিদ্যার মেড্ ইজি পড়েছি, এও তেমন মেড্ ইজি পড়েই স্টেজে মেরে দেব। ব্যাপারটার যে অনেক স্টেজ আছে তা বুঝতে পারিনি। একই অসুখে কখনো রাস্‌টক্স, কখনো ব্রায়োনিয়া যে কেন দেয় তা বোঝা হল না আজও। এ বইটা এখন বোঝা। বাংলায় বিজ্ঞানের বই কিনেছিলাম কয়েকটা। পড়ে ধরাই যায় না যে এগুলো বাংলায় লেখা। মনে হয় কোন ইংরেজ বাংলা লিখছে, এমনই দুর্বোধ্য রচনা। ইংরেজি বই থেকে টোকা, টোকা মারলেই ধরা পড়ে যে না বুঝে অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজি নয়, বাংলা নয়, এক অদ্ভুত ভুতুড়ে বাংরেজি ভাষায় লেখা সেই বিজ্ঞানের বই, যা পড়ে অজ্ঞান না হলে আপনার মুক্তি নেই।

সাহিত্যের বই যা ছিল, তা এখন অনেক বদল হয়ে গিয়েছে। এখন খুব দ্রুত এগোয় ঘটনা। দু'পাতা পরেই একটা উপদ্রুত মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শোয়া যায়, এ আর সওয়া যায় না। পুরনো ক্লাসিক বই পড়ার ক্ষমতাই চলে গেছে। সেই বই-ই ক্লাসিক, রচনাবলী হয়ে বেরোলে যা কেনার জন্য লাইন দেয় সবাই, কিন্তু এক লাইনও কেউ পড়ে না। আমাদের এখন শেক্‌সপীয়ার নয়, চাই Sex appear—বইমেলা তাই বউদের বিউটি পারলারের মত প্রসাধনের বস্তু, সাধনার নয়।

কোন কোন প্রকাশক বলে থাকেন, বইমেলা-তেই যা একটুআধটু বিক্রী হয়, সারা বছর তো কিছুই হয় না। এর মানে হল বই কেনা আমাদের মেলার পাঁপড়ভাজা খাওয়ার মতো রগরগে জিনিস, সবসময়ের মতো টগবগে নয়। এখানে সেই বইয়েরই বিক্রী বেশি, যা পরের মাসে খবরের কাগজের সঙ্গে বেচে দেওয়া যাবে।

তবু বইমেলার একটা গুণ আছে। যদি এখানে আসতে আসতে পড়ার নেশা হয় আপনার, তবে আপনি আর অন্য নেশায় পড়বেন না। 'মরা মরা, বলতে বলতে রামায়ণ লিখেছিলেন রত্নাকর। যত্ন করে তুলে এনেছিলেন রত্ন। যদি তাই হয়ে যায়, তাহলে একটা কাজের কাজ হল।

তবে এর বিপদও আছে পদে পদে। বই নিয়ে শুধু পড়ে থাকলে আপনার বউ একদিন আপনাকে নিয়ে পড়বে। বই পড়েছেন, বউকে পড়েননি। সংসারে সার হল আপনার বউ, আপনি হলেন সং। সারাজীবন সং সেজে কাটালেন, চারদিকে সবাই কেমন করে খাচ্ছে। কেমন দেমাকে মটমট করছে তাদের বউরা—দেখেশুনে আপনার বউয়ের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে মেজাজ দেখাচ্ছে আপনার উপরে। আপনার দুঃখ আর কতটুকু? কালিদাস নিয়ে আপনি যতই ডুবে থাকুন, ঘরে যে কালিদাসী রয়েছে তার মুখের কালি কে মুছবে? সে কি আপনার দাসী হয়েই জীবন কাটাবে। বই-পাগলার বউ হওয়ার দুঃখ অনেক। তাই শুনিয়ে শেষ করি। সেই বউ পুজোর ঘরে বসে বলছে - 'মা, সামনের জম্মে বই করে পাঠাস তাহলে যদি স্বামীর নজর পড়ে আমার উপর।' স্বামী সে কথা শুনতে পেয়ে বলল—'মা, যদি বই করেই পাঠাবি, তবে পাঁজি করে পাঠাস যাতে বছর বছর বদলাতে পারি।'

বইয়ের বিকল্প

প্রমথ চৌধুরী পুরনো কালের রচনা থেকে দেখিয়েছিলেন যে তখনকার দিনে সমাজে যেসব রমণী দাপটে থাকতেন, পুরুষরা যাঁদের কৃপা পাবার জন্য ব্যাকুল হতেন, সেই রমণীরা নিজেদের ঘর সাজাতেন রুচিসম্মত উপায়ে। ঘরের সজ্জায় যা-ই ব্যবহার হয়ে থাকুক না কেন, অন্তত একটি বই না হলে সে ঘরের সজ্জা সম্পূর্ণ হত না। এই উদাহরণ দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলতে চেয়েছিলেন যে বই হল মানুষের রুচির একটি বড় পরিচয়।

এখনো এই সজ্জা কেউ কেউ তাঁর ঘরে ব্যবহার করে থাকেন। বই এখনো কারো কারো কাছে ডেকোরেশন পিস্। আমি একটি যুগলকে জানি, যাঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে পরিচিত, তাঁদের দুজনের আলাদা বসবার ঘর—সেখানেই তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন অনেকে। এজন্য দুজনকে আলাদা করে সাজাতে হয়েছে দুটি ঘর।

দুজনের আলমারিতেই আছে রবীন্দ্র রচনাবলীর সমস্ত খণ্ড। এজন্য দু-সেট করে রবীন্দ্র-রচনাবলী কিনতে হয়েছে তাঁদের। ঠিক যেমন করে লোকে ঘরের পর্দা কেনে, মেঝের কার্পেট কেনে, ঠিক সেইভাবে এঁরা রবীন্দ্র-রচনাবলী কিনেছেন। বই কেউ পড়ে বলে মনে হচ্ছে না।

একসময়ে আমরা দেখতাম যে বিয়েতে উপহার হিসেবে বইয়ের প্রচলন ছিল ভালোরকম। এখন কিন্তু বই আর কেউ দেয় না। সকলেই বলে, কোনো কাজের জিনিস দাও। বই তাহলে কাজের জিনিস নয় আর।

বই কেনার বিরুদ্ধে একটা যুক্তি সবাই দেয় এখন, সেটা হল বইয়ের দামের উর্ধ্বগতি। দামটা সব সময়ই একটা বড়ো ফ্যাক্টর—তা সেটা বই হোক বা অন্য কিছু হোক। দাম বেশি বলে লোকে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এমন নয়। টিভি বা ভি-সি-আর কেনাও আটকাচ্ছে না কারো। বইয়ের দাম যে শুধু টাকায় হয় না একথাও কেউ বোঝে না।

আসলে বই পড়ার অভ্যাসটাই চলে যাচ্ছে মনে হয়। বই না পড়লেও চলে, টিভি সিরিয়ালেই সব দেখা যাচ্ছে, আবার পড়ার কী দরকার। আমেরিকান লেখক রবার্ট হাচিনস বলেছেন—টেলিভিসন নিয়মিত দেখার ফলে এখন আর কেউ গল্প করে না বা বই পড়ে না, যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে এমন প্রাণীতে পৃথিবী ভরে যাবে যার সঙ্গে নিম্নমানের উদ্ভিদের বিশেষ তফাত থাকবে না।

শুধু টিভি নয়, আর-একটা জিনিস হৈ হৈ করে চলছে, সেটাও এই অধোগতির জন্য দায়ী। সেটা হল কমিকস। সবকিছু এখন গোটাকতক ছবি দিয়ে সাজানো। টিনটিন বলুন, রবীন্দ্রনাথের জীবনী বলুন—সবই ছবিতে আঁকা হয়ে বেরোচ্ছে। তাতে দু-একটি কথা থাকে—অনেক সময়েই সেগুলো দু-একটি অব্যয় বা প্রশ্নচিহ্নেই শেষ হয়। পুরো বাক্য কেউ পড়তে পারে না আর। টেলিভিসন হোক বা কমিকস হোক—এরা সবাই সমাজে একটা anti-reading campaign চালু করে দিয়েছে। সরাসরি পড়তে বারণ করছে এমন নয়, কিন্তু পড়ার বিকল্প তুলে ধরছে সামনে। ভালো গল্প-উপন্যাস সিরিয়ালে তোলা হচ্ছে, তার মাথামুণ্ডু থাকছে কিনা তার বিচার করার মতো বিবেচনা আর কই? এখন জন্মালে যীশু খৃষ্টকে ক্রুসিফাই করাটা live দেখাত—action replayও থাকত। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ নিয়ে সিরিয়াল বানাতেন।

এই সিরিয়ালই এখন আমাদের সিরিয়াসলি পড়তে ভুলিয়ে দিচ্ছে। সেইসঙ্গে যোগ দিয়েছে কমিকস। কার্টুনের মতো ছবিতে এখন 'গোরা' পড়া হয়ে যাচ্ছে আমাদের। ভাবনাচিন্তার দায় নেই আর।

স্কুলের বই এখনো কিনতে হয়, সেইটা এখনো আমাদের বিপদ হয়ে রয়েছে। ইংরেজি স্কুলে আবার প্রচুর বই লাগে, সব দামি দামি বই —বছরের প্রথমে প্রচুর খরচ হয়ে যায় এতে। আর বই কেনার কথা কে ভাববে? খুব সম্ভবত স্কুলের বইয়েরও বিকল্প বেরোবে। ক্যাসেট তৈরি হবে, তাতে পড়াটা 'শোনা' হয়ে যাবে, বা 'দেখা' হয়ে যাবে। সেইসব পড়া এনজয়েবলও হবে, কারণ হয়তো কোনো পপুলার ফিল্মস্টার ঐ বইগুলো 'পড়বেন' বা 'দেখাবেন'। কম্পিউটার এখন ঘরোয়া বস্তু হয়ে উঠেছে, অনেকে এখন বাড়িতেই কিনছেন P. C. বা Personal Computer

—তার মধ্যে নানা Data থাকে ফাইলের মতো। সব 'পড়ার বই'য়ের জরুরি অংশ থাকবে সেই ফাইলে। দরকারমতো সুইচ টিপে ফাইলটা দেখে নিলেই চলবে।

অথচ আমরা বইমেলাতে যাই। যাই, কারণ ঐসব মেলার প্রলোভন না দেখালে বইয়ের দোকানে ঢুকি না আমরা। যেমন শীতকালে শহরে সার্কাস আসে, তেমনি বইমেলাও হয়। বেশ একটা বেড়াবার জায়গা হয়, বলতেও ভালো লাগে—বইমেলায় যাচ্ছি। বই যে কিনতেই হবে, এমন

কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ঘুরে-ফিরে খাবার খেয়ে ফিরে আসা! বইমেলায় বইয়ের স্টলের যা ভাড়া, তার চেয়ে বেশি ভাড়া দিতে হয় খাবারের স্টলে। কারণ খাবার লোকে কিনবেই, বই যে কিনবেই—এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

তবু কেউ কি আর বই কেনে না? গোড়ায় যে স্বামী-স্ত্রীর কথা বলেছি, যাঁরা ঘর সাজাবার জন্য দু-সেট রবীন্দ্র-রচনাবলী কেনেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বইমেলার নিয়মিত খরিদ্দার। কোনো বইয়ের পাতাও কাটেন না, শুধু ঘর সাজান। কিছু রমরমা বই বিক্রি হয়, বইমেলা থেকে বই নিয়ে না-ফিরলে কেমন যেন 'ইয়ে' মনে হয়ে। বইমেলায় যা হল হল, তারপরে সারা বছর আবার মাছিতাড়ানো। বউয়ের মতো সাজিয়ে গুজিয়ে দিলেও বই কেউ ফিরেও দেখে না।

তবে কি লোকে আর কিছুই পড়ে না? কী পড়ে? যা পড়ে, তা হল খবরের কাগজ। টাটকা চায়ের সঙ্গে বাসি খবর নিয়ে না বসলে খাবার হজম হয় না কারো। নানা ধরনের খবরের কাগজ—এমনকি অনেক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকাও দৈনিক কাগজের স্টাইলে বেরোয়। নানা রঙে মোড়া, জমজমাট শিরোনাম, অলীক উপাখ্যান, কারো কেচ্ছা বা কেলেঙ্কারী—এই হল এখন মানুষের reading material—লেখা নিয়ে খেলা, খেলা নিয়ে লেখা। সবটাই ছেলেখেলা। ছোটো ছেলেদের জন্যই। আমাদের পড়বার জগতে adult দের জন্য কিছু থাকে না বলেই for adult only বলে adulterated জিনিস চালাবার চেষ্টা করতে হয়।

মানুষ এখন খবরের কাগজ ছাড়া মন দিয়ে কিছু পড়ে না। কেউ পড়ে প্রথম পাতা কেউ দেখে সিনেমার পাতা, কেউ বা খেলার পাতা। যে যে-পাতাটা পড়ে, সেটা ছাড়া কাগজে আর কী থাকে, তা জানেই না সে। অনেকেই দেখেছি সাহিত্য সমালোচনার পাতাটা তাকিয়েও দেখে না, পাছে ভাবতে হয়। ওরা অবশ্য জানে না যে এসব পাতায় এখন যারা লেখে তারা নিজেরাও ভাবতে পারে না। অভাবনীয় সব লেখা বেরোয় এখন। এক অদ্ভুত চক্র তৈরি হয়েছে। চক্র না বলে চক্রান্ত বলাই ঠিক হবে।

বই কেউ কেনে না, তাই বইয়ের দাম কমানো যায় না। আবার বইয়ের দাম কম হয় না বলে কেউ কিনতে পারে না। একথা সত্যি কিনা তার সমীক্ষা কে করবে জানি না, তবে এটা বাস্তব ঘটনা যে কেউ আর পড়তেই চায় না। পড়বার অর্থ হল ভাবতে শেখা, কিন্তু ঠিক ওটাই বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা, তার চেয়ে সুখের অবস্থা আর কী হতে পারে?

কেউ তবু এরই মধ্যে নিশ্চয়ই বই কেনেন, বা না কিনতে পারলেও পড়তে চেষ্টা করেন—তাঁদের অসহায়তা অনুমানযোগ্য। এখন যাঁরা বই লেখেন, তাঁরাই সেই বইটা মাঝে-মাঝে কেনেন, যিনি Producer তিনিই Consumer।

স্কুল কলেজে যিনি শিক্ষকতা করেন, অর্থাৎ যাঁর পড়াবারই কাজ, তিনি পড়ান বটে, কিন্তু নিজে কিছুই পড়েন না। তার দরকার হয় না। সেই সময়টা তিনি নোট লেখেন, যাতে অনেক 'নোট' উপার্জন হবার রাস্তা হয়। নিজের লেখা নোট ছাপিয়ে তিনি টাঁকশালে ছাপা নোট ঘরে নিয়ে আসেন। বইয়ের বদলে মানে-বই পড়লেই চলে। নচেৎ পড়ার কোনো মানে হয় না।

এখন কোনো ছুটি পড়লে আর কোনো চিন্তা থাকে না মানুষের। ছুটি কাটানো এখন খুব সহজ। আগে দেখেছি সকলেই একগাদা বই নিয়ে বসত সারাদিন। কখনো এ-বই কখনো ও-বই। পড়ো, তারপরে তা নিয়ে তর্ক করো সবাইয়ের সঙ্গে। বই নিয়েই হৈ চৈ চলত। আজ আর প্রয়োজন নেই। ছুটি হলে লাইন দাও ক্যাসেটের দোকানে, তিন-চারটে ক্যাসেট এনে চালাও সারাদিন। মাঝে শুধু খেয়ে নাও দু-মুঠো। তারপরে আবার ছবি দেখো। খানিকটা পরে সব গুলিয়ে যাবে। এ ছবি ও ছবিতে তফাত করা যাবে না। তবু এ যুগে এ-ই হল এনটারটেনমেন্ট। এজন্য যদি মাথা ধরার অয়েন্টমেন্ট লাগাতে হয় তাও ভালো। চিন্তা নেই—শুধু সময় কাটিয়ে যাও। সময় কাটাতে পারাই হল সময়কে কাজে লাগানো।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এতটা সময় কাটে কী করে? বই পড়লে হয় মাথা ধরে, নয়তো ঘুম পায়। কোনো একটা নেশা চাই। সে নেশার হাড়িকাঠে পুরো শরীরটাই তুলে ধরেছি। বই ধরবার মতো হাত খালি নেই আর।

মডার্ণ ম্যানেজমেণ্ট

যে ভদ্রলোককে আমি খুঁজছিলাম, তাঁকে ফোনে পেলাম না। যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি বললেন, 'উনি একটা মিটিংয়ে আছেন।' বললাম, 'কতক্ষণ লাগবে ?'

'তা ঠিক বলা যায় না, এক ঘণ্টাও হতে পারে, দেড় ঘণ্টাও হতে পারে।

'এতক্ষণ হবে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুবই জরুরি মিটিং,-প্রোডাকশন রিভিউ।'

'তাহলে পরে ফোন করব ?'

'করতে পারেন। তবে এটার পরেই আর একটা মিটিং আছে।'

'আবার কিসের মিটিং ?'

'এবারে, দাঁড়ান বলছি। হ্যাঁ, এটা হলো প্রোডাকশন রিকনসিলিয়েশন।'

'সেটার মানে কি ?'

'তা বলতে পারব না।'

ফোন ছেড়ে দিলাম। পরে ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলাম। ওঁকে বললাম, 'এত মিটিং কিসের মশাই ?' উনি হাসলেন, 'মডার্ণ ম্যানেজমেণ্ট তো বোঝেন না। এই সব করেই ইণ্ডাস্ট্রি টিকে থাকে। সারভাইভালের যা লড়াই।'

আমি বললাম, 'সত্যি সত্যি এসব মিটিংয়ে কি হয় ?'

এবারে উনি গলা বদলালেন, 'কিছুই হয় না। একা বসে যেটা করব ভাবি, সবাই মিলে সেটায় ঠিক করি যে, কিছুই করা সম্ভব নয়।'

আমিও হাসলাম। উনি বললেন, 'আসলে এ সবে সিস্টেম তৈরি হয়। সিস্টেমই হলো আসল কথা। তারপরে তো সিস্টেম ধরেই এগোন যায়।' আমি বললাম, 'আর কি হয় আপনাদের ?'

'কত রকম ফাইল হয়েছে জান ?'

'ফাইল বাড়িয়ে কি হয় ?' আমি জানতে চাইলাম।

'খবর পাওয়া যায়, ইনফর্মেশন।'

'বুঝিয়ে বলুন।'

'যেমন ধর, তুমি একটা মাল কেনো। সেটার জন্য একটা ফাইল তৈরি হলো। প্রথম পাতায় থাকবে তার ঐতিহাসিক তথ্য, হিস্টরিক্যাল ডেটা।'

আমি অবাক হলাম, 'হিস্ট্রি? সে তো ইস্কুলে পড়েছি। রাজা-রাজড়ার কাহিনী।'

'আজকের রাজা-রাজড়া এরাই। এদের হিস্ট্রি মানে জিনিসটা কতদিন ধরে কেনা হচ্ছে, কে কে বিক্রি করছে, কত কত দাম ছিল, এইসব।'

'তারপর?'

'আর একটা পাতায় থাকছে, জিনিসটার বর্তমান তাবৎ খবর। মাসের প্রথমে কত জমা আছে। সে মাসে কত দরকার। কত কেনা হলো, কত খরচ হলো। এইসব আর কি।'

'ও বাবা।'

'বাড়িতেও এভাবে খরচের হিসেব রাখা যায়।'

'বললাম, 'রক্ষে করুন মশাই। এমনিতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। এ সব করলে তো পাগল হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।'

উনি হাসলেন। আমি বললাম, 'এত সব দেখে কে? কেন দেখে?'

'সবাই দেখে। ইনফরমেশন পায়।'

'কাজ করে কে তাহলে?' এ প্রশ্নের জবাব উনি দেন নি। আমি আবার জানতে চাইলাম, 'এতসব করে উপকার যদি হয়, তবে তো মনে হচ্ছে পেপার ইণ্ডাস্ট্রির উপকার হচ্ছে। কারণ খুব কাগজ কিনছেন আপনারা।' উনি আবার হাসলেন।

আমি বললাম, 'তাহলে তো মশাই, এ যুগে টিঁকে থাকাই মুস্কিল। এত সব খবরাখবর রাখতে হবে?'

'সেইটাই তো প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ।'

'আচ্ছা, এত যে প্রফেশনাল শুনি, প্রফেশনাল মানে কী?'

'দেখুন, প্রফেশনাল সে-ই যে তার পেশায় নিজেকে ক্রমাগত উন্নত করে চলে। নতুন নতুন ধ্যান ধারণাকে যে আয়ত্ত করতে পারে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তবে প্রফেশনাল যারা হয় তারা চট করে একটা মুখোশ পরে ফেলতে পারে। একটা নয়, একটার পর একটা। কখনো আপনার সঙ্গে হেসে কথা বলছে, পরের মুহূর্তেই আপনাকে যেন চেনে না। নিজের বাবার বয়সী লোককে অনায়াসে গাল দেওয়া এদের সহজাত ক্ষমতা। এদের প্রথম কাজই হলো লোকের মর্যাদা ভেঙে দেওয়া। তারপরে কখনো হেসে, কখনো চোখ রাঙিয়ে চালিয়ে যাওয়া। যে রোজই চোখ গরম করে, সে হাসলেই লোকে কৃতার্থ হয়ে যায়।'

উনি হাসলেন। আমি বললাম, 'এসব ইনফর্মেশনে কিছু সুবিধে হয়?'

'নিশ্চয়। যেমন ধরুন, কোনো ক্যান্টিন। এ ব্যাপারে প্রচুর ওয়েস্টেজ হয়। এখানে ফাইল খুলে দেখা গেল, ৮৬ সালে লেবু কেনা হতো দিনে ৭০০। ৮৭তে কেনা হতো ৭২৫। ঐ হিসেবটা প্রতি মাসে রাখা হলো। দেখা গেল জানুয়ারিতে ছিল ৭১৫, অক্টোবরে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৯০।'

'মানে' ?

'মানে কেউ রিটায়ার করেছে, কেউ মারা গেছে। এখন যদি কর্মী সংখ্যার একটা ফাইল রাখা হয় তাহলে দুটো মিলোলেই ধরা পড়বে যে আমরা লেবু বেশি কিনছি কিনা। ৮৯তে খরচ কমানোর একটা পরিকল্পনা এভাবেই ছকে নেওয়া যেতে পারে।'

'তাহলে আপনারা এখন সব সময়েই মিটিং করছেন ?'

'হ্যাঁ তা করছি। কষ্ট, প্রফিট, 'এ্যাডভ্যার্টাইজিং, এ্যাসেটস ভার্সাস লায়াবিলিটিজ।'

'বলেন কি ?'

উনি বলে বসলেন, 'হ্যাঁ, যেখানেই যাই, সঙ্গে প্যাড আর পেন্সিল থাকেই। সেদিন তো বাথরুমে গিয়েছি, দেখলাম সেখানেও একজনের হাতে প্যাড আর পেন্সিল।'

'কি সাংঘাতিক।'

'বটেই তো। আবার মজাও আছে। একদিন আমাদের ডিরেক্টরও ঢুকেছেন ঐ বাথরুমে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি তো প্রায় প্যাড খুলে ফেলেছিলাম আর কি। যদি কিছু বলে ওঠেন, লিখে নিতে হবে।'

'আচ্ছা এত মিটিং করে আপনাদের গুলিয়ে যায় না ?'

'তা একটু যায়। আমি তো একদিন তিনটে মিটিং সেরে এসে দেখলাম, যা যা নোট নিয়েছি তার কোনটার সঙ্গে কোনটা মিলছে না। প্রোডাকশনের মিটিং আর প্রফিটের মিটিং একাকার হয়ে গেছে। তারপর থেকে প্রথম মিটিংটাই শুনি, পরেরগুলো আর শুনি না। বরং পারলে একটু ঘুমিয়ে নিই। কেউ কেউ ছবিও আঁকে।'

আমায় হাসতে দেখে উনি বললেন, 'তাতে অসুবিধে হয় না। কারণ কথা খুব একটা বলতে হয় না। একজনই বলেন। আমাদের শুধু শুনে যাওয়া। বাড়িতে বৌয়ের কথা যেমন মাথা নিচু করে শুনি, এও তাই।'

'তাহলে তো খুব জটিল ব্যাপার নয়।'

'মোটেই নয়। একবার মিটিং অভ্যাস হয়ে গেলেই হলো। তারপরে

আপনি ঠিক জেনে যাবেন কখন হ্ঁ হ্যাঁ করতে হবে, কতক্ষণ বাদে পেছনে বসে একটু দ্-চোখ ব্জে নিতে পারবেন, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'তা এসব মিটিংয়ে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন আপনাদের বলতে হয় না কিছ্ ?'

ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন, 'পাগল নাকি। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়। একবার একটা ব্যাপারে ডিসিশন নিয়ে ম্শকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। ঐ একই ডিসিশন ডিরেক্টরও নিলেন কিন্তু আমাকে বললেন, আপনি তো ডিসিশন নিতে পারেন না।'

আমি বললাম, 'সেই শাশ্ড়ী বৌয়ের গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক উৎসুক হলেন—'সেটা কি ?'

আমি তখন বললাম, 'এক শাশ্ড়ী গঙ্গা চান করে ফিরছেন। গলির মোড়ে এসে দেখলেন, তাঁদের বাড়ি থেকে এক ভিখারী কাঁদ কাঁদ ম্খে বেরিয়ে যাচ্ছে। উনি তাকে জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে তোমার ? ভিখারী বললেন, ভিক্ষে চেয়েছিল্ম, তা বাড়ির বৌ বললে, ভিক্ষে হবে না। শাশ্ড়ী রেগে আগ্ন, 'এটা কি বৌয়ের বাড়ি যে ও একথা বলে ? এসো তুমি আমার সঙ্গে।' ভিখারী আশান্বিত হয়ে শাশ্ড়ীর সঙ্গে ফিরে

এল। দোরগোড়ায় এসে শাশুড়ী ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'শোন এটা আমার বাড়ি, আমি বলছি, ভিক্ষে হবে না।'

দুজনেই হাসলাম খানিকটা।

উনি বললেন, 'সে জন্যই সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের মিটিংয়ে অনেক এক্সপার্ট'কে ডাকা হয়। এই তো ক্যাম্টিন কস্ট নিয়ে বড়ো মিটিং হয়ে গেল। ভারতবর্ষের অনেক নিউট্রিশান স্পেশালিস্ট এসেছিলেন। মিটিং, লাঞ্চ। তবে রেজাল্ট পাওয়া গেল।'

'কি পেলেন ?'

'ঠিক হলো যে, আমরা সীজনাল ভেজিটেবলস্ খাব। ঐ যে গরমকালে গাজর কেনা হতো, সেটা ঠিক নয়। বৈশাখ মাসে ডালে টমেটো দেবারও দরকার নেই। গরমকালে এমনিতেই খাওয়া যায় না, তখন ভ্যারাইটিজ খোঁজার মানে হয় না। বরং শীতকালে এপিটাইটটাও বাড়ে ফ্রেশ ভেজিটেবিলস্'ও পাওয়া যায়, তখন ওগুলো খাওয়া ভাল।'

আমি বললাম, 'এতো মশাই আমার বৌ এসব ঠিক করতে পারে আরো ভাল। মাসের প্রথম সপ্তাহে মাছ মাংস ডিম আসে দ্বিতীয় সপ্তাহে মাংস বাদ যায়। তৃতীয় আর চতুর্থ সপ্তাহ নিরামিষ।'

উনি গম্ভীর হলেন, 'এটা আপনার বাড়ি নয়। একটা মডার্ণ অর্গানাইজেশন।'

ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি

বছর বাইশ-তেইশ বয়স হবে। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি। এরা সরাসরি এক একটা ম্যানেজার হয়ে বসবে। কেউকেটা হবে। কেউটের মতোই কাটবে সবাইকে। এরা রাতারাতি তাদের ওপরওয়ালা হবে, যারা বাইশ তেইশ বছর চাকরি করছে। এদের জীবন স্বরু হয় যেখানে, অনেকে সেখানে শেষ করতেও পারেনা। ভাল স্টার্ট পেয়ে এরা ভাল স্প্রিন্টার হয়। স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে এদের স্যালারি এবং পার্কুইজিট্স, সংক্ষেপে পার্ক্স। এদের নাম এম. টি।

দেশশুদ্ধ মা বাবা চাইছে তাদের ছেলে (আজকাল মেয়েরাও) এইরকম ট্রেনি হয়ে বসুক। নিরাপদ এবং উন্নতিশীল জীবন। সেজন্য এখন সবার ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। বাংলা স্কুলে নাকি ছাত্র হয় না। বাংলা না শিখলেও চলে, ইংরেজিটা শিখতেই হবে। হতে হবে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি—চালাতে হবে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। শেষ লক্ষ্য ডিরেক্টর। এম. টি থেকে এম ডি। আমি এক এম ডি-কে জানি, যিনি বলতেন, 'কোম্পানীজ ফিনান্সিয়াল পজিশন ইজ ব্যাড। এখন আর ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল সারভাইভ করার জন্য স্যাক্রিফাইস করতে হবে। শুধু মিনিমামটুকুই পাওয়া যেতে পারে।'

উনি নিজে অবশ্য তাই করেন। চড়েন শুধু এয়ারকণ্ডিশন্ড গাড়িটা। অন্যটা বোধহয় পড়েই থাকে। হয়তো বাজার করার দরকার হলে ওঁর ড্রাইভার ওটা নিয়ে বেরোয়। প্লেনে ট্রাভেল করতেই হয়, তাতে সময় বাঁচে আর সময়ই তো টাকা, টাইম ইজ মানি। জরুরী কনফারেন্স এখন প্লেনেই সেরে নেন উনি।

এসব চাকরিতে বাংলা ভুলে যাওয়ায় একটা গৌরব থাকে। এটা মানতেই হবে এদের জীবনে জটিলতা কম। বাড়ি ফিরে একটা সাওয়ার বাথ, তারপরে বিয়ার। এরপরে স্টেক-এ তাস খেলা, আবার বিয়ার এবং হুইস্কি। হ্যাঙওভার দিয়ে দিন সুরু। মাঝে মাঝে এরা মুভি দেখে। কোথাও যখন ট্যুরে যায় সেখানকার যে সংস্কৃতির পরিচয় এরা অবশ্য পেতে চায় সেটা হল

কাব্যারে। তার সমীক্ষায় এরা দিন কাবার করে দেয়। কোনটা বোরিং, আর কোনটা দেখে এনথু পাওয়া যায় তার আলোচনায় এরা প্রত্যেকেই কনোশার।

বাড়িতে তাস, মদ, তারপরে ক্লাবে গিয়ে আবার মদ এবং তাস—বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াটা এত সরল করে ফেলেছে এরা যে দেখে ঈর্ষা হয়। এদের মুখে উদ্বেগ শুধু যখন প্রমোশন আর ইনক্রিমেন্টের তালিকা বেরোয়। তখন এরা একটু ডিপ্রেস্‌ড থাকে যদি কেউ তাদের টপকে যায়!

ছেলেদের এই কৈবল্যধামে পেঁছে দেবার জন্য খুব চিন্তিত আছি। কি জানি কি হয়। রামায়ণ মহাভারত আজকাল পড়তে হয় না। কোন
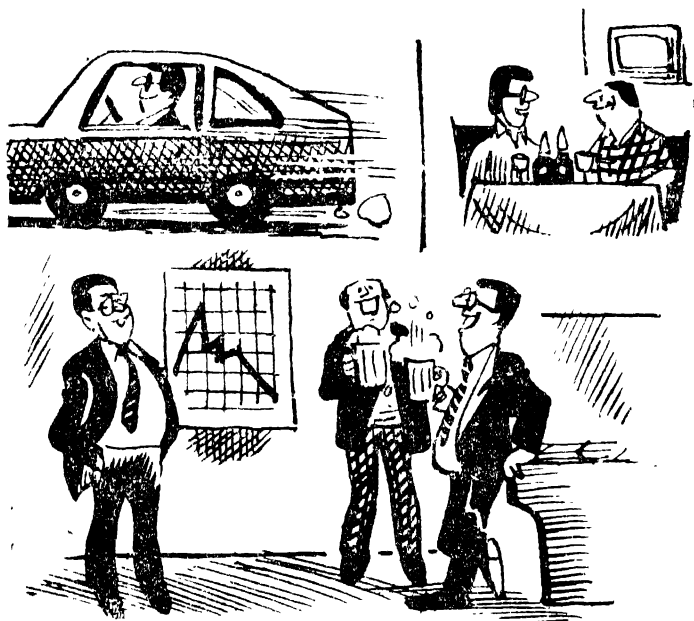
বিদেশি যদি ইণ্ডিয়ান এপিক নিয়ে উৎসাহ দেখায়, তখন একটু বোলচাল দিতে পারলেই হল। এখন পড়তে হবে টিনটিন। এগুলো রামায়ণ মহাভারতের পরে বেরিয়েছে—নিশ্চয় এরা উন্নততর। দি ওয়ার্লড ইজ প্রোগ্রেসিং।

এছাড়া পার্টিতে যেতে হবে। সব পার্টিই এক, কোন আলাদা চরিত্র নেই কোথাও। জিন্‌ এ্যাণ্ড লাইম দিয়ে সুরু, ফিস্‌ ফিঙ্গারগুলো সবাই ফিঙ্গার বাড়িয়ে তুলে নেয়। ইংরেজি গানের রেকর্ড বাজে, যারা স্মার্ট তারা

সেইসঙ্গে কোমর দোলায়। ছেলেদের কি কোন নাচের ক্লাশে ভর্তি করে দেব ?

অনেকদিন বাদে এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সেও এম. টি ছিল। এখন সে নিজেকে এক্সপার্ট ভাবছে মনে হল। আমি যে এখনো রবীন্দ্রনাথ পড়ি, এখানে ওখানে নির্ভেজাল বেড়াতে যাই, পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করি, সেসব শুনে সে বলল—ইউ আর হ্যাভিং রিয়েল ফান অফ লাইফ।

নদীর ওপারের হাহুতাশ শুনে আমি তো হাঁ।

বাংলা সাহিত্যের কর্মখালি

বাংলা সাহিত্য বিভাগে দুটি জরুরি পদ অনেক দিন হল খালি রয়েছে। অথচ সে দুটি পূর্ণ করার কোন উদ্যোগ কেউ নেয়নি। আসলে কেউই তো অপরিহার্য নয়—ও দুটি পদে কেউ না থাকলেও বাংলা সাহিত্য বিভাগের কাজ আটকে নেই। সেই জন্যই কেউ গা করেনি। এই বিভাগে আর সবই আছে, বোধ হয় একটু বেশিই আছে। সম্পাদক, প্রকাশক, দপ্তরী, ইলাসট্রেটর, কার্টুনিস্ট, বিক্রেতা, ক্রেতা - কিছুরই অভাব নেই। যে দুটি পদ খালি আছে, সে দুটি হল সাহিত্যিক ও পাঠক।

এর পরে প্রশ্ন উঠবে পারে, তাহলে কাজ চলছে কিভাবে ? ঐ যে বললাম, কেউই আর অপরিহার্য নয়। সাহিত্যিক এবং পাঠকের কাজ করানো হচ্ছে লেখক আর ক্রেতাকে দিয়ে। অবশ্য সাহিত্যিককে লেখক হতে হয়, তবে লেখকের পক্ষে সাহিত্যিক না হলেও চলে।

এখন যে সব বই বেরোচ্ছে, বাংলায় তা সবই কোনো না কোনো লেখকের লেখা, সাহিত্যিকের নয়। সে সমস্ত বই পড়বার জন্য কোনো পাঠক নেই, ক্রেতা রয়েছে। লেখক হতে গেলে যা দরকার তা কোনো লেখার হাত নয়, শুধু হাতের লেখা হলেই চলে। যে কোনোদিন কাউকে কখনো চিঠি লিখেছে বা বাজারের ফর্দ লিখেছে শুনে শুনে, সেই লেখক। তার পক্ষে বাজারি বই লেখা খুব সহজ। যে লিখতে পারে, ভাবতে পারে না, এমন

লেখকই এখন বই লিখছে রোজ। যেমন বাজারে রোজ যা আনতে হয়, তা আমাদের প্রায় মুখস্ত, বাজারি লেখাও তাই। বাজারে আপনাকে রোজ আলু, শাক, উচ্ছে, পটল, মুলো আনতেই হয়, মাছও আনেন একটু। কুমড়ো আনতে ভুলে গেলে আবার বউয়ের ধমকানি খেয়ে আর একবার যেতে হয় বাজারে। বাজারি লেখাও তাই। ছেলেমেয়ের প্রেম নিয়েই গল্প বানাতে হয়, শুধু প্রেম দেখালেই চলে না—প্রথম পরিচয়ের পরে দু'একবার বিছানায় শুইয়ে ফেলা দেখাতে হয়। তবে নায়িকারা আজকাল বীর রমণী হয়ে গেছে। তারা কথায় কথায় ফুঁপিয়ে কাঁদে না, এ সব ব্যাপার তারাও বেশ এনজয় করে থাকে। তবু দু' একটা চরিত্র রাখতে হয় যারা দরকার মতো কেঁদে কঁকিয়ে উঠবে—টিভিতে সিরিয়াল হলে এগুলো বেশ জমে যায়। এক একজন বেশ বড় বড় কথা বলে, দাঁড়ি রাখে। অনেক আদর্শবাদী, বোধ হয় ব্লেডের পয়সা জোটাতে পারে না তারা। কেউ কেউ খুব স্ল্যাং বুলি ঝাড়ে, মেয়েদের সামনেও বলে—এসব কেনেও অনেকে। আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যে পাঠকও নেই, শুধু ক্রেতা আছে। যেমনভাবে লোকে বাজারে গিয়ে টিপে টুপে দেখে আলু বেগুন টোমেটো কেনে, সেই রকম দেখে শুনে এরা সাহিত্য কেনে। পড়ার ক্ষমতা এদের নেই, কেবল কোন পাতায় উত্তেজক ব্যাপারগুলো আছে, এইটা জেনে নিয়ে সেই পাতাগুলো উল্টোয় এরা।

বাংলা সাহিত্যে এখন বইয়ের বদলে এসেছে কমিকস। এগুলো লেখা আরো সোজা। একজন শুধু ছবি এঁকে যাবে, আরেকজন শুধু সেই ছবিতে ছোট ছোট সংলাপ বসিয়ে যাবে। এতে রামায়ণ মহাভারত সব মিনিয়েচার ফর্মে জানা হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্র রচনাবলী যদি এভাবে বেরোয়, তাহলে লোকের খুবই সুবিধে হবে। রবীন্দ্র জীবনী তো ছবিতে বেরিয়েছে এর মধ্যেই, এখন ঐ গল্প উপন্যাসগুলো বেরোলো বলে। প্রবন্ধ তো কেউ পড়ে না, এগুলো পড়েই থাকবে। কমিকস্ না বেরোলে ট্র্যাজেডি হয়ে যেত। ভাগ্যিস কমিকস্ বেরিয়েছে তাই তো সাহিত্য এখনো চলছে। সুবিধে এই যে, এজন্য সাহিত্যিক চাই না, লেখক হলেই চলে। কত সহজে ধ্রুপদী সাহিত্য সম্বন্ধে জানা হয়ে যায়। এ সব বই লেখার আর একটা ভাল দিক হল যে, এ সব নিয়ে সিনেমা বা টিভিতে ছবি হয় খুব। লেখকের কৃতিত্ব তখনই বোঝা যাবে যখন তার লেখা বই শুধু ক্রেতাই কিনবে না, ছবির জন্যও কেনা হবে। একই বই একবার বড়ো পর্দায়, আর একবার ছোট পর্দায় তোলা হচ্ছে। গাঁটের কড়ি দিয়ে যে বই কিনলাম, পরে ঐ দুটো পর্দায় মিলিয়ে নেব বলে। কোন সময়ে কি হয়েছে, তখন অসময় ছিল, জানতে পারিনি, আজ এই সময়ে সব বুঝে নিচ্ছি। মহাকাল তো জেগে

আছেন কালপুরুষের মতো, আমরা যারা কাপুরুষ, আমাদের জানার জন্যই তো এত ব্যবস্থা।

আগেই বলেছি বাংলা সাহিত্যে কেবল লেখকই নেই সম্পাদকও আছেন। তাঁরা খুব সযত্নে কত রঙচঙে কাগজ বার করছেন, আমরা আনন্দে পড়ছি সেসব। কত খবর তাতে মেয়েদের গোপন কথা, ছেলেদের আপন কথা, ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ভীষণ কথা,—খুব জমেছে কিন্তু।

এইসবই চলছে। ভালো প্রবন্ধ বা গভীর উপন্যাস এখন কেউ লেখে না। কারণ কোনো সাহিত্যিক এখন লিখতে আসেন না। সাহিত্য আগে ছিল

জীবন, এখন হয়েছে জীবিকা। এখন এখানে প্রমোশন পাবার জন্য সবাই ব্যস্ত। গল্পের পাতা ফাঁপিয়ে উপন্যাস এবং উপন্যাস থেকে সিনেমার চিত্রনাট্য অথবা টিভির চ্যানেল,—এই রকম চ্যানেল ধরেই এগোতে চাইছে সবাই। এখনকার বই দুম করে জমে যায়, আবার দুমাসেই দমাস করে শেষও হয়ে যায়। দুবার পড়ার মত বই কেউ লেখে না। পারে না বলেই লেখে না। একবার লেখে পরেরবার প্রাইজ পায়, তারপরের বার ভুলে যায়। কাগজের কাপে চা খাওয়ার মতো, খেয়েই ফেলে দাও। ও কাপে আর কেউ

খাবে না, ও বই আবার পড়া যাবে না। তবে যতক্ষণ ধরে আছেন, ততক্ষণ হাতে গরম চা, পাতে গরম বই। এ বিষয়ে একটা গল্প বলতেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মফস্বল থেকে একটি ছেলে এসেছে কলকাতায়। বইপাড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে, বই কেনা বেচা। সে শুনছে যে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে সেলসম্যান ক্যাসমেমো কাটছে,—'একখানা গোরা, এক খানা পথের পাঁচালি, বিশখানা ফাগুন গিয়েছে চলে।' মফস্বলের ছেলেটি বুঝল যে ঐ 'ফাগুন গিয়েছে চলে' বইটাই তখনকার উৎকৃষ্ট বই। দুবছর বাদে সে আবার এসেছে কলকাতায়। এবারেও দাঁড়িয়েছে বই পাড়য়। এবারে সে কাউণ্টারে শুনতে পেল—'দুখানা গোরা, তিনখানা পথের পাঁচালি, পঁচিশটা প্রেম এসেছিল জীবনে'। আগের বারের মত এবারেও সে ভাবতে পারত যে 'প্রেম এসেছিল জীবনে' বইটাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু সে বুঝতে পারল আসলে ঐ, গোরা, পথের পাঁচালি এরাই থাকছে, বদলে যাচ্ছে সেইসব বই যারা এক সময়ে হট্‌কেকের মত বিক্রি হয়, দুদিন বাদেই চট্‌ করে ফুরিয়ে যায়। সাহিত্যিক আর লেখকের তফাৎটা সে বুঝতে পারল এবারে।

যেহেতু এখন সাহিত্যিক বা পাঠক কেউ নেই বাংলা সাহিত্যে, সেজন্য সাহিত্যের কদর বা বইয়ের আদর এখন আর হয় না। সে সাহিত্যিক কোথায়, যিনি সঠিক শব্দটি খুঁজে না পেলে লিখবেনই না, সে পাঠক কোথায় যিনি সাহিত্যিকের ত্রুটি দেখলে দুর্বিনীত হয়ে উঠবেন? অত যত্ন করে লেখেই বা কে, পড়েই বা কে? বই না পড়ার অনেক কারণ দেখায় সবাই। কেউ সন্ধ্যা বেলায় কারণ পান করেন, এত খাটতে হয় যে তা না হলে শরীরে জুৎ পাওয়া যায় না; কেউ বলেন, বইয়ের খুব দাম। মদের দামও বেড়েছে, কিন্তু কেউ তার জন্য মদ খাওয়া বন্ধ করেনি। আসলে বই এখন কেউ—পড়তেই পারে না আর। বই হাতে নিলেই ঘুম পায় সকলের। তাছাড়া এখন প্রত্যেকে স্বামী ব্যস্ত, বউ ব্যতিব্যস্ত। বই পড়ার সময় বা বুদ্ধি নেই কারো। বড় জোর কোন ম্যাগাজিন, তাও 'ম্যাগাজিন' শব্দটাও পুরো বলে না অনেকে, বলে 'ম্যাগস্‌'—যেন ম্যাগি খেতে চাইছে দুমিনিটে রান্না হয়, দুমিনিটে পড়া হয়ে যায়; ম্যানেজমেণ্ট পড়লে যেমন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পাওয়ার সুবিধে, ম্যাগাজিন পড়লে তেমন দুনিয়ার খবরের চোলাই টেনে নেওয়া যায়। ওতেই হয়ে যাচ্ছে, আর কিছু লাগে না। সাহিত্যিক আর কেউ হয় না, হয় সাংবাদিক। সংবাদ ছাড়া আর সব বাদ। ওতেই ধন্যবাদ। ধন্য হয়ে যাচ্ছে ওতেই।

বই যদি পড়তেই হয়, তবে রেসের বই পড়ো। পড়ো-পড়ো জীবনকে যদি একটু তুলে ধরে ছুটিয়ে নেওয়া যায়, সেই চেষ্টাই কর। সেই মন্ত্রই

লেখা আছে ওই বইতে। তারই মন্ত্রণায় যদি শেষে যন্ত্রণাই মেলে, তবু হাল ছাড়ে না কেউ, আরো একবার দেনা করে মাঠে যায়। যে ঘোড়াই ধরে তার মুখে ফেনা উঠে যায়, তবু ওই বই কেনা ছাড়ে না কেউ।

আনন্দ লোকে কিসে পায়, তা বোঝা শক্ত নয়। বউয়ের মত সাজিয়ে দিলেও বই প্রায় কেউ চাইছে না। যারা লিখছে তারাও বইয়ের বদলে ঘোল খাওয়াচ্ছে আমাদের।

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আগে বই পড়তেন খুব। মনে রাখতে পারতেন অপরিচিত কবিতার পংক্তি। অফিসে ইদানিং তাঁর উন্নতি হয়েছে। তাঁকে যখন বললাম,—'আপনি তো বই পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।' উনি বোধহয় লজ্জিত হলেন। বল্লেন,—'ভাবছি, চাকরিটা ছেড়ে দেবো। ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরবো বই পড়া।'

সে ভুল তিনি নিশ্চয় করবেন না। তবু তাঁর মনে হয়েছে যে বই পড়াটা দরকার। এই 'মরা মরা' বলতে বলতে যদি 'রাম রাম' বেরোয় একদিন মুখ থেকে, সেই ভরসাতেই আছেন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক আর অঙ্গুলিমেয় পাঠক।

রবীন্দ্রচর্চার এদিক-ওদিক

যাঁদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিন্দুমাত্র যোগ ছিল, তাঁরা সবাই রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ভি-আই-পি ট্রিটমেণ্ট পেয়েছিলেন। দেশ জুড়ে সেই সময়ে যেসব অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তাতে এঁরা সবাই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে দূরে থেকে দেখেছেন, এমন মানুষও সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মতই খাতির পেয়েছেন। তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের আমলের স্মৃতি মন্থন করতেন সব অনুষ্ঠানে। এমন একটি সভায় আমি এক বক্তাকে দেখেছি, যিনি এসেছিলেন খালি পায়ে, ধুতিটা হাঁটুর ওপরে তোলা। দেখে অবাক হয়েছিলাম—ইনি কে? তারপরে যখন ওঁর বক্তৃতার পালা এল, তখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। সেই সময়ে সকলেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের কথা বলে শুরু করতেন, ইনিও তাই করলেন,—'তখন আমি শ্রীনিকেতনের মাঠে গরু চরাতাম।'

সেই শুরু হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ হয়ে দাঁড়ালেন বাঙালির মূলধন। তাঁকে নিয়ে কত লোকের যে রুজি রোজগারের পথ খুলে গেল তার হিসেব করা মুশ্কিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে কম রোজগার করতেন না, তা আমরা জানি। ভদ্রলোক একাই, শুধু তাঁর লেখা বেচে একটা ইউনিভার্সিটি চালাতে লেগে গিয়েছিলেন। তখনো সেটার নাম ইউনিভার্সিটি হয়নি, কিন্তু ইউনিভার্সে ছড়িয়ে গিয়েছে তার নাম ডাক। শান্তিনিকেতন, এই ডাক নামেই তাকে সবাই তখন থেকেই চিনে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়েও বলেছেন কোন কোন বক্তা,—এত 'কম ইনভেস্টমেন্টে এত বড় ব্যবসা করা যায়, তা শুধু রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন। কেবল কিছু কাগজ আর কিছু কালি, এই হল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। বাকিটা তাঁর লেবার। ম্যান পাওয়ার লাগছে না, কিন্তু মাস প্রোডাকশন হয়ে যাচ্ছে। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এত ভাল হয়েছে এতেই। ওয়ার্কফোর্স কম রেখেছেন বলেই জিনিসের গুণ বজায় আছে, কোয়ান্টিটিও তো কম নেই। বিক্রিও খুব ভাল। এখনো তাঁর কবিতার বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। রবীন্দ্রনাথ যে এত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, এটা কেউ ভেবে দেখেননি। আমার মনে হয়, এ নিয়ে যদি কোন তরুণ গবেষক কাজে নামেন, তাহলে একটা বড় কাজ হবে। অন্য প্রোডাক্ট বাজারে বেরোলেও এখনো তাঁর জিনিসের ডিমান্ড এত বেশি থাকছে, এ ব্যাপারটা গবেষণার যোগ্য। এখনো যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের কোন অপ্রকাশিত রচনা বের করে ফেলতে পারে, তাও বিকোচ্ছে খুব। এত চিঠি তাঁর এদিক ওদিক থেকে বেরোচ্ছে যে মনে হয় কেউ যদি চেষ্টা করে তাঁর চিঠি লিখতে পারে, তবে তারও ডিমান্ড হবে খুব।'

বক্তার কথাগুলো আমি অনেকটাই তুলে দিলাম। এতে জিনিসটা বোঝা যাবে। বাঙালি রবীন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক দিকটা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে বহুদিন। রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়ে করে খাচ্ছেন এমন লোক এবং স্ত্রীলোক এখন শুধু অলিতে গলিতে নয়, দেশ-বিদেশের পথেও 'চলিতে চলিতে' তাদের দেখা পাওয়া যাবে। সাক্ষাৎকার নিতে হলে মাঝপথে এঁদের মোটরকার থামিয়ে সাক্ষাৎ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের গান এখন সবাই শেখে। শেখে, কারণ এর প্রসপেক্ট আছে। যে জন্য ভালো হোক বা মন্দ হোক, সব ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চেষ্টা করে, তাতে কারো ভালমন্দ হয়ে যাক, তাতেও কিছু এসে যায় না,—তেমনিভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে সবাই। ট্রেড হিসেবে এর স্কোপ খুব। বায়োস্কোপে তো এ গান গাওয়া হয়ই, এছাড়া দূরদর্শনে, জলসায়

এ গান গাওয়া হবেই। একটু গাইতে পারলেই, বা না পারলেও, সেক্ষেত্রে অবশ্য আপনার হাই-লেভেলে লবি থাকা চাই,—আপনি শুধু পাড়ার স্টেজেই গাইবেন এমন নয়, শেষ পর্যন্ত সব স্টেজ ম্যানেজ করে বিদেশ বিভুঁইতেও গাইতে চলে যেতে পারবেন। খুব বেশি গান না শিখলেও হয়, সকলেই প্রায় একই গান গেয়ে থাকেন। শ্রোতারা বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া একই গানের কমপেয়ার করে কাউকে কম বা বেশি পেয়ার করেন। আমরা শুনেছি রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দু হাজার। না কি পাঁচ হাজার? হাজার বার এ তথ্যটা শুনলেও গান শুনেছি বড়ো জোর দুশটা। এত আবার কে খুঁজে পেতে শেখে। বেতারে একই দিনে একাধিক শিল্পীর গলায়

একই গান শোনা গেছে, এমন ঘটনা কোন দুর্ঘটনা নয় আর নয় কোন রটনা। মাত্রা না ছাড়লেও, এমন ব্যাপার একটিমাত্র নয়। সুবিধে হল এই যে গান গাইতে গিয়ে গান এখন বুঝতে হয় না আর। যে গায়, সেও বাণীর মানে বোঝে না, যে শোনো সেও তাই। ফলে গান গাওয়া আর শোনা অনেক সহজ এখন। গানের স্টকও বেশি নয় কারো। মেয়ে দেখতে গেলে যে গান, বাসরঘরেও তাই। বাসরে যা, কোন আসরেও তাই। শ্রাদ্ধবাসরের গানই কেবল আলাদা লিস্ট করা আছে।

বিয়ের জন্য এখন শুধু বি-এ পাশ করলেই হয় না, রবীন্দ্রনাথের গানও

শিখতে হয়। বি এ পাশ না করলেও চলে, প্রেমের গান জানা থাকা চাই। তাতে প্রেম হয় কি না জানি না, তবে বিয়ে হতে পারে। বউ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, এটা বউয়ের এ্যাডেড্ কোয়ালিটি। এখন মেয়েরা গান শিখতে শুরু করেই রেডিও বা টিভিতে গাইতে চায়। আগে মেয়েরা গান গাইলে লোকে ভুরু কুঁচকাতো, এটা কি নটীর বাড়ি নাকি? আজ মেয়েরা গান গেয়ে পয়সা আনলে তার কেরিয়ারের সম্ভাবনায় ধন্যি ধন্যি পড়ে যায়। নিদেন-পক্ষে সে একটা গানের ক্লাশ খুলে বসে। গান কেউ মনের আনন্দে গায় না, গায় রোজগারের জন্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রায় বন্দুকের সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এদের গলায়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সবচেয়ে বড় ক্যাপিটাল, সবচেয়ে বড় সেলস পোটেনশিয়াল তাঁর।

শুধু গান নয়, তাঁর কবিতা আবৃত্তিরও এখন খুব রমরমা। আবৃত্তি শেখাবার ক্লাশ খুলে ফেলেছে অনেকে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং 'রবীন্দ্রোত্তর কবিতা' সবই পড়া হয়। তবে এখনো রবীন্দ্রনাথেরই মার্কেট, তাঁর কবিতা শুধু যে পঁচিশে বৈশাখ বা বাইশে শ্রাবণেই চলে তাই নয়, সারা বছর সবরকম কাজেই লাগে। প্রায় দশকর্মা ভাণ্ডারের মতো,—সব কাজেরই জিনিসপত্র পাওয়া যায়। দশকর্মা ভাণ্ডারের জিনিসগুলো আমরা চিনি না, যা দোকানে দেয় তাই নিয়ে নিই। রবীন্দ্রনাথের গানেরও আমরা মানে সত্যি বুঝতে পারি না, তবে এটা পাব্লিক যে ভালো খায়, এটা জানা আছে।

রবীন্দ্রনাথ আমরা কেউ বুঝি না, পড়িনা ভাল করে। তা যদি পড়তাম, যদি বুঝতাম, তাহলে আমাদের জীবন অন্যরকম হতো। আপাতত রবীন্দ্রনাথ নামটাই যথেষ্ট,—আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের টেগোর। তারপরে ভুল উচ্চারণে গান, ভুল ছন্দে কাব্যপাঠ। ডাক থেকে পেড়ে আনা হাজারবার গাওয়া গান,—হে নূতন, দেখা দিক আরবার,—তাই নিয়েই তাক করে আছি, তাকিয়ে আছি আরেকটা পঁচিশে বৈশাখের দিকে। এইভাবেই কয়েক লক্ষ অনুষ্ঠান হয়ে যাচ্ছে সারা দেশে। লক্ষ্য শুধু একটাই। যাতে লোকে আমায় চেনে, রবীন্দ্রনাথকে না চিনলেও চলবে। রবীন্দ্রনাথের সুতোয় আমার ঘুড়ি ওড়ানো। নাম লেখা তাতে আমার —বড়ো বড়ো করে মোটা অক্ষরে যতনে লাইন টানি। ওই ছুতোয় নিজের ঢাকটা পিঠে তুলে নিজেই বাজানো। কোনো ঢাকাঢাকি নেই এ ব্যাপারে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করাও একটা বড়ো ব্যবসা। যে ভালো করে হাত-পা নাড়তে পারে না, সেও নেমে পড়েছে নাচতে, উঠে পড়েছে রবীন্দ্রসদনে। নাচতে নাচতেই ভাবছে কবে ডাক পাবে টিভিতে। যে

গানের সঙ্গে সে নাচছে, সে গানের মানে সে জানেনা, তবু নাচতে তাকে হবেই। সে নাচের মুদ্রা দেখতে মুদ্রা খরচ করবে যারা, তারাও আসছে শুধু নিজেদের প্রেস্টিজ বজায় রাখতে। এই জন্যই রবীন্দ্র নৃত্যের কোন ঐতিহ্য তৈরি হয়নি। এ নাচ সবাই নাচে। নেচেই বেঁচে আছে অনেকে। এই তাদের রোজগার। এইসব শিল্পীরা দল বেঁধে চলে যাচ্ছে বাংলার বাইরে, কখনো ভারতের বাইরে। ভাইরে, সেখানে হৈ হৈ করে আসছে সবাই, রবীন্দ্রনাথ মরমে মরে যাচ্ছেন। বেঁধে মারছে কবিকে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকও অভিনয় হয় পঁচিশে বৈশাখের হুল্লোড়ে। এ যুগ হুজুগের। কবির লেখা নাটক তো আছেই, তাঁর লেখা গল্প উপন্যাসও অনেক অকবি নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে নামিয়ে ফেলছে। নামিয়ে ফেলছে কবিকেও। এজন্য রবীন্দ্র নাটকেরও কোন ট্র্যাডিশন নেই। তাঁর নাটকের সংখ্যা নাট্যকার শেক্সপীয়রের চেয়েও বেশি, তাঁর নাটক বাঙালিরা শুধু মাণের দায়ে করে, প্রাণের দায়ে নয়। প্রতি ২৫শে বৈশাখে জোড়াসাঁকোতে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা যায়। কেন যায়, কে জানে। সারা বছর খালি পড়ে থাকে যে বাড়ি, সেখানে খালি খালি প্রতি বছরে একদিন যাওয়া কেন, এর জবাব কে দেবে? দুর্গাপুজোর মতো এই ঠাকুর পুজোও আমাদের বাৎসরিক মাত্র। শ্রদ্ধা না করেই শ্রাদ্ধ। মাত্রা ছাড়ানো মাত্রাহীণতা।

এই হুজুগে অনেক পত্রিকাও বেরোয়। পঁচিশে বৈশাখের ভোরে প্রতিদিনের খবরের কাগজের মতো এইসব কাগজের খবরও বিলি করতে নামে প্রচুর ছেলেমেয়ে। তাতে সবাই কবিতা লিখেছে, সবাই ভাবছে সে রবীন্দ্রনাথের দোসর না হলেও বংশধরতো বটে। বটেই তো, বাংলা সাহিত্যকে বংশ দেবার এমন সুযোগ তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। সেসব লেখা হবে জানলে রবীন্দ্রনাথ লিখতে বসতেন না। এদেশে সকলেরই ধারণা তার দেহে সংস্কৃতির স্রোত বইছে। তাই এদেশে সবাই সংস্কৃতির ব্যবসায় করে। তাতে না হয় ব্যবসা, না হয় সংস্কৃতি। কেউ অন্য কিছু করতে চায় না। তাতে জাত যাবে যে! এখন জাত না গেলেও পেট ভরে না আর। তবু এ আমাদের করতেই হবে। সংস্কৃতকে ভুলেছি, সংস্কৃতিকে ছাড়িনি। জাত হিসেবে আমরা অভিজাত না বজ্জাত, তার গবেষণা কোন বাঙালি করবে কিনা এখনো জানি না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যা বলেছেন, তাতে বাঙালির গৌরব বাড়ায় না। ঈর্ষা, নিন্দা এসব আমাদের মজ্জায় সজ্জিত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ না পড়েই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রুজি-রোজগারের উপায়ের

কথা বলেছি। তবু কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথ পড়েন বোঝবার জন্য নয়, বোঝাবার জন্য। নিজে যাই বুঝুন না কেন, পাঠককে বোঝাতে হবে যে! বোঝাতে হবে শুধু কবিকে নয়, নিজেকেও। বেশির ভাগ রবীন্দ্র আলোচনার নাম হতে পারে,—'কবি এবং আমি।' যদি পরলোকে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়, তবে দেখা যাবে তিনি ঐসব রবীন্দ্র আলোচনাই পড়ছেন। অবাক হয়ে যদি জিজ্ঞেস করেন,—'আপনি এসব পড়ছেন কেন? এসব তো আপনারই কথা। সবই জানা আপনার।' কবি হাসবেন না কাঁদবেন বলতে পারি না, তবে বলবেন,—'ওহে, আমি যা বলিনি বা ভাবিনি তাও এতে রয়েছে যে।'

রবীন্দ্র আলোচনায় আলো বেশি না চোনা বেশি, বলা কঠিন। কবির অসুখের প্রেসক্রিপশন, ওষুধের দোকানের ক্যাশমেমো, এ নিয়েও লেখা হচ্ছে। গবেষণার নামে গড়ে উঠছে নানা একাডেমি। সেখানে কেউ একাই ঘোরাচ্ছেন লাঠি, বাকিরা সব ডামি। পড়ার নামে এ ওকে পেড়ে ফেলছে সেখানে। গবেষণার নামে যা চলছে তার অনেকটাই পাঠযোগ্য নয় উইযোগ্য। উইয়ের যোগ্য শুধু। পোকায় কাটা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা নেই। কাটাকাটি চলে পণ্ডিতে পণ্ডিতে। যার সব পণ্ড হয়ে গিয়েছে, সে-ই তো পণ্ডিত। কাকের মাংস কাকে খায় না, কিন্তু পণ্ডিতের মাংস পণ্ডিতে খায়।

এই সব একাডেমিতে রিসার্চ কতটা হয়, তা সার্চ না করেও বলা যায়। বাঙালি পড়াশুনা করতে চায় কি? নাচগান হল্লাতেই তার উল্লাস। যারা ওগুলো পারে না, তারাই তখন লেখা-পড়ার ভেক ধরে। ধার করেই ধরে। এসব তার নিজস্ব নয়। নাহলে দল থেকে দলাদলি হতো না। আপনি কোন দলে,—এর উত্তরে প্রশ্নটাকেই ঘুরিয়ে বলা চলে,—আছি কোন্দলে। কারণ এখন গবেষণাও একটি কেরিয়ার। এই কেরিয়ারে চেপেই গড়গড়িয়ে চলা দেশে ও বিদেশে। দ্বেষে ও বিদ্বেষে। এখানে অর্থের চেয়ে বড় হল স্বার্থ। অর্থ না হলেও অনর্থ হতে আটকায় না। কেউ টাকা বানাতে চান, কেউ নাম করতে চান। যেমন মিনিস্টার হবার প্রাইম লক্ষ্য প্রাইম মিনিস্টার হওয়া। মিনি নয় সকলেই মেগাস্টার হতে চাইছে। তাতে হাওয়া দিচ্ছে কেউ কেউ তাদের নাম ফ্যান। কেবল ফিল্মস্টার নয়, এইসব পণ্ডিতদেরও ফ্যান হচ্ছে কেউ কেউ। তাই তাদের দিনাতিপাতের উপায়। নইলে তারা কি করত? তাস খেলতে পারত। তাস না খেলে বাতাস দিচ্ছে এখানে। নামজাদার সঙ্গে তাদেরও জায়দা না হোক, অল্পস্বল্প ফায়দা হচ্ছেই। জাতীয় কবির নাম করে বিজাতীয় আচরণের আবরণ

এখন সর্বত্র। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সারা বিশ্ব জুড়েই এই নিঃস্বতা, এই প্রলয়। এ আবরণ কি ক্ষয় হবে?

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উল্টো কথা বলে পাল্টা নাম করতে চাইছে কেউ কেউ। শুধু তাঁর লেখার দোষ বার করছে না এরা, তাঁর জীবন থেকেও অনেক ত্রুটি খুঁজে পেতে চাইছে। এভাবে চলতে থাকলে এদের পুত্র-প্রপৌত্ররা কবিকে আর চিনবে না। এরা ভাবছে তাতেই এদের নাম। কবিকে গাল দিলে কবির কোন ক্ষতি হয় না, আমার দুটো পয়সা হয়,—একথা যেন কে বলেছিল কবি বেঁচে থাকতেই। এখন তো কবি নেই; সুতরাং তাদের পোয়া বারো। এবং ষোল আনা লাভ। কবির কালিমাতেই তাদের লালিমা। একজনের অমাবস্যায় তাদের পূর্ণিমা। ছিদ্রান্বেষীরাই এখন সত্যান্বেষী। আয়রে ভাই, টেনে নামাই।

তবু এখনো কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখাই অদলবদল করে কবিতা বা গান লিখে ফেলেন। নাম হয়ে যায় তাঁদের। অনেকদিন পরে কেউ হয়তো রবীন্দ্রনাথের গানে এদের প্রভাব কতটা, এ নিয়ে বই লিখবেন। অথবা দেখাবেন এসব নাম রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এখন আর একটি নাম নয়, অনেক নাম তাঁর। নাচ বা গান বা কবিতা বা নাটক,—এতগুলো রবীন্দ্রনাথ তো আছেই—তাঁর শ্রুত-বিস্মৃত কত কথা নিয়েই নিঃসৃত হয়ে চলেছে আমাদের কথকতা। তার জালেই জড়িয়েছি। তিনি না এলে আমরা সময় কাটাতুম কি নিয়ে? কাকে কাটতুম? আদর করেই হোক, নিন্দে করেই হোক, এই কাটাকাটির খেলা খেলবার জন্য প্রতি পঁচিশে বৈশাখের ভোরবেলা যারা রবীন্দ্রসদনে ছুটে যাই, তারা নিজেদের সদনে কোন সন্ধ্যাবেলা কি রবীন্দ্রনাথ পড়ি?

আমাদের এখন কল্পনার অসময় নয়, বাস্তবিক দুঃসময়। রবীন্দ্রচর্চা আমাদের পরচর্চা শুধু। প্রত্যেকেই বলছে,—আর কেউ জানেনা, আমরাই রিয়েল। আমাদের ছবি আর সই দেখে নেবেন।

তিনশো বছরের কলকাতা

কলকাতার বয়স নাকি তিনশো। সে হিসেবে আমাকে তো তরুণই বলতে হবে। আমার এখনো একশোও হয়নি। অল্পবয়েসীর চোখেই এই বুড়ো শহরটাকে বড়ো হতে দেখছি। যেভাবে কলকাতা বুড়ো হয়েছে, তাতে এর বয়স তিনশো না হয়ে তিন হাজার হলেও অবাক হতাম না। আবার অন্যদিক দিয়ে এর বয়স তিন বললেও চলে। কারণ তিন বছরের মতই কলকাতার বুদ্ধি। অর্থাৎ বুদ্ধি কিছু হয়নি। আর তিনশো বছরে তো বুদ্ধি সব চলে যায়।

কলকাতা এখন আর ইঁটের টোপর পরা নয়, ইঁটের খাঁচায় পোরা শহর। এখানে কেউ বাড়ি বানায় না, ফ্ল্যাট কেনে। এবং কিনতে গিয়ে নিজেরা ফ্ল্যাট হয়। পপাত চ মমার চ। পড়ে আর মরে। এক টুকরো খাঁচার দাম দিতে গিয়ে কলকাতার মানুষের পাঁজরের খাঁচা খুলে যায়। কলকাতায় এখন বাড়ি নেই, ব্যারাক আছে। ঘরের বদলে ছাঁচ। ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকলে মনে হবে একটা অফিস বাড়িতে এসেছি—সারি সারি নেমপ্লেট লাগানো। ভার্টিকাল বস্তি যেন। মিঃ অমুক আর মিঃ তমুক, কেউ কাউকে চেনে না, চিনলেও জানে না, জানলেও মেশে না। সারা কলকাতা এখন ফ্ল্যাট কেনার ধার শোধ করতেই ব্যতিব্যস্ত। গত বিশ বছরে যত ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে, আগামী বিশ বছরে সেগুলো আবার বিক্রি করতে নামবে কলকাতার মানুষ। তিনশততম বছরে কলকাতার মানুষের এই জ্ঞানোদয় হবে কিনা কে জানে। দু টুকরো ঘর, এক চিলতে বারান্দা, এক কণিকা বাথরুম, এক কণা কিচেন। তারই ধাক্কা সামলাতে এক জীবনের আয়ের অপব্যয়। সর্বস্ব দিয়ে সর্বনাশ। আশ্চর্য কলকাতার ফ্ল্যাটের নকশা। দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই বাথরুম। বসবার জায়গা আর খাবার জায়গা একাকার। সিটিং-কাম-ডাইনিং। জুতো খুলে ঢুকবেন, না জুতো পরেই বসবেন? যদি খোলেন তবে কোথায় খুলবেন? শোবার ঘরে ঢোকা বারণ, ওটা হল গৃহস্বামীর লিভিং রুম। ছেলেবেলায় বন্ধুর বাড়ির খাটে বসে আড্ডা দিতেন, মনে পড়ে? এখন কলকাতা সভ্য হয়েছে —সিটিং রুমে আড্ডা হয় না, বড়জোর গল্প হতে পারে। ও ফ্ল্যাটের কথা

এখানে, এ ফ্ল্যাটের কথা ওখানে। কলকাতার কালচার আজকাল চার দেয়ালে আবদ্ধ। যখন লোডশেডিং হয় তখন এই ফ্ল্যাট হয়ে যায় অন্ধকূপ আর গরম চুল্লী।

লোডশেডিং কলকাতার তিনশো বছরে সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি-প্রয়োগ। এই একটি জিনিস আমাদের টাইম মেশিনের মতো ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে কলকাতার আদিযুগে। প্রথম প্রথম লোকে আপত্তি করত, এখন মেনে নিয়েছে মনে মনে। বুঝতে পারা গিয়েছে যে এ আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে এসেছে। আমরা একই সঙ্গে বিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে যেতে যেতে আবার ফিরে গিয়েছি গত শতাব্দীতে। এই অন্ধকারেই তো রবীন্দ্রনাথ, শেকসপীয়ার, নিউটন তাঁদের কাজ করতেন। অবশ্য তাঁরা কেউ ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতেন না। আলো থেকে অন্ধকার, আবার অন্ধকার থেকে আলোয় এই যে যাতায়াত, ঐ সুযোগ আমাদের কলকাতাই দিয়েছে। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কালের স্পর্শ পাচ্ছি, এই যুক্তিতেই কলকাতার প্রযুক্তি বিজ্ঞানসঙ্গত, হয়তো বা বিজ্ঞাপনসম্মতও বটে।

নিন্দুকের মতে কলকাতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন দুর্নীতি, অনেক দূর ছড়িয়েছে এই নীতি। ক্যানসারের যেমন আনসার নেই, দুর্নীতিরও কোন ভীতি নেই। কলকাতার এই দুর্নীতি—কলকাতাকে একদিন তিলোত্তমা করবে কিনা জানিনা, তবে তিল তিল করে ক্ষয়রোগের চাপে ক্ষইয়ে দিতে পারে। একে রক্ষে করার জন্য রক্ষেকালী এলেই ভাল হয়। নয়তো কামাল পাশার মত কেউ যদি পাশা ফেলেন, তবে তিনি কামাল করতে পারবেন। এর মাঝামাঝি কেউ একে বাঁচাতে পারবে না। তিনশো বছরের বয়সী কাউকে নবজীবন এবং নবযৌবন দেবার মতো কায়কল্প কার কল্পনায় আছে ?

অবশ্য কলকাতা এখন দুনিয়ার বড় বড় শহরের কাছে কল্কে পেতে শুরু করেছে। নিউইয়র্ক, টোকিও এদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে কলকাতা। অন্তত একটা বিষয়ে। ওইসব শহরে দূষণের মাত্রা নাকি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, কলকাতারও সেদিকে পাল্লা ভারী হচ্ছে ক্রমশ। হল্লা তুলছে অনেকেই—কলকাতায় নাকি বড় বেশি ধোঁয়া আর ধুলো। এভাবে চললে কলকাতার ডাক্তারদের নাকি খুবই লাকি বলতে হবে, কারণ এমন ভুগবে সবাই যে ডাক্তারদের তখন পোয়াবারো। রোগীদের অবশ্য চারপোয়া পূর্ণ হয়ে আসবে। এমনিতে কলকাতার হাসপাতালে তারাই যায়, যারা আত্মহত্যা করতে পারেনি, তখন কিন্তু এখানে সবাইকেই যেতে হবে—সারতে নয়, সরতে। বাঁচতে নয়, মরতে।

বর্ষা এসে গেছে। কলকাতা এখন খুবই আকর্ষক। সারা কলকাতাই

এখন সুইমিং পুল। যারা সাঁতার জানে না, তারা এই সুযোগে সাঁতার শিখে নিতে পারে। কলকাতায় সবচেয়ে বড়লোকি জায়গাতেই এইসব সুইমিং পুল খোলা হয়। গড়িয়াহাট গোলপার্কের রাস্তায়, আলিপুরের বাড়ির চারপাশে সারা বর্ষাতে খেলা করবে বৃষ্টির জমা জল, সঙ্গে মিশবে নর্দমা উপচে পড়া সৌরভ। বালিগঞ্জের রাস্তা আর পুকুর এক হয়ে যাবে। সাঁতার শিখতেই হবে, নইলে ওই পুকুরেই ভেসে যেতে হতে পারে। ওইসব রাস্তায় সাঁতার শেখার জন্য বড় বোর্ড লাগিয়ে কেউ যদি ছাত্র খোঁজে, তাকে ধন্যবাদ দিতে হবে। কর্পোরেশন, সি এম ডি এ, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, টেলিফোন

এক্সচেঞ্জ সবাই মিলে একের পর এক রাস্তা খুঁড়ে বানিয়ে তুলবে কবর, সেখানে ভরে যাচ্ছে বর্ষার জল, এক পুকুরের জায়গায় গজিয়ে উঠবে আরো কত পুকুর। আশ্চর্য এই যে, এরা কখনই একযোগে কাজ করে না। একজন কাজ করে মাটি ফেলে যাবার পরের দিনেই হাজির হয় আরেকজন, ঐ মাটি সরিয়ে আবার গর্ত খোঁড়ার জন্য। মর্ত জুড়ে গর্ত। মরতে পাবার এমন সুযোগ আর কই।

তিনশো বছরে কলকাতার অনেক বদল হয়েছে। কলকাতার সংস্কৃতি

অনেক কৃতী মানুষের ত্যাগে এবং শ্রমে তৈরি। তিনশো বছরে এসে আমরা ঐ শ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছি। ত্যাগের পথে নয়, ভোগের পথেই আমাদের লক্ষ্য। লেখায়, পড়ায়, খেলায়, শিল্পে এখন পিছিয়ে পড়লেও উল্টোদিক দিয়ে আমরাই প্রথম। অনেকটা সিগারেটের মত, যেদিকটা খাচ্ছি, তার উল্টো দিকটা রয়েছে মুখে। মুখে রেখেছি যেদিকটা, টেনে শেষ করছি তার উল্টোদিকটা। কলকাতাও তাই একদিকে ফুরোচ্ছে, প্রথম হচ্ছে উল্টোদিকে। ভারতের মধ্যে কলকাতাতেই বেকার বেশি—এ আর বেশি কথা কি।

কলকাতার তিনশো বছরে সবচেয়ে উন্নতি টেলিফোনের। ইলেকট্রিক থেকে ইলেকট্রনিক্স। ইলেক লাগানো এই ট্রিকটাই আমাদের ঝুলিয়েছে সবচেয়ে বেশি। কলকাতার টেলিফোন এখন পুরাতন ভৃত্যের মত, ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে। গেলাও যায় না, ফেলাও যায় না। সব টেলিফোনই থিয়েটারের ফোনেব মতো সাজানো, যাকে বাজানো যায় না। বলতে গেলে ওরা বলে—সবসময়ে তো ফোন ঠিক চলতে পারে না, যতটা করা যায় করছি। নিশ্চয় করছেন, সবসময়ে কেন, কোন সময়েই যাতে না চলে টেলিফোন, সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে। কলকাতার তিনশো বছর যাতে জাঁকজমক উৎসবে ভরে যায়, তার জন্য কলকাতার বাসিন্দারা প্রাণপাত করছেন। যাতে এখানে ট্যুরিস্ট আসে সেজন্য আমরা কলকাতার রাস্তাতে বর্ষাকালে নৌকো ভাসাব, প্রত্যেক ট্যুরিস্টের হাতে ধরিয়ে দেব হ্যারিকেন। আর দেব হাতপাখা। আলো যখন ছিল না, পথ যখন ছিল না, তখনকার পরিবেশ তৈরী হবে এই দুষিত শহরের স্মিত শরীরে। তিনশো বছরের পয়লা দিনে কলকাতার হালখাতা খুলবে যারা, তাদের পাতায় হালের কলকাতা কতটা ধরা পড়বে জানিনা। কলকাতার পরিবহন যে ভিড় বহন করে রোজ, তার চাপে শহরের মুখ দিয়ে চাপ-চাপ রক্ত উঠছে, একথা জেনেও কলকাতার মিনিবাসে অনায়াসে সিগারেট ধরাই, ধোঁয়া ছেড়ে দিই শুধু পাশের সীটে বসা লোক বা স্ত্রীলোকের মুখেই নয়, ধোঁয়ার মুখে উড়িয়ে দিই আমাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং হৃৎপিণ্ড। এই শহরের কবি একদিন অন্যায় করা আর অন্যায় সহ্য-কে একইরকম ঘৃণ্য ভেবেছিলেন, আজ আমরা অন্যায়ের সঙ্গে সহাবস্থান করতে শিখে শহরের তিনশো বছরের জন্মদিন করেছি।

কলকাতা ইজ্ নট্ ডেড্। লংলিভ্ কলকাতা।

বুড়ো হওয়ার সুখ

পৃথিবীতে বুড়োরাই আসল সুখী। যেমন বৃদ্ধ না হলে মানুষ সুন্দর হয় না, তেমনি বয়স না হলে সুখের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমি কিছুদিন হল ভোরবেলা লেকের ধারে বেড়াতে গিয়ে পাঁচটি বুড়োর পাশে বসে বসে শুনি তাঁদের কথা। এঁরা সকলেই কাজ ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে উৎসাহ কমেনি। বরং মনে হল এঁরা নানাভাবে নিজের নিজের সংসারে নিজেদের লাগিয়ে রেখেছেন। এছাড়া নিজেদের প্রজন্ম সম্বন্ধে গৌরব বোধ করার অবকাশও এখন অনেক বেশি পাচ্ছেন।

বুড়োদের সুন্দর দেখায়, একথা শুনলে অনেক যুবক-যুবতী রাগ করবে! কিন্তু ভেবে দেখুন কোন বৃদ্ধের প্রশান্ত মুখচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার ছবি দেখলে কি মনে হয়? কোথাও কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে কি? রবীন্দ্রনাথের যে সব ছবি প্রসিদ্ধ তার প্রত্যেকটি পঞ্চাশ পেরিয়ে তোলা, অথবা পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। যত বয়স বেড়েছে, ততই সুন্দর হয়েছে তাঁর মুখ। উদয়শঙ্কর, জহরলাল নেহেরু এবং ইদানিং থ্যাচার, এঁদের প্রত্যেকের অবয়বে এসেছে পরিণত প্রজ্ঞার ছাপ। ধরুন উত্তমকুমার, অল্পবয়সের রোগা রোগা চেহারার চেয়ে পরিণত বয়সের আত্মবিশ্বাসী মুখটাই কি সুন্দর নয়? অল্প বয়েসের সৌন্দর্য হল সম্ভাবনা, বুড়ো বয়স হল সেই সম্ভাবনার পরিণতি।

যা বলছিলাম, ভোরবেলার সেই পঞ্চপাণ্ডব যখন কথা বলেন, আমি তাঁদের মধ্যে একটা বিশেষ জীবন দেখতে পাই। সে জীবন শেষ হয়নি, অশেষ হয়ে উঠেছে। এরা উপার্জন বন্ধ করলেও জীবনকে বর্জন করেননি। যে জীবন এখন কাটান এঁরা, তার মধ্যে জনপ্রিয়তা নেই, স্বজনপ্রিয়তা আছে। সংসারকে এতদিন এঁরা ভুলেছিলেন, এখন সংসারেই ডুবেছেন। সংসারের জন্য টাকা আনা চাই, এইটুকুই বুঝতেন, এখন টাকা-আনা-পাই ছেড়ে দিয়ে বুঝেছেন যে সংসারকে জানা চাই। সংসারের জন্য এঁরা যে টুকিটাকি কাজ করেন তাই নয়, বুদ্ধি পরামর্শও দেন। ছেলের অসুখে এঁরাই বুদ্ধি বাতলান। কোন ডাক্তারকে কখন দেখাতে হবে, এঁরাই ঠিক করেন। এঁদের অভিজ্ঞতার আলোয় পরবর্তী প্রজন্ম সিদ্ধান্ত নেয়। মতের

অমিল যে হয় না এমন নয়, তবু সংকটের সময়ে এঁরাই এসে দাঁড়ান সমস্যার সমাধান করতে। নাতি-নাতনির লেখাপড়ার প্রাথমিক কাজটুকু এঁরাই শুরু করেন। জামাই যে বেশ রোজগেরে, তাঁর হাতে পড়ে মেয়ে বেশ সুখে আছে, একথা ঘোষণা করে এঁরা গর্ব এবং তৃপ্তি অনুভব করেন। এমন জামাই তো তিনি অনেক খুঁজে বের করেছিলেন। এ মেয়ের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে কখনোই আলো পাখা বন্ধ করে না, অনুযোগের সুরে একথা বললেও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এই কথাই যে, জামাই এই সমস্ত খরচই অফিস থেকে পায়।

আমি এক বুড়োর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে তিনি নতুন রোজগারের
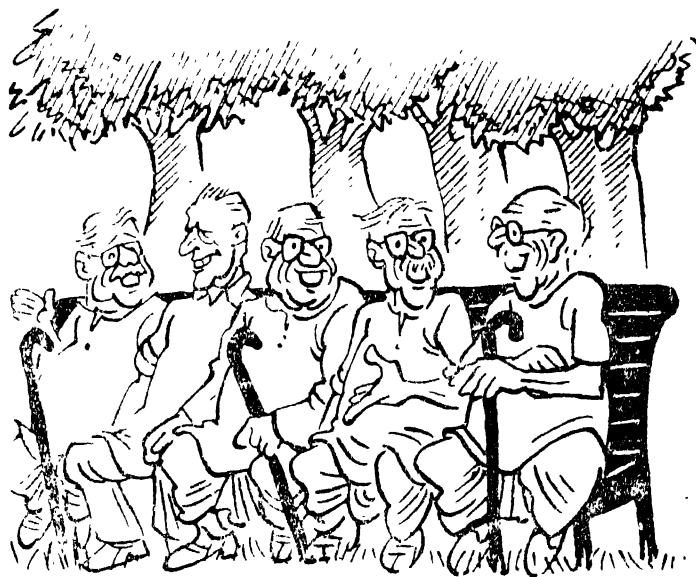
চেষ্টা করছেন কিনা? তিনি বলেছিলেন না, কারণ টাকার প্রয়োজন তাঁর কমে গিয়েছে। এখন বেশি খেতেও পারেন না. বেশি ভাল পোশাকেরও প্রয়োজন নেই। অল্পস্বল্প যা দরকার, সেটুকু তাঁর সঞ্চয়ের সুদেই চলে যাবে। ছেলেদের সংসারে তিনি এখনো বাড়তি নন, এখনো বিবেচনা বা বিচারের জন্য তাঁকে দরকার হয়। এখনো সংসারের সব উৎসবের আমন্ত্রণপত্রে তাঁর নামই ছাপা হয়—তা শুধু নিয়মরক্ষা নয়। সংসারের মাথায় রাজ্যপালের মতো কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন, এমন সংবাদে সে বাড়ির সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। সে সংসার ভাগ্যবান। যেমন পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, পুরনো মদ

সুস্বাদু হয়, তেমনি পুরনো লোক সংসারকে উপভোগ্য করে তোলে। যে সংসারে ঠাকুর্দা ঠাকুমা নেই, সে সংসারে নাতি-নাতনির প্রশ্রয় মেলে না। এঁরা যে সবসময়ে পরবর্তী প্রজন্মকে পছন্দ করেন, এমন নয়। কিন্তু সেটাও এক ধরনের স্বাদুতা এনে দেয়। জীবনে বহুমাত্রায় যোগাযোগ ঘটে ভিন্ন প্রজন্মের বিভিন্নতার মধ্যেই।

সারাজীবন দৌড়ে বেড়ানোর পরে বুড়োরা যখন নিজেদের মধ্যে গল্প করেন, তার মধ্যে কেবল দোষারোপ থাকে না। নিজের অল্পবয়সের স্মৃতি পরবর্তী অল্পবয়সের প্রতি প্রীতি এনেও দেয়। নিজে যা পাননি, এরা তা পাচ্ছে দেখে শান্তি পান। রিটায়ার্ড হলেও, টায়ার্ড হন না। সেই জন্যই অনেক বৃদ্ধকে সুন্দর দেখায়।

যে পাঁচ বৃদ্ধকে আমি দেখতে পাই, তাঁদের মধ্যে একজন দুদিন না এলেই সবাই তাঁর খোঁজ নিতে ছোটেন। অসুখ করেনি তো? চলে যাননি তো? একদিক থেকে এ খোঁজ নেওয়া তাঁদের নিজেদের খবর নেওয়া। কে আগে যাবে? তবু যাবার আগে ভাল থাকুক সবাই।

আমি ঐ পাঁচ বুড়োর পাশে বসে থাকি শুনে আমার বন্ধু বলেছিল, 'পাঁচ নয়, তাহলে ছটা বুড়ো হল।' হতে পারে, তাই হয়তো আমি বুড়োদের খবর নিই। পাশাপাশি দুতিনজন বৃদ্ধাকেও দেখতে পাই। তাঁরাও আসেন, কথা বলেন কম। বৃদ্ধরা তাঁদের দেখে উৎসাহিত হন কিনা বোঝা যায় না। বোধহয় এই উৎসাহটা অল্পবয়সেরই একচেটিয়া।

বুড়োদেরই বেশি উৎসাহ জীবনযাত্রার সঙ্গে বেশি সংযোগ রাখা। অল্পবয়েসীরা যখন আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে নেয়…এঁরা তখন বিয়েতে কিভাবে আশীর্বাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হবে, তাই আলোচনা করেন। ছেলেরা যা-ই ভাবুক, বুড়োদের আয়োজনই মেনে নেয় সবাই। আশীর্বাদের দিন চিকেন বিরিয়ানি আনিয়ে পরিবেশন করেন। শুধু তা-ই নয় শেষকালে সবাইকে অবাক করার জন্য ছ'রকম মিষ্টি তুলে দেন পাতে। মুরগীর পেটের ভেতর মুরগী ঢুকিয়ে যেমন তৈরি হয় বাঢ়িয়া খানা, ইনি তেমনি সন্দেশের মধ্যে পুরে দেন রসোমালাই। প্রথমটা যদি হয় মোগলাই, দ্বিতীয়টা তবে বাদশাহী। এত খেয়ে আপনি যদি ত্রাহি ত্রাহি করেন, তবু ছাড়ান নেই।

এই আয়োজনের বদলা নিতে অপরপক্ষের বুড়োরা যে আয়োজন করেন তার আঁচ নিতে হলে আপনাকে তিনরকম মাছ খেতে হবে। প্রত্যেকটি আলাদা প্রজাতি, একটা খেলে আরেকটা 'চাই না' বলার উপায় নেই। মাছ আর মিষ্টির এই যে তথ্য, তা আরো বড় আকারে দেখা দেবে বিয়ের তত্ত্বে।

এসবের প্ল্যান আঁকেন অদ্ভুত বুড়োরাই, ছেলে বৌ শুধু মদত দেয়। বুড়োরা এসব নিয়ে বেশ থাকেন। ছেলেদের কাজ শুধু একটু ধরতাই দেওয়া। তাতেই খোলতাই হয় ব্যাপারটা।

বুড়োরা নিজের বুড়িদের খবর রাখেন, যদিও নজর দেননা। তাঁদের মতে বৌ হল দাঁতের ব্যথার মতো, কমবেশি জানান দিয়েছে সারাজীবন। ওই টনটনানি তো রইলই। এখন বৌয়ের আবদারের বদলে, বা ছেলেমেয়ের দাবির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে শিশু ভোলানাথদের ডিমাণ্ড। হয়তো শুধু আফ্রিকা আর ভারতের সিংহের লড়াইয়ের গল্পই হল সেই ডিমাণ্ড। সারা-জীবন গল্প করার সুযোগ হয়নি, এখন গল্প বানাতে হচ্ছে। জীবনের সব সুখ কি এখনই, এখানেই জড়ো হল ?

এই সুখ বেশিদিন নয়, একথা কি বুড়োরা ভাবেন ? এসব ফেলে রেখে যেতে হবে জেনেও এমনভাবে চলেন যেন এইতো সবে শুরু হল জীবন। এই জীবনের জন্যই এতদিনের যৌবন পার হয়ে আসা। এরই আশায় ছিলেন তাঁরা অথচ সেকথা বুঝতে পারেননি। জীবন যেভাবে কাটিয়েছেন, তা খুব বলার মতো নয়; অনেক অপরাধ হয়তো জমা আছে। তবু যখন এক বুড়োকে বলেছিলাম—'এখন আপনার কি মনে হয় ?' উনি বলেছিলেন —'ভালই মনে হয়। এক চিন্তা যদি অসুখ করে। তাহলে জানতে হবে, অসুখটা সারবে, না সারবে না ! যদি সারে তবে ঠিকই আছে। আর যদি না সারে, তবে কোথায় যাব, স্বর্গে না নরকে ? স্বর্গে গেলে তো ঠিকই আছে। অনেক অপ্সরার সঙ্গে দেখা হবে। আর যদি নরকে যাই তাহলেও ঠিক আছে। কারণ সেখানে এখানকার সব বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা হবে। আবার জমিয়ে বসব।'

বুড়ো হবার সুখ দেখে তাই বুড়ো হবার শখ জাগে।

ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক

কলকাতার কোনো কোনো রাস্তা ওয়ান-ওয়ে হয়েছে। অর্থাৎ তার একদিক দিয়ে শুধু যাওয়া, অন্যদিক দিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। হয় শুধু যাওয়া, নয় শুধু আসা। যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকো তারা—এখন হলে রবীন্দ্রনাথ এভাবে কবিতাটা লিখতে পারতেন।

এই ওয়ান-ওয়ে হবার ফলে নিশ্চয় কিছু সুবিধে হয়েছে। রাস্তায় জট পাকাচ্ছে কম, যাঁরা যেতে চাইছেন তাঁরা চলে যাচ্ছেন ঠিকমত। অবশ্য যাঁরা আসতে চাইছেন, তাঁরা খুশি হননি, কারণ আসার জন্য তাঁদের আবার অন্য পথে যেতে হচ্ছে। যাই হোক এই ওয়ান-ওয়ে ব্যাপারটা কিন্তু অনেকদিন আগেই শহরে চালু হয়েছিল, আমরা ধরতে পারিনি। তাতেও শুধু যাওয়া যায়, আসা যায় না। সে যাওয়াটা খুব আনন্দের নয়, কারণ সে পথে গেলে ফেরার আর কোনো উপায় থাকত না।

কলকাতার পথে মাঝে মাঝেই ধস নামে। হঠাৎ রাস্তায় বিরাট গর্ত তৈরি হয়ে যায় এবং সেই গর্তে যে পড়ে সে আর ফেরে না। এই পথে ট্রাফিক চলে যায় পাতালে। তাকে ফেরাতে গেলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। আর সবাই জানেন হাসপাতালে গেলে লোকে কোথায় যায়! সে কি আর ফেরে? ফেরে না। হাসপাতালে মানুষ হাঁসফাঁস করে মরে। তাই বলছিলাম পাতালে যাবার ওয়ান-ওয়ে অনেকদিন হল চলছে। তবে এর কোনো ঘোষণা নেই। যেমন ঘোষণা থাকে না মরণের। মৃত্যু নাকি আমাদের কেশ ধারণ করে আছে, সময় হলেই টেনে নিয়ে যাবে। পথের এই ওয়ান-ওয়ে ব্যাপারটাও তাই। নীরবে সে অপেক্ষা করছে, যখন তখন রাস্তা ফুটো করে দিয়ে টেনে নিচ্ছে আমাদের। সীতা যখন পাতালে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল কি না জানি না। লব কুশের জন্ম কি হাসপাতালে হয়েছে? না, পাতালে?

এমন কি এই ওয়ান-ওয়ে ব্যাপারটা শহরের নদীর বুকে তৈরি ব্রীজেও আছে। হাওড়া ব্রীজের ওপরে সেই যে ভদ্রলোক গাড়ি ঠেলেছিলেন, মনে আছে আপনাদের? ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ ভদ্রলোক ব্রীজের ফুটো দিয়ে

গলে গেলেন মাঝনদীতে। ব্রীজের ওপরেও কে যে তাঁর যাবার জন্য লোহার প্লেট সরিয়ে রেখেছিল কে জানে। নিয়তি নামে সেই মহিলাটিই হবেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন শহরের কর্তৃপক্ষ। ওয়ান-ওয়ে ব্যাপারটা কেমন হয় এটা পরীক্ষা করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। ভদ্রলোক সেই যে তলিয়ে গেলেন মাঝনদীতে, আর উঠল না। ওয়ান-ওয়ে বলতে তো তাই বোঝায়—যার একদিকেই পথ—যেখানে পা বাড়ালেই রাস্তা, হাত বাড়ালেই বন্ধু। এই বন্ধুর হাত ধরেই বন্ধুর পথে অন্তহীন অনন্ত যাত্রা।

ওয়ান-ওয়ে তাই এখন শুধু একদিক থেকে আরেক দিকই নয়, এ এখন ঊর্ধ্ব থেকে অধ-ও বটে। পথ এখন তাই যখন মেরামত হয়, তখনই জানা যায় যে এখানে দু'একদিনের মধ্যে ধস্ নামবে। ফস করে কেউ হারিয়ে যাবে ঐ গর্তে। আর তাকে দেখা যাবে না ঐ পথে। বিপথে হেঁটে চলেছে তার আত্মা। আত্ম-পরিচয় দেবার জন্য যদি-ই বা তাকে কেউ তুলে আনে, তবে সে পাতাল থেকে আলাপ করার জন্য হাসপাতালেই যাবে, সেখান থেকে পোস্টমর্টেম করে তাকে পোস্ট করে দেওয়া হবে শেষযাত্রায়।

ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক তাই খুবই অর্থপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। এই পথে কোনো জট পাকায় না—সরাসরি কেবল একই দিকে যখন যেতে হচ্ছে, তখন উল্টোদিক থেকে কেউ বাধা দিতে আসছেন না। রাস্তায় ধস্ নামাটাও সেইরকম—আপনি হু-হু করে নেমে যাবেন নিচে, কোনো হাহাকার আপনাকে থামাবে না।

শহরের পথে পথে এখন ধস্ নামার বিরতি নেই। নিপুণ আয়োজন। বর্ষা পড়লেই সবাই তৈরি এবারে ধস নামবে। কবে, কোথায় তা কেউ জানে না। তবে গর্ত যে হবে তা সবাই জানে। মাটি কাটার ঠিকাদার তৈরি, ঐ গর্তের মাটি কেটে সে টাকা বানাবে। টাকা মাটি, মাটি টাকা এই শ্লোগান জপতে জপতে সে বেরিয়ে পড়েছে মাথায় ছাতি নিয়ে। তার বুকের ছাতি ফুলে উঠেছে আসল রোজগারের আশায়। ঐ গর্ত আবার মেরামত করার ডাক পড়বে। এমন মেরামত করতে হবে যাতে বর্ষা শেষের নরম মাটি আরেকবার ধসে যায়। তখন আরেকবার মেরামত কর – পুজোর আগে পুজো বোনাস। যতবার মেরামত, ততবার কিছু মানুষের ওয়ান-ওয়ে গমন। দেবীর ঘোটকে গমন, ফল ছত্রভঙ্গ – মানুষের ওয়ান-ওয়েতে বিসর্জন, ফল বসুন্ধরার জন-সংখ্যা হ্রাস। ওয়ান-ওয়ে আসলে জিরো হয়ে দাঁড়ায়। মানে একদিন দাঁড়াবে যত বেশি ওয়ান-ওয়ে হবে পাতালের দিকে, ততই মানুষের সংখ্যা কমতে-কমতে জিরো হবে। ওয়ান ইজ্ ইকোয়াল টু জিরো।

স্বাধীনতার পরে রাস্তায় ধস্ নামা বেড়েছে। আমাদের এফিসিয়েন্সি হিজ্ এক্সেলেন্সির চেয়ে বেশি। ওদের সময়ে রাস্তা এত সহজে ভেঙে পড়ত না। আমাদের হাতে পড়ে পথ ভেঙে রথ দেখা কলা বেচা সহজ হয়ে গিয়েছে খুব। ওয়ান-ওয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে দারোয়ান।

ওয়ান-ওয়ে তাহলে ভালই হয়েছে বলতে হবে। শুধু যে রাস্তার জট ছাড়িয়েছে তাই নয়, লোকও কমিয়েছে। এভাবে চললে আমরা যে শুধু জনসংখ্যার বিস্ফোরণ আটকে দেব তাই নয়, আবার হয়তো ফিরে যেতে পারব পুরোনো দিনে, যখন লোকের ভিড়ে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত না। কল-কাতার সব রাস্তাই একদিন ওয়ান-ওয়ে হয়ে যাবে, দুর্মুখের কথায় কান দেবেন না, একমুখে চলুন সবাই। আর ফিরতে হবে না, এই পণ্ডশ্রমের
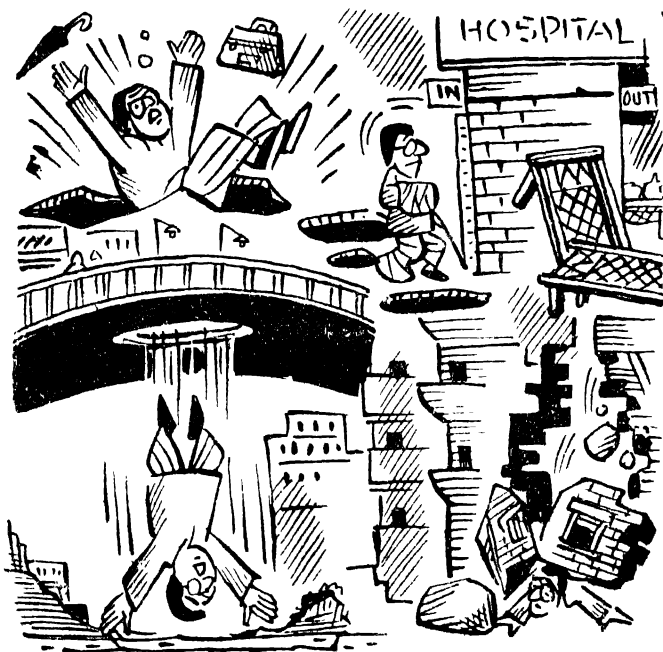
মাঝখানে। গণ্ডগ্রামের মত এই শহরে শুধুই তখন গণ্ডা গণ্ডা গর্ত—তাতে সেঁধিয়ে গেলেন তো কাঁদিয়ে গেলেন সবাইকে।

কলকাতায় শুধু রাস্তাতেই ধস নেমেছে এমন নয়, ধস নেমেছে বাড়িতেও। একটুকু বাসা করেছিনু আশা। ঐ একটুকু বাসার জন্য এইটুকু জীবনের সব টাকা ক'টা দিয়ে কটা দিন নিজের বাড়িতে থাকব ভেবেছিলাম। সে বাড়িও

ঝপাঝপ ভেঙে পড়ছে। এও আরেক ওয়ান-ওয়ে। এবারেও উর্ধ থেকে অধঃ। ওপরের তলায় বসে তাকিয়ে আছি আকাশে, হঠাৎ জোর বাতাসে ভেঙে পড়ল বাড়ি। সোজা নেমে এলাম নিচে। আর ফিরে যাওয়া হল না।

ব্যাপারটার ভারি উন্নতি হয়েছে। মনে করে দেখুন আগের কালের বাড়ি ভাঙা। সেসব বাড়ি ভাঙতেই কত খরচ হত, কত সময় লাগত। কত জিনিষ পাওয়া যেত। আস্ত দরজা জানলা, আস্ত আস্ত ইঁট। বিজ্ঞাপন বেরোত -সাহেব বাড়ি ভাঙা হইতেছে। লোকে কাতারে কাতারে লাইন দিত ঐসব জিনিষ সস্তায় কিনবে বলে। কত কষ্ট করে, কত লোক লাগিয়ে, কত পয়সা খরচ করে সাহেবদের বাড়ি ভাঙতে হতো। কত অপচয় হতো ভাবুন। এখন মোসাহেবদের বাড়ি পুরো বানাবার আগেই ভেঙে পড়ছে। কত সহজে, প্রায় এমনি এমনি নিখরচায় ভাঙা হয়ে যাচ্ছে আজকের আধুনিক বাড়ি। কলকাতা জুড়ে এখন পড়ন্ত বাড়ি, ভাঙন্ত বাসা।

বাড়ি বানাবার জন্য মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে। তারপরে সেই বাড়ি ভেঙে পড়লে সেই মানুষই বোকা বনে যাচ্ছে ছাগলের মতো। আগের বাড়ি ভেঙে পাওয়া যেত অনেক জিনিষ, যা লোকে নতুন বাড়ি বানাবার কাজে লাগাত। এখন কিন্তু যে বাড়ি ভাঙছে, তা ভাঙছে পুরোপুরি। কিছুই থাকছে না। ব্যাঙ্কের টাকা ধার করতে গিয়ে সব বাঁধা রাখতে হয়েছে। হাতে যে ক'টা তাস ছিল, সব বের করে দিতে হয়েছে ঐ টাকা যোগাড়ের জন্য। তারপরে তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়েছে ঐ ঘরের ভিত। বারান্দা ভেঙে পড়ে যখন ফাঁসির ফান্দা হয়ে দাঁড়াল, তখনই তো খুলে গেছে ওয়ান-ওয়ে। তখন ওয়ে-ওয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

পথই বলুন, আর ঘরই বলুন দুদিক দিয়েই আমাদের বাড়বাড়ন্ত। বাড়ি বানিয়ে যাদের বাড় বেড়েছে, তাদের হাতেই আমাদের ভাঁড়ার বাড়ন্ত।

মোট কথা এইটুকু মোটমাট বোঝা যাচ্ছে যে 'জীবনের মোট আমরা এবারে মাঠেই ফেলে রেখে যেতে পারব। জীবনের রাস্তা এখন একটাই—সেটাই হল মরণেরও পথ। তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে—কবি গেয়েছেন এই গান —এখন হলে একটু বদলে দিতেন ; এলে নয়, গেলে—তুমি কোন ভাঙনের পথে গেলে। অর্থাৎ পথের কোন ধসের মধ্য দিয়ে চলে গেলে তুমি। বা বাড়ির ক'তলা ভেঙে পড়ে ফুরিয়ে গেলে তুমি। কেউ আর আসে না, সবাই যায়। পথ ভেঙে, নয় বাড়ি ভেঙে। ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক যার মাথাতেই আসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মাথা ভেঙেই তার অবসান।

ওয়ান-ওয়ে এখন ওয়ান অ্যান্ড অল সকলেরই একমাত্র ওয়ে। অলমোস্ট।

পাত্রী চাই

একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল এইরকম ঃ 'পাত্রী চাই। বয়স ১৮—২০। প্রকৃত সুন্দরী হওয়া চাই। সুগায়িকা হওয়া প্রয়োজন। খেলাধুলোর অভ্যাস থাকলে অগ্রগণ্য হইবে। স্পোর্টিং ফিগার আবশ্যক। পাত্রের দাবি সুবিধামত নেগোসিয়েবল্।'

এটি দেখে মনে হয়েছিল যে এতরকম গুণ যে মেয়ের থাকবে সে বিয়ে করতে যাবে কেন, সে তো ফিল্মে চলে যাবে। এ মেয়ের বাপকেও দেখছি দাবি মেটাতে হবে, যদিও তা নেগোসিয়েবল্ বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

তবে সাধারণভাবে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তা হল এইরকম—সরকারি কেরাণীর জন্য সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। দাবী নেই। এর উত্তরে হাজার-খানেক চিঠি আসে। বাছাইয়ের জন্য বাড়ির সবাইকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বেছে বেছে সেইগুলোই নেওয়া হয় যেগুলোতে বোঝা যায় যে মেয়ের বাপ বড়লোক। দাবি নেই বললেও মেয়ের বাবা নিজে থেকেই ভাল ভাল জিনিস দেবেন, এটাই সবাই চায়। অনেক ক্ষেত্রে দাবি নেই দেখে উল্লসিত হয়ে যাঁরা আসেন তাঁরা জানতে পারেন যে আসলে দাবি মেটাতে যিনি পারবেন তাঁর দাবিই অগ্রাধিকার পাবে। অবশ্য এখানে সরাসরি দাবি করা হয় না। কেবল ঠারেঠোরে শুনিয়ে দেওয়া হয়। আমার মনে হয়, এতে ব্যাপারটা মিটতে দেরি হতে পারে, সেক্ষেত্রে সরাসরি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করাই ভাল। একটা খসড়া দিচ্ছি, এটিকে অদল বদল করে চালানো যেতে পারে।

পাত্রী চাই। বয়স ২৫-য়ের মধ্যে হওয়া চাই। ছেলের বয়স ৩০। পাকা চাকরি। দেখতে শুনতে সুশ্রী হতে হবে। দুয়েকটা গান জানা থাকলে ভাল। প্রথম প্রথম যারা বউ দেখতে আসবে, তাদের গান শোনানো চাই। বরযাত্রী একশো'র ওপরে হবে, সেটা খেয়াল রাখা দরকার। বউ যে বাড়িতে আসবে, সে পরিবারে প্রণম্য মানুষের সংখ্যা হবে ৩০ থেকে ৪০,—এটা অবশ্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

এতে অনেকটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, এমনকি প্রণামীর সংখ্যা পর্যন্ত। তবু এতে পাত্র কি চায়, সেটি বলা হয়নি। সেটি সোজাসুজি পাত্র নিজেই

বিজ্ঞাপনের মধ্যে বলতে পারে। পাত্র নিজেই লিখলে এটাকে এক ধরনের প্রেমপত্রও বলা যেতে পারবে। প্রেমের চিঠিতে সাধারণত ভালবাসার অনেক ইচ্ছার কথাই বলা হয়ে থাকে। এতে বলা হবে ভালো একটা বাসা গড়বার ইচ্ছার কথা।

আমার বয়স ৩০। বিয়ে করতে চাই যাকে, তার বয়স ২৫-য়ের ওপরে যেন না হয়। আমি গান শ্ুনতে ভালবাসি, পাত্রী গান জানলে ভাল। তবে সে তো নিয়মিত গাইতে পারবে না। তার যদি গ্রামোফোন এবং টেপরেকর্ডার থাকে তাহলে সবদিকেই সুবিধে। এইসঙ্গে তার রেকর্ড এবং ক্যাসেটের স্টক
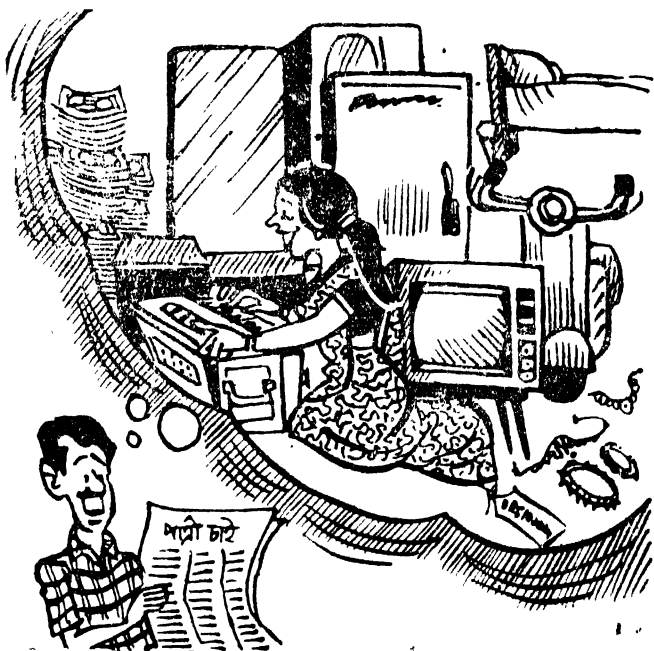
জানালে ভাল হয়। আমি টিভি দেখতে ভালবাসি. শ্ুনেছি কালার টিভি নাকি আরো মুগ্ধকর। পরে দেখব নিশ্চয়।

এতেও বিটুইন দি লাইনস অনেক কথা বলা হয়েছে। মেয়ের বয়স ২৫-য়ের ওপরে যেন না হয়, একথা বলে রাশ টানতে চাওয়া হয়েছে, যার ফলে মেয়ের বয়স ২৭-য়ের ওপরে হবে না। নিজের বয়স ৩০। মানে ওটাও ৩২-য়ের মধ্যেই হবে। যৌতুক হিসেবে টেপরেকর্ডার ইত্যাদি এবং কালার টিভি যে চাওয়া হয়েছে, তা যে কোন কালা-ও শ্ুনতে পাবে। তথাপি

এতে কোন নগদ টাকার কথা নেই, তার ইশারা দেবার মত বিজ্ঞাপন হতে পারে এইরকম—

পাত্রীপক্ষকে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। তিনরকম ছবি পাঠাবেন। দাঁড়িয়ে, বসে এবং পাশ থেকে তোলা হওয়া চাই। একটিতে চুল খুলে রাখতে হবে। ছবির কপি রেখে পাঠাবেন। ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হবে না। এই মাসে কথা হয়ে থাকলে আগামী শীতে বা বসন্তে দিন স্থির করা যাবে। মনস্থির আগেই করা প্রয়োজন, কারণ আয়োজন করতে সময় লাগে। অনেক নিমন্ত্রিত হবে আমাদের, প্রতি প্লেট ৫০ টাকা পড়বে (মিষ্টি ছাড়াই), —এসবের সংকুলান করে নিতে হবে তো।

একটু ঘুরিয়ে বলা হলেও, ঐ খাওয়া-দাওয়া বাবদ একটা মোটা টাকা চাওয়া হয়েছে মনে হয়। অনেক শাশুড়ি দু'সেট করে বাসন চান, কারণ বউ যদি আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এক সেট নিজেরা রেখে দেবেন। এসব ব্যাপারে কোনরকম ধোঁকা দিতে চেষ্টা করলে যে বরদাস্ত করা হবে না, তার জন্য আগাম ধমকও অনেকে দিয়ে রাখেন। তাঁরা লেখেন—পাত্রীর বংশপরিচয় জানাবেন। আমরা বর্ধিষ্ণু পরিবার। সকলেই কেরোসিন, পেট্রল এবং গ্যাস সরবরাহের কারবার করি।

বোঝাই যাচ্ছে এই পরিবারে আগুন লাগিয়ে দেওয়াটা অসম্ভব নয়।

অনেকে সরাসরি চাকুরিওয়ালা মেয়ে চান, অনেকে চান চাকরির জন্য উমেদারির যোগ্য মেয়ে। দরকার হলে যেন আয় করতে যেতে পারে। এঁরা বোঝেন না যে পরে যখন দরকার হবে, তখন মেয়ের বয়স থাকবে না। সরাসরি চাকরি-করা মেয়ে আনলে সে বোধহয় এক্ষুনি আলাদা হয়ে যাবে এই তাঁদের ভয়। আমি একজনকে বলেছিলাম, আলাদা তো হবেই, এই বাজারে সে বাড়ির এত লোক টানবে কেন? শেষ পর্যন্ত তাকে স্বামীর কাছ থেকেও আলাদা হয়ে যেতে হতে পারে। বিয়ের মজা আর ক'দিন, পরে ঐ দ'য়ে মজে সে থাকবে কেন? শুনে আমার ওপরে সেই ভাবী শাশুড়ি খুব ক্ষেপে গেলেন, তবে ভাবী শ্বশুরমশাই বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু একথা আমার বলার সাহস হবে না।'

অনেক পাত্রই অবশ্য বিয়ের ভরসায় থাকে। নিজে কিছু করতে পারেনি, এখন যদি স্ত্রীভাগ্যে সে করে খেতে পারে, এজন্যই বিয়ের ঝুঁকি নেয়। একটি পাত্র চাই—বিজ্ঞাপনের উত্তরে একটি পাত্র নিজেই লিখেছিল, in reply to your advertisement I beg to offer myself as a candidate for the same. একেবারে চাকুরি প্রার্থীর ভাষায় পাণি প্রার্থনা

করা হয়েছে। এই ধরনের অসহায় পাত্রের নমুনা দু'য়েকটি পরিমল গোস্বামী দিয়েছিলেন তার উদাহরণ দিই—Manager Juganta Patrika.

Please arrange a marriage between me self and a kayastha girl. ভাষা অপরিবর্তিত রাখা আছে, ভুল শুধরানো হয়নি।

এছাড়া আছে—আমি পত্রিকায় দেখিলাম আপনার একটি কন্যা বিবাহের উপযুক্ত আছে। দাবি কিছুই নাই, চাকুরির বিনিময়ে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

—মহাশয় আপনার যুগান্তরে বিজ্ঞাপন দেখে লিখিতেছি, আমি ম্যেট্রিক পাশ, আমাকে দয়া করিয়া যদি একটি চাকরি দেন তবে আমি আপনার অনুগত হইতে পারি।...দয়াপরবশ হইয়া রেল কোম্পানিতে কাজ দিলে আমি আপনার আশা পূর্ণ করিতে পারি। অসৎ কোন দাবি-দাওয়া আমার নাই।

খুবই অভাবগ্রস্তের আবেদন। লক্ষ্য করতে হবে যে এর মধ্যেও এ রেল কোম্পানিতে কাজ চেয়েছে, বোধহয় ভেবেছে যে তাহলে ট্রেনের পাশ পাবে, বৌ নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারবে। এর অবশ্য চাকরিটাই আসল, বিয়েটা নয়।

অবশ্য সরাসরি পণের দাবি জানিয়েও কেউ কেউ চিঠি লিখেছে। যেমন—

Manager,. Jugantar, Marriage Section.

Sir, Please send a photo of kayastha girl who will give Rs. 51,000 and another photo of Rs. 2000 Rs. 4000. এই লোলুপ ছেলেটি ভেবেছে যে পত্রিকায় বোধহয় ঘটকালি করা হয়। তবে ৫১,০০০-এর সঙ্গে ২০০০ বা ৪০০০ আলাদা করে কেন চাওয়া হয়েছে, বোঝা গেল না। সম্ভবত একাধিক পাত্র আছে। তাদের স্তর হিসেবেই টাকা চাওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ যেমন লেখেন, 'অতীব সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই', কেউ আবার তেমন লেখেন 'সুপাত্রী চাই'—সুপাত্রী কথাটার যথেষ্ট নমনীয়তা আছে। এটাকে টেনে টেনে, বাঁকিয়ে চুরিয়ে পাত্রীর গুণাবলী অনেক বাড়ানো যায়। সুপাত্রীকে শিক্ষিতও হতে হবে, সুন্দরীও, গানও গাইতে হবে। চাকরিও করতে হবে। লম্বাও হতে হবে, স্মার্টও হওয়া চাই। এত সব থাকলে তাহলে 'চাহিদা কম' হতে পারে।

অনেক বিবাহ প্রতিষ্ঠান আছে, যারা বৈশাখে বলে আষাঢ়ে বিয়ে সুনিশ্চিত হবে। আশ্বিনে বলে অঘ্রাণে। পৌষে বলে মাঘ-ফাল্গুনে। পাত্রীর মা, বাবা এসব জায়গায় অনেক আশা নিয়ে যান, তারপরে হতাশা নিয়ে ফিরে আসেন। কোন ডিভোর্সী আরেক ডিভোর্সীকে চান। আমি একটি

বিজ্ঞাপনে দেখেছি সরাসরি বিপত্নীক পাত্র চাওয়া হয়েছে, তাকে অবশ্য উদারও হতে হবে। হয়তো যে মেয়ের জন্য এই চাওয়া, সে এককালে উদারই ছিল, যেজন্য তার বিয়ে হচ্ছে না হয়তো। তাই উদার পাত্র চাই। বিপত্নীকের চেয়ে বেশি উদার আর কোথায় পাওয়া যাবে? দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি পক্ষপাত আর কার?

একটি পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের ফলাফল জানাতে পারি। ফটোসমেত দেখা করুন,—এই ঘোষণা কাগজে পড়ে এক ভদ্রলোক এসেছেন পাটনা থেকে। খুঁজে খুঁজে কলকাতার প্রত্যন্ত প্রদেশে পাত্রের ঠিকানা বার করেছেন। ঘরে ঢুকে দেখেন পাত্রের বাবা তাঁর মক্কেলদের নিয়ে বসে আছেন, খুব ব্যস্ত। ও'কে দেখেই বললেন, 'কি চাই?' পাত্রীর বাবা সসঙ্কোচে বললেন,—'আজ্ঞে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। পাটনা থেকে আসছি।' পাত্রপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ও, ছবি এনেছেন?' পাত্রীর বাবা তৎক্ষণাৎ ছবিটি বার করে বাড়িয়ে ধরলেন। পাত্রের বাবা সেটিকে নিয়ে নিজের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে বললেন—'ঠিক আছে, আমি খবর দেব।' এই বলে তিনি পুনরায় তাঁর মক্কেলদের কথায় ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন।

পাত্রীর বাবা একটু বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই রাত্রের ট্রেনেই পাটনা ফিরে গেলেন তিনি। সেখান থেকে কয়েকটি চিঠি দিলেন পাত্রের বাবাকে। কোন জবাব পেলেন না। অগত্যা ক'দিন পরে আবার এলেন তিনি। এবারে ঘরে ঢুকে বললেন, 'আমি পাটনা থেকে আসছি।' এবারও পাত্রের বাবা বললেন—'ও, এই যে।' ড্রয়ার খুলে ছবিটি বার করে তুলে দিলেন পাত্রীর বাবার হাতে, 'এটা আর দরকার নেই।' এই বলে আবার ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন নিজের কথায়। পাত্রীর বাবা ধীরে বেরিয়ে এলেন।

এই মাসেই বিয়ে করে ছেলে আমেরিকায় ফিরে যাবে,—এই ধরনের বিজ্ঞাপনেও অনেকে প্রলোভিত হন। বিয়ের পর মেয়ে বিদেশ যাবে,—এমন বিয়ে তো সর্বস্বান্ত হয়েও দিতে হবে। এ বিয়ে কেমন হয় জানি না। শুধু এইটে জানার জন্যই আমায় একবার বিদেশে যেতে হবে। দেশী মেয়ে বিদেশী বাথরুম পরিষ্কার করতে করতে অহংকৃত হয় কিনা জানা দরকার।

রান্নায় দ্রৌপদী, সহিষ্ণুতায় বসুমতী, শুশ্রূষায় ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল চাই, এই বলে এখনো বিজ্ঞাপন বেরোয়নি। তবে যে ছেলের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, সে বিয়ে করে একবার কপাল ফিরিয়ে নিতে চায় কেমন করে, তার একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি—

আমি দিনে সার্ভিস করি, রাত্রে বি কম পড়ি। কোন ভদ্র পরিবারে বিয়ে করে ভাইয়ের মত থাকতে চাই।

অ-লৌকিকতা

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন উপহার দিয়ে। উপহার, মানে লৌকিকতা। আগে অন্তত মৃত্যুতে লৌকিকতা ছিল না। এখন এতেও কিছু না কিছু হাতে করে যেতে হয়। জন্মদিন বা বিবাহ—এ দু'টোয় তো উপহার দেওয়ার রেওয়াজ বহুকালই চালু আছে। মৃত্যুতে ছিল না। আমার এক পিসিমা বলতেন, 'কেউ মারা গেলে তো সে বাড়িতে একটু কেঁদে এলেই চুকে যেত।' এখন আর তাতে হচ্ছে না। সেখানেও কিছু নিয়ে যেতে হয়। তবে বিয়ে বা জন্মদিনে যা নিয়ে যায় সবাই, এটা তার থেকে আলাদা। জন্মদিনের উৎসব আগে তো কখনো দেখিনি, বাড়িতেই প্রদীপ জেলে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলেই হত। এখন আবার নেমন্তন্ন করতে হয় অনেককে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বেলায় ঘর সাজানো হয় লাল নীল কাগজ দিয়ে, নানারকম খেলার ব্যবস্থা হয়। খুব ছোট কেউ হলে কোনো খেলনা দেওয়াই রীতি—সে সব খেলনার দাম অবশ্য মোটেই ফেল্‌না নয়। আরেকটু বড় হলে বই দেওয়া যেতে পারে, তবে বই-য়ের চল্ ক্রমে কমে আসছে। বড়দের কোনো থ্রিলার, অথবা কমিক্‌স। এখন অবশ্য যেটা চলছে সেটা হল ক্যাসেট। হিন্দি গানের হলেই ভাল। নানারকম জমাটি সুর, চিৎকার, বাজনা। শুনলে মনে হবে পুলিশ ডেকে নিজের বাড়িতেই হানা দেওয়া ভাল, নয়তো হানাবাড়িতে বাস করাই উচিত। এইসব উপহার কেবল যারা নিমন্ত্রিত, তাঁরাই দেন এমন নয়—নিমন্ত্রণকর্তাও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাল্টা উপহারের প্যাকেট তৈরি রাখেন। তাতে লজেন্স আছে, বেলুন আছে, বাঁশি আছে। তারাও খুশি হয়ে এসব প্যাকেট পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরে। জন্মদিনে স্কুলের সতীর্থদের নিমন্ত্রণ করার নিয়ম থাকে। কিন্তু কোনো কোনো স্কুলে আরেকটা কায়দা চালু আছে। ক্লাশে প্রচুর ছেলেমেয়ে। অত লোককে নিমন্ত্রণ করার মত জায়গা নেই বাড়িতে। কেউ হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হল ভাড়া করতে পারেন, যাঁরা তা পারেন না, তাঁরা কী করেন? তাঁরা ক্লাশের সবার জন্য চকোলেটের প্যাকেট নিয়ে যান—আন্টির হাতে বুঝিয়ে দিয়ে আসেন, আন্টি প্রত্যেকের হাতে তুলে দেন ঐ চকোলেট। তারা সবাই আন্টির সঙ্গে সমস্বরে বলে 'হ্যাপি বার্থডে।' এতেও খরচ কম হয়

না, সে মাসে বাবার অফিস লোন কাটা বন্ধ রাখতে হয়। অবশ্য এরমধ্যে এমন কেউ কেউ থাকে যাদের জন্মদিন পড়ে হয় গ্রীষ্মের, নয়তো পুজোর ছুটির মধ্যে। তার সবটাই লাভ। অন্যের জন্মদিনের চকোলেট খেতে পায় সে, নিজের জন্মদিনে কিছু খাওয়াতে হয় না।

জন্মদিনের ঘটা এখন বেড়েছে। শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও জন্মদিন হচ্ছে। সেখানেও উপহার নিয়ে যাচ্ছে সবাই। শুধু ফুল দিয়ে সারেন কেউ কেউ, তবে ফুলও আর বিউটিফুল নেই, তারও দাম অনেক। কেউ নিজের জন্মদিনে নেমন্তন্ন করেই জিগ্যেস করে নেন, 'কী দিবি ভাই আমাকে ?'

যেমন একটা বাচ্চা মেয়ে বলেছিল এক নতুন পরিচিত ভদ্রলোককে। পার্কে বেড়াতে গিয়ে তার আলাপ হয়েছিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। রোজ তিনি গল্প করতেন মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি তাঁকে নিমন্ত্রণ করল তার জন্মদিনে। ভদ্রলোক খুশি হলেন, তিনি ঐ মেয়েটিকে পছন্দ করতেন খুব। বললেন, 'কিন্তু তোমার বাড়ি কোথায় ?' মেয়েটি আঙুল দিয়ে দেখাল রাস্তার ধারের একটি বাড়ি। বলল, 'ঐ বাড়িটার ৪নং ফ্ল্যাটে আমরা থাকি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সামনেই দেখবে 4 নম্বর লেখা আছে। কনুই দিয়ে বেলটা বাজিও।' ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, কনুই দিয়ে কেন ?' মেয়েটি বলল, 'বারে, তোমার দু'হাত তো আমার জন্য আনা উপহারে আটকে থাকবে।'

আজকাল বড়দেরও জন্মদিন হচ্ছে। বাচ্চারা প্রতি জন্মদিনে বড় হয়, বড়রা প্রতি জন্মদিনে বুড়ো হয়। তবু তারাও জন্মদিন করে। বোধহয় আর বেশিদিন নেই বলেই করে। তাদেরটাকে বলে পার্টি। সেখানেও উপহার নিয়ে যেতে হয়। কখনো ফুল, কখনো মিষ্টি। কেউ শুধু কার্ড পাঠায়, তাতে প্রথম পাতায় লেখা থাকে—If you think that you are getting only a card instead of a gift then……এর পরেরটুকু থাকে ভেতরের পাতায়—age hasn't dulled you a bit—এতে প্রাপক মহা খুশি, কারণ এতেই তার বয়স বৃদ্ধির দোষ কেটে গেল, অথচ দাতাও সস্তায় সারল।

এইভাবে উপহার দেওয়া, লৌকিকতা রক্ষা করা আমাদের বেড়ে চলেছে। সেই লোকই বুদ্ধিমান, যে একটি অন্নপ্রাশনে উপহার দিয়েছিল আট আনা দামের বর্ণপরিচয়, বলেছিল বিদ্যে হলে সব হবে।

তাই বলছিলাম, আমাদের লৌকিকতা বাড়ছে। অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ। যত জটিল হচ্ছে দিনকাল, তত কুটিল হচ্ছে এই জাল। এমনকি আজকাল কারো বাড়ি বেড়াতে গেলেও লোকে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে

যাচ্ছে। এটাই নাকি রেওয়াজ হয়ে গেছে। শুধু দেখা করতে গেলেও যদি মিষ্টি নিয়ে যেতে হয় তাহলে তো ছিষ্টি রসাতলে গেল দেখছি।

বিয়ের উপহারের তো মেলা বসে যায় এখন। যার উপহার কম, তার বড় অবহেলা। বৌয়ের পাশে বসে আছে একটি সুবেশা তরুণী। তার ধারণা সে সুন্দরীও বটে, তার হাতে একটি খাতা। যে যা উপহার দিচ্ছে সে ঐ খাতায় লিখে রাখছে সে সব। যেন সেন্সর করে নিচ্ছে উপহার। যে দামী শাড়ি দিল, সে তো গলা তুলে হাসছে, তার পাশেই যে দিল কাব্যগ্রন্থ, তার তো মুখ চুন। ঠোঁট উল্টে মেয়েটি খাতায় লিখল, শুধু বই। সে বই যারই হোক না কেন, 'রবীন্দ্রনাথ বা সেক্সপীয়ার' তার পরিচয় শুধু 'বই'। শাড়ি যে দিল তার বেলায় বিস্তারিত লেখা হল—জর্জেট না বেনারসী, কাঞ্জিভরম না আর কিছু। সম্ভাব্য দামটাও নথিভুক্ত হয়ে থাকে ঐ খাতায়। যিনি লিখতে বসেছেন তিনি সাধারণত এ ব্যাপারে জহুরী হয়ে থাকেন, শাড়ি দেখলেই তিনি দামটা প্রায় নির্ভুল ধরতে পারেন। দোকানের প্যাকেট দেখলেও দামের আভিজাত্য ধরা যায়। তবে অনেকে কম দামী শাড়ি বড় দোকানের প্যাকেট জোগাড় করে তাতেই ঢুকিয়ে নিয়ে আসেন, যাতে (মিত্র) লোকের চোখে দামটা বাড়ে, তাঁর নামটাও হয়।

অনেকে শাড়ি বা ঐরকম কিছু দেন না। তিনি কোনো সৌখিন বস্তু আনেন। দেওয়াল সাজানোর ওয়াল প্লেট, টেবিল ল্যাম্প, মোমদান ইত্যাদি। এগুলো সাধারণত অনেকগুলো করে পাওয়া যায়। সেগুলোর সুবিধে আছে, ওগুলোকে আবার অন্য বিয়েতে চালিয়ে দেওয়া যায়। আমি তো এজন্য বইতে পেন্সিল দিয়ে লিখি, যাতে রবার দিয়ে ঘষে সে বই আবার ওরা অন্য বিয়েতে দিতে পারে। কোনোদিন হয়তো সে বই আমার বাড়িতেও ফিরে আসতে পারে। অনেক হাতফেরতা হয়ে। আমি কি তখন সেটা প্রথম যাকে দিয়েছিলাম তাকে আবার পাঠাব?—যেমন করেছিলেন বার্ণার্ড শ'। তিনি একটি বই এক বন্ধুকে উপহার দিয়েছিলেন, লিখেছিলেন With compliments—পরে সে বই তিনি পুরোনো বইয়ের দোকানে আবিষ্কার করলেন। তৎক্ষণাৎ সেটি কিনে নিয়ে তিনি পুনর্বার পাঠালেন সেই বন্ধুকে—এবারে লিখলেন With renewed compliments.

যাই হোক, এভাবে ঐসব পড়ে থাকা জিনিসগুলো অন্যত্র চালিয়ে দেওয়া যায়। যার একটাই ঘর, তার তো শুধু চারটেই দেয়াল। তাতে ঘড়ি আছে, ক্যালেন্ডার আছে, কারো বাঁধানো লালচে ছবি আছে। নিজেদের যুগলবন্দী ছবি লাগাবার জায়গা হবে কিনা কে জানে। সে যদি আটটা

ওয়াল প্লেট পায় তবে অট্টহাস্য করা ছাড়া কি করার থাকতে পারে ? টেবিল ল্যাম্প রাখতে লেগে টেবিল আনতে হয়। চাবুকের জন্য ঘোড়া। বরং মোমবাতিদানটা কাজে লাগবে। বিদ্যুৎ তো উঠেই গেল, কারো ঘরেই হয় না আলো জ্বালা, অতএব মোমবাতি তো লাগবেই।

কথায় কথায় আসল কথাই ভুলেছি। কি জিনিস কাজে লাগবে বা কি জিনিস পছন্দ হবে এটাই বলে যাচ্ছি, মূল কথাটা হল লৌকিকতা ছাড়া লোকের কথা মূল্যহীন। যাঁরা এমন সৌখিন জিনিস আনেন যার দাম কত বোঝা যায় না, তাঁদের বেলায় সন্দেহের চোখে তাকায় ঐ মেয়েটি যে বউয়ের পাশে বসে পাতায় লিখছে। সে তখন হাসিহাসি মুখে জিগ্যেস করে, 'বা খুব সুন্দর তো জিনিসটা, কোত্থেকে কিনলেন ? কত দাম ভাই ?' এরকম সরাসরি প্রশ্নে শ্রোতাই অপ্রতিভ হন, তবে চালাক হলে দামটা বাড়িয়ে বলেন, আর সাদাসিধে হলে আসল দামটাই বলে দেন। দশ টাকা ? শুনে মেয়েটি ভুরু কুঁচকে কাউকে ডেকে বলে, 'এঁকে দশ নম্বর ঘরে বসিয়ে দাও।' ওই ঘরের খাবারে মাছের ফ্রাই বাদ দিয়ে যাওয়া হয় পরিবেশনের সময়ে। মিষ্টি রিপিট হয় না।

কেউ যদি 'কুড়ি টাকা' বলেন, তবে তাঁর বেলা বরাদ্দ হয় কুড়ি নম্বর ঘর, অর্থাৎ সেখানে দেখানো হয় সব আইটেম, পরিবেশন হয় না। পরিবেশনকারী নিজেই বলে, 'আপনাকে দেব ? না ঃ'—নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই উত্তর দেয়, নিজেই দ্রুতবেগে পাতের সামনে থেকে চলে যায়। তিরিশ বা চল্লিশ টাকাতেও অবস্থা বিশেষ বদলায় না, বড়জোর ঐ 'আপনাকে দেব, নাঃ' এটা আপনি দু'বার শুনতে পাবেন। খাবার রিপিট না হলেও পরিবেশন রিপিট হয়। পঞ্চাশ দিলে একটু খাতির মেলে, এটা নিন, ওটা নিন শুনতে পাওয়া যায়। লোক আপনার লৌকিকতাই দেখে, আপনাকে দেখে না। যতই অপছন্দ করুন, ভাল উপহার' না দিতে পারলে আপনার অবস্থা করুণ হতে বাধ্য। 'দাবি নেই' যে ছেলের বাবা বলে, সে ছেলের মা প্রণামী চায় ঢালাও হাতে। ওটা লৌকিকতা। নইলে মান থাকে না। প্রাণ যাক, মান থাক।

অথচ উপহারের আতঙ্ক চিরকালের। অফিসে কেউ নিমন্ত্রণ করলে জোট বেঁধে চাঁদা তোলা হয়। অনেকেই এড়িয়ে যান। তাঁরা বলেন 'আলাদা দেব', কিন্তু কিছু না দিয়েই খেয়ে আসেন। যার বাড়ি সে ভাবে উনি ঐ দল বেঁধে দেওয়া উপহারের মধ্যেই আছেন। যে এ বিয়ের চাঁদা তোলে তার অবস্থা হয় করুণ। সকলেই বলেন, 'দিয়ে দিন আমি পরে দেব।' আর

পরে দেন না। পরের বারের বিয়েতে ঐ চাঁদা তোলার কথা হলে সকলেই বলে, 'আমি দু'-পাঁচ টাকা বেশি দেব, চাঁদা তুলতে বলো না।'

অদ্ভুত এই লৌকিকতা এখন আমাদের কাছে ভূতের ভয়। কেউ কেউ লেখেন, লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়, এ কথায় কেউ বিশ্বাস করেন না। এমনকি যদি কেউ সত্যিই একথা শুনে উপহার না আনেন, তবে তিনি অপ্রস্তুত হন, কারণ দেখেন সকলেই উপহার দিচ্ছে, নিচ্ছেও বটে।

আবার কেউ যদি প্রকৃতই উপহার নিতে না চান, তাও কেউ সহ্য করেন না। বলেন, এসব ঢং। উপহার দিতেও কষ্ট, না নিলে অপমান। একে ঢং বলবেন, না ঢংঢাং বলবেন, ভেবে দেখুন।

অনেকে অফিসে বা ক্লাবে সবাইকে নিমন্ত্রণ করার সময়েই বলে দেন, একটা সেলাই কল দিতে। চাঁদা তুলে যদি কম পড়ে, তবে সেটুকু ঐ নিমন্ত্রণ কর্তাই দিয়ে দেন। আসলে পাত্রপক্ষের দাবি ছিল একটা সেলাই কল।

শ্রাদ্ধে সবাইকে চব্য চোষ্য খাওয়ানো এক ধরণের লোকাচার, লৌকিকতা। আগে নিরামিষ খাই না বলে অনেকে শ্রাদ্ধে খেয়ে সুখ পেতেন না, এখন জমানা বদলেছে। শ্রাদ্ধের বদলে নিয়মভঙ্গের দিন নেমন্তন্ন করে অনেকে।

শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে মুরগী আর চিংড়ি খাওয়ায়। মৃত ব্যক্তি নাকি ঐ দুটো খেতে খুব ভালবাসতেন। ও দুটো উপাদেয় খাবার মৃত ব্যক্তি কেন, জীবিতরাও কম ভালবাসেন না, কিন্তু মৃত ব্যক্তির নাম করে এই লোলুপতা তাকে না কাকে তৃপ্তি দেয় তা জানা যাবে না কোনোদিন। শ্রাদ্ধ বাড়িতে দামী ফল আর দামী মিষ্টি নিয়ে যাওয়া এবং ভাল খ্যাঁট সেরে ফেরা, এই দুটোই হল অলৌকিক আত্মার জন্য লৌকিক প্রথার যূপকাষ্ঠে আমাদের বলিদান। শ্রাদ্ধবাড়ি এখন বিয়ে বাড়ির তুল্য।

বেঁচে থাক লৌকিকতা, চিরজীবী হয়ে তুমি।

শ্রদ্ধা ছাড়াই শ্রাদ্ধ

শ্রদ্ধয়া দেয়ং—'শ্রদ্ধা' দিয়েই শ্রাদ্ধ করতে হয়। এখন অবশ্য ব্যাপারটা বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি শ্রাদ্ধবাসরে যান, তাহলে দেখবেন সকলেই গল্পে এবং খাওয়ায় এমন মশগুল যে আপনি ধরতেই পারবেন না এটা কোনো বিয়েবাড়ি নয়। সবরকম আলোচনা চলছে,—মন্ত্রীসভার সঙ্কট, ফুটবলের অধঃপতন, দুর্নীতির বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পরিবর্তন—কেবল যাঁর জন্য ঐ শ্রাদ্ধের আয়োজন, তাঁর কথাই কেউ বলছে না। অবশ্য এককোণে তাঁর একটা ছবি রাখা আছে, তাতে মালাও দুলছে। সেটা যে কেউ দেখছে তা ধরা যাচ্ছে না, আবার কেউ দেখছে না তাও ঠিক নয়—অনেকে বাড়িতে ঢুকে একবার প্রথামত ছবিটার সামনে এক মিনিট নীরবতা পালন করে নিয়েই লেগে পড়ছেন হৈ-হৈ করতে। আমি এমন এক বাড়িতে দেখেছিলাম এক চিত্রপরিচালককে। সেখানে বসে মনে হল আমি কোনো স্টুডিওতে এসেছি, স্যুটিং শুরু হলেই হয়। সবাই সিনেমার কথা বলছে এমনভাবে, যেন তারা ছবির মহরৎ দেখতে এসেছে।

শ্রাদ্ধবাড়ির ভোজের সঙ্গে বিয়েবাড়ির ভোজের কোনো তফাত নেই। আগে শ্রাদ্ধে নিরামিষ খাওয়ান হতো, এজন্য কারো পছন্দ হতো না সেই

খাওয়া। এখন শ্রাদ্ধের বদলে নিয়মভঙ্গের দিন ব্যবস্থা করেন অনেকে,—যাতে জমিয়ে মাছ মাংস খাওয়ানো যায়। যিনি খাবেন তাঁরও ভাল, যিনি খাওয়াবেন তাঁরও সুনাম। খাওয়া নিয়ে নানা সরস মন্তব্য এখন শ্রাদ্ধবাড়িরও অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আমি একটি শ্রাদ্ধবাড়িতে গিয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম। যিনি শ্রাদ্ধ করছেন, তিনি এসে বললেন, 'এই ব্যাচটা উঠতে দেরি আছে, ততক্ষণ একটা ফ্রাই খান চাটনি দিয়ে বেশ লাগবে।' আমি স্তম্ভিত হলেও তখনো কিছু কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, বললাম, 'না, না, থাক।'

অনেক শ্রাদ্ধবাড়িতেই খাবার জায়গায় সেই পুরোনো রসিকতাগুলো হয়ে থাকে। একজনকে চারটে রসগোল্লা দিয়ে আরো চারটে দিতে চাইছে পরিবেশনকারী। যে খাচ্ছে সে বলছে, 'আর দেবেন না, পারব না।' তাকে বলা হচ্ছে, 'বলিস কি রে, তুই রসগোল্লা খেতে পারবি না? একথা কেউ বিশ্বাস করবে?'

আপনি যদি কাউকে বলেন, 'শ্রাদ্ধে লোক খাওয়ানো কেন?' তাহলে সে হাঁ হাঁ করে আসবে, 'বল কি? না খাওয়ালে কি আত্মার তৃপ্তি হয়? সে কত খাওয়াতে ভালবাসত।' যে-ই মারা যাক, শুনবেন সে নাকি খাওয়াতে ভালবাসত! ভালবাসলেও সে তো বেঁচে থাকার বেলা, কিন্তু মরবার পরে? তখন তো তৃপ্তি যারা খাচ্ছে তাদের,—সে তো কিছুই দেখছে না, জানছেও না। তাছাড়া বেঁচে থাকার বেলায় তার যা কাজ, মরবার পরে সে কাজ তো যারা রইল তাদের। শ্রাদ্ধ তো তাকেই মনে করা। সে ব্যাপারটা আর যেখানেই হোক, শ্রাদ্ধবাড়িতে হয় না।

অবশ্য মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই খোঁজ পড়ে মৃতের কোন ছবি আছে কিনা,—তাই নিয়ে তাকে বড়ো করো, বাঁধাও, মালা ঝোলাও। এ সবই প্রথা, এ সবই ফর্মালিটিস্। মৃত্যুর ফর্ম ভর্তি করা মাত্র। যে চলে গেল তাকে মনে করা নয়, ঐ উপলক্ষে আরেক উৎসবকে মেনে নেওয়া। শবদেহের ওপরে দাঁড়িয়েই সেই উৎসবের সূচনা।

ছবি খুঁজে পাওয়াও সব সময়ে সম্ভব হয় না। ইদানিংকার কোন ছবিই তো নেই দেখা যাচ্ছে,—খুঁজে খুঁজে একটা পুরোনো গ্রুপ ছবির মধ্যে থেকে পাওয়া গেল, এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা মুখটি, যা বিবর্ণ হয়ে এসেছে,—হয়তো বা বিকর্ণও, মানে কানটা ঢাকা পড়েছে আরেকজনের পিছনে। তবু তাই নিয়ে ছোট ফটোর দোকানে—ওই থেকে বড়ো করে দিন, একটু আধটু টাচ্ দিয়ে বানিয়ে দিন একটা ছবি। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল। এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর একটি ছবি নিয়ে গেলেন স্টুডিওতে। ছবিটা বড়ো করে দিতে হবে। তবে স্বামীর

মাথায় একটা টুপি আছে, টুপিটা বাদ দিয়ে দিলেই ভাল হয়—টুপি পরা ছবি স্ত্রীর পছন্দ নয়। ছবিওয়ালা বলল, 'এ আর শক্ত কি? টুপি বাদ দিয়ে দেব। তবে আপনি বলুন তো আপনার স্বামী কোনদিকে চুলের সিঁথি কাটতেন?' স্ত্রী অনেকক্ষণ ভাবলেন, তারপরে বললেন, 'মনে পড়ছে না। কি দরকার? আপনি যখন টুপিটা বাদ দেবেন, তখন তো টুপিটা তুললেই দেখতে পাবেন কোনদিকে সিঁথি কাটা আছে।'

প্রায় এইভাবেই ছবি তৈরি হয়, শ্রাদ্ধের ছবি বড়ো করে বাঁধানো হয়, ফুলের মালা ঝোলানো হয় ছবির গলায়। জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে তারে কেন দিতে এলে ফুল। বেঁচে থাকতে যার খেয়াল রাখিনি, এখন তাকে নিয়ে দানসাগর। সে যা খেতে ভালবাসত, সব রাঁধো আজ। বাঁচার সময়ে তাকে খাওয়াইনি, এখন নিজেরা খাই। ওই নাম করে, ওই ছুতোয়, ওই অজুহাতে।

অনেকে আবার মৃতের ছবি তোলে। চারপাশে গোল হয়ে সবাই বসে, কেউ বা দাঁড়ায়। ওরই মধ্যে চুলটা ঠিক করে নেয়, হাত বুলিয়ে নেয় মুখে। শ্মশানেই পাওয়া যায় ক্যামেরাম্যান,—তারা জ্যান্ত লোকের ছবিও খাটে না শুইয়ে তুলতে পারে না। দাঁড়ানো মানুষের ছবি ওরা কখনো তোলেনি। সেই ছবি তোলা হয়, তারপরে কোথায় যায় কে জানে!

শ্রাদ্ধবাড়ির সমারোহ পূর্ণ হয় না, যদি গীতাপাঠ না হয়। যে কোনদিন গীতা পড়েনি, তার মৃত্যুতেও গীতা পড়া হয়। বুকের ওপরে রাখা হয় গীতা। যে গীতা বলতে বোঝে কোনো গীতের বই, সেও জানে যে শ্রাদ্ধে গীতা পড়তে হবে, যদিও কেউ শুনবে না। এও একটা ফর্ম, কোনো ধর্ম নয়। ধর্ম আমাদের জীবনে কোথাও নেই, মরণেই বা থাকবে কেন? সারা জীবনে আমরা শুধু যে অন্যায়কে মেনে নিই এমন নয়, নিজেরাও অন্যায় করি,—কেউ মারা গেলেও তাই আমাদের অপরাধের দায় কমে না, তখনো শ্রাদ্ধের নামে যা করি, তা দেখে আত্মা আঁতকে ওঠে। প্ল্যানচেটে যাঁদের ডাকা হয়, তাঁদের কাছে কখনো কেউ জানতে চায়নি যে তাঁদের শ্রাদ্ধব্যবস্থা তাঁদের কেমন লেগেছে! জানলে তাঁরা কি বলতেন? বলতেন, ছাদ্দো করেছ বটে! আজো আমরা বেয়াড়া অবস্থায় পড়লে বলি,—আমার শ্রাদ্ধ হচ্ছে! অর্থাৎ আমরা নিজেরাও শ্রাদ্ধকে শ্রদ্ধাহীন বলেই জানি। এবারে যদি কাউকে প্ল্যানচেটে ডাকি তবে তাঁকে প্লেন জিগ্যেস করব একথা। আমরা অবশ্য প্ল্যানচেটে কাউকে ডেকে ওখানকার খবর জানতে চাই। চাই স্কুপ নিউজ। ও'রা অবশ্য তা দেন না। মরে গিয়ে ও'রা যা জেনেছেন, বেঁচে থেকেই আমরা তা জেনে নেব,—এতো হতে পারে না। তার চেয়ে তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যাপার নিয়ে কথা বলাই ভাল। বা ভাল হয়তো নয়, এই শ্রাদ্ধ দেখে ও'দের মেজাজ হয়তো খিঁচড়ে থাকে, আমাদের আচরণ যে ও'দের ভাল লাগবে এমন নয়।

যা বলছিলাম, শ্রাদ্ধবাড়ির খাওয়া-দাওয়ার আসর দেখে বিয়েবাড়ি মনে হতেই পারে! কেবল কয়েকজন ন্যাড়ামাথা মানুষকে ঘুরতে দেখলে তখন খেয়াল হয় যে এটা বিয়েবাড়ি নয়। শ্রাদ্ধবাড়ির খাদ্য পরিবেশনও এখন ক্যাটারারের হাতে চলে যাচ্ছে। সেই এক ইউনিফর্ম,—বোধহয় শ্রাদ্ধের একটা আলাদা ইউনিফর্ম হবে, ইউনিক হবে তাহলে! যেমন চান, তেমনটি খাইয়ে দেবে। আমিষ চান, আমিষ। নিরামিষ চান, নিরামিষ। ট্রেনিংও দেওয়া হবে ওদের। বিয়েবাড়িতে যখন ওরা চেঁচিয়ে ডাকে, হাঁক দিয়ে বলে, মাছটা নিয়ে এস,—এই শ্রাদ্ধবাড়িতে ওরা চেঁচাবে না, নীচুগলায় বলবে সঙ্গীকে, ডালটা নিয়ে এস, আপনাকে একটু ডালনা দিই? এমনকি জামার হাতায় একটা কালো ফিতেও বেঁধে রাখতে পারে ওরা—যাতে বোঝা যায় যে এই শোক ওরা শেয়ার করছে। রান্নাঘরে যিনি তদারক করবেন, তিনি সেদিন চুলে তেল দেবেন না, একটা বিষণ্ণ হাসি ছড়িয়ে রাখবেন মুখে। তার মানে এ নয় যে উনি খাওয়াতে ভুলে যাবেন। খাওয়ানোটাই আসল। বিয়ে হোক, বা শ্রাদ্ধ হোক, খাবার আয়োজনের

মেরিট লিস্টই হল মানদণ্ড। কোফ্তা করুন বা কোর্মা করুন, দই দিন বা আইসক্রিম, লুচি বা রাধাবল্লভী, ফ্রায়েড রাইস বা চাট্টি সাদা ভাত,—এই খাওয়ার জন্যই আসা, খাওয়া হয়ে গেলেই চলে যাওয়া। যতক্ষণ না খেতে বসছি, ততক্ষণ কিছুই তো হল না। যেই খাওয়া হয়ে গেল, তখন আর কিছুই করার নেই। এখন ফিরে চল আপন ঘরে।

এই খাওয়ার রকমফের করার উপায় নেই। প্রতিবারেই ফের একইরকম ব্যবস্থা। যদি বলেন, শ্রাদ্ধে ওই কব্জি ডোবানো এলাহি ব্যাপার কেন, সবার হাতে একটি ছোট প্যাকেট তুলে দিলেই তো হয়, কোনো জবড়জং কিছু নাই বা করলুম,—কেউ শুনবে না। পুরোনো সং সাজতে রাজি সবাই, তবু নতুন কোনো জবর ভাবনা কেউ ভাবে না। নিমন্ত্রণপত্রেও তাই মূল কথাটি শেষে লেখা থাকে,—মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্যভোজনে অংশগ্রহণ করিবেন। ঐ 'অংশগ্রহণ' কথাটাই ভুল,—স্রেফ ইংরেজি থেকে টুকে মেরে দেবার চেষ্টা, বলা উচিত যোগ দেবেন,—তা না বলে 'অংশগ্রহণ করবেন।' যদি প্রশ্ন করি, কোন অংশটা গ্রহণ করব, তাহলে রাগারাগি হয়ে যাবে।

যদি বলি, শ্রাদ্ধে এত খাওয়া কেন, তাতেও বিক্ষুব্ধ হবেন সবাই। বেশ জমিয়ে না খেলে আমাদের সাধ পূর্ণ হয় না। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, সামনে মেনুকার্ড দেখে দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে সব আইটেম খেতে হবে। এক, দুই, তিন চার করে দশ, এগারো নম্বর পর্যন্ত তালিকা প্রস্তুত। এক এক করে তরিতরকারি, মাছ, মাংস, ঝোলঝাল, চপ, কালিয়া, অথবা ঘণ্ট—সমস্ত নির্ঘণ্ট ধরে খেয়ে যাওয়া। দশ নম্বরে আছে চাটনি। না, দশরকম চাটনি নয়, একরকমই, তবু তাই খেয়ে এতক্ষণের বেশি খাওয়াটার সামাল দিতে হয়। চাটনিটা একরকমের হলেও দশরকমের মতই বেশি করে পাতে নিতে হয় তাই।

এগারো নম্বরে আছে পান। না, এগারোরকম নয়,-এও একরকমই। সেই একটা পান মুখে পুরে ভাল করে চিবোতে চিবোতে ফিরি, যাতে খাওয়ার চাপে আমার না রাতে হার্টঅ্যাটাক হয়ে যায়। কারণ তাহলে সেই শ্রাদ্ধে তো আমার আর খাওয়া হবে না, ওটা আমারই শ্রাদ্ধ গড়াবে কিনা।

নিমন্ত্রণের বিবর্তন

দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন। প্রবীণ বলছিলেন, 'শোন, বিয়ে বাড়িতে শাকভাজা চাই। বাদাম দিয়ে ভাজা শাক প্রথম পাতে দিতেই হবে।'

নবীন বলল, 'আরে, ওসব আজকাল কেউ খায় না। শাকভাজা টাকভাজা এখন চলে না।'

প্রবীণ বললেন, 'তার মানে? শাকভাজা আমার বাবার বিয়েতে হয়েছিল, আমার বিয়েতেও হয়েছিল, এখনো হবে।'

নবীন হতাশভাবে বলল, 'কী আর বলব বলুন। এখন ফ্রায়েড রাইস, বিরিয়ানি, চিলি চিকেন এসবই চলছে। শাকভাজা, বেগুনভাজা এখন নেমন্তন্নের মেনুতে চলে না।'

এ'দের দুজনেই ঠিক বলছেন। একসময়ে শাকভাজা না হলে খাওয়া শুরুই হতো না। এখন ব্যুফে পার্টি চলছে। অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই আগের দিনের নেমন্তন্ন মানেই একটা রাজসূয় যজ্ঞ। রাত থাকতে কাউকে রওনা হতে হবে স্টেশনে। ভোরের প্রথম লোকালে আসছে মাছ। সেখানে মাছ কিনে নিয়ে এনে ফেলতে হবে বাড়িতে। রান্নার লোক হাজির। সবজির বাজারে ছুটেছে আর কেউ। সারা রাত হয়েছে মিষ্টির ভিয়েন। সে মিষ্টি চেখে চলেছে সবাই। এজন্য ভিয়েন বসাতে হল আবার। মাছভাজাও খেয়ে চলেছে সবাই। শেষে কম পড়ে যাবে নাকি? বাড়ির কর্তা ব্যস্ত এবং শংকিত। ময়রা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিল বোধহয়। লুচি বোধহয় কিছু কম পড়বে।

সন্ধ্যাবেলা বেজে উঠল সানাই। সেজে-গুজে আসছে যারা, তারা কোথায় বসবে, কোথায় দাঁড়াবে এটাই একটা সমস্যা। তবু কিন্তু কারো খারাপ লাগছে না। উৎসবের দিনে আমরা সকলে মনে মনে বৃহৎ হয়ে যাই। অন্যদিন যাই হোক, আজ আমরা সবাইকে নিয়ে আনন্দ করতে উৎসুক। খাবারের জায়গায় হাঁক উঠেছে, 'বেগুন ভাজাটা নিয়ে আয়', 'মাছটা আর একবার দেখাও'। নিজের বাড়িতে হলে বলি, 'আমায় আর একটু ডাল দাও', নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি 'আরে একে একটু মাংস দিয়ে

যাও'। বেশিরভাগ সময়েই খাবার জায়গার তুলনায় লোকের সংখ্যা হতো বেশি। সেজন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত খাবার জন্য। নিচে হয়তো সবাই অপেক্ষা করছে, সিঁড়ির মুখে এসে কেউ ঘোষণা করল, 'ছাদে জায়গা হয়েছে।' ব্যস, আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় প্রত্যেকে সিঁড়ি টপকে ছাদে এসে হাজির। স্বাভাবিকভাবেই সবার জায়গা হল না। তখন আবার ঘোষণা, 'আর জায়গা নেই, কেউ আর আসবেন না।' তবু দু'চারজন উঁকি মেরে দেখতে ছোটে, যদি কোনক্রমে কোথাও একটু জায়গা হয়ে যায়। তখন ছাদের মুখে দাঁড়িয়ে আবার একজন গর্জন করে ওঠেন, 'বলছি জায়গা নেই, তবু আসছেন কেন?' হায়, তবু নেমন্তন্ন খেতেই হবে। বাড়িতে যে রান্না হয়নি।

আমি কার ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়েছিলাম একটা পাতের উপরে. আমায় ঠ্যালা দিয়ে একজন সরিয়ে দিলেন, 'দেখছেন, ছেলের জন্য জায়গা রেখেছি, এটায় আসবেন না। 'ওরে চলে আয়, জুতো খোলার দরকার নেই।' ছেলে মসমস করে আরেকজনের পাতার ওপর দিয়ে হেঁটেই চলে এল। সে পাতে যিনি বসবেন তিনি জানতেই পারবেন না কী ঘটেছে। আমি অনেকদিন নেমন্তন্ন শেষ পর্যন্ত না খেয়েই চলে এসেছি, অত হুজ্জুত আমার পোষাত না। তবু ওই হৈ-হৈতে জমে যেত সব। খাওয়া দাওয়ার জায়গাটা এমন সরগরম হয়ে থাকত যে গলির মোড়ে দাঁড়িয়েও টের পাওয়া যেত একটা কিছু হচ্ছে।

আবার এই নেমন্তন্ন বাড়ির গোলমালের ফাঁকে ফাঁকে কোন একটা কোণে দাঁড়িয়ে অমুকদা তমুক মেয়েটিকে বলে, 'তোমাকে এই শাড়িটায় দারুণ লাগছে।' মেয়েটি অপরূপ ভঙ্গি করে, 'তোমার সব মিথ্যে কথা। তুমি ভারি ইয়ে—।' এই ইয়ের মানে কী না হতে পারে।

পাড়ার তন্বী মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল, সারা সন্ধ্যা পাড়ার যে ছেলেটি প্রাণপণ খেটে বিয়েটা তুলে দিল, তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মেয়ের বাবা-মা। শুধু মেয়েটি খুশি হয়নি। ছেলেটির ভীরুতা দেখে সে লুকিয়ে কেঁদেছিল। বিয়ে চুকে গেলে ছেলেটি কিছু না খেয়েই ফিরে গেল তার বাড়িতে। নেমন্তন্ন খেতে তখনো কিছু লোক বাকি আছে।

আশ্চর্য ছিল সেই নেমন্তন্ন বাড়ি। হৈ-চৈ, চিৎকার, হাসি, চোরা কান্না সব মিলিয়ে আশ্চর্য নাটকীয় ছিল সেসব। একটা নেমন্তন্ন পেলে ছোটরা অপেক্ষা করত ভালমন্দ খাবারের উল্লাসে। কাজের চাপে যখন সবাই উৎকণ্ঠিত, তার মধ্যেই বাড়ির কখন কারা আড়াল বুঝে সবার চোখ এড়িয়ে ঘনিষ্ট হচ্ছে, গড়ে উঠছে হৃদয় বিনিময়ের সম্ভাবনা, হয়তো কেবল সম্ভাবনাই নয়, তবু নেমন্তন্ন বাড়ির এও ছিল একটা অঙ্গ। পরিচিত মেয়ের বিয়েতে

গিয়েই প্যাণ্ডেলে বসেই শুনেছি কারো কাছে দু'বছর আগে নববর্ষের প্রভাত ফেরীতে মেয়েটি তাকে কী বলেছিল। আজ যে কনে, সেই একদিন এককোণে দাঁড়িয়ে কার অপেক্ষা করেছে।

বিয়ে মানেই অফিস থেকে লোন। বি-এ'র পরে এম-এ পড়া, বিয়ের পরে প্রেমে পড়া। অবশ্য উল্টোটাও হয়। প্রেমের পরেও বিয়ে হয়। সে যাই হোক, ধার না করে বিয়ের ধারেও আসা যায় না। তার পরে সেই ধার রেকারিং ডেসিমেলের মত ধারাবাহিক হয়ে দাঁড়ায়। আমার এক বন্ধু বিয়ের কয়েকবছর পরে বলেছিল, 'ভাই, বউ পুরনো হয়ে গেল, ধার তো পুরোনো হল না।'
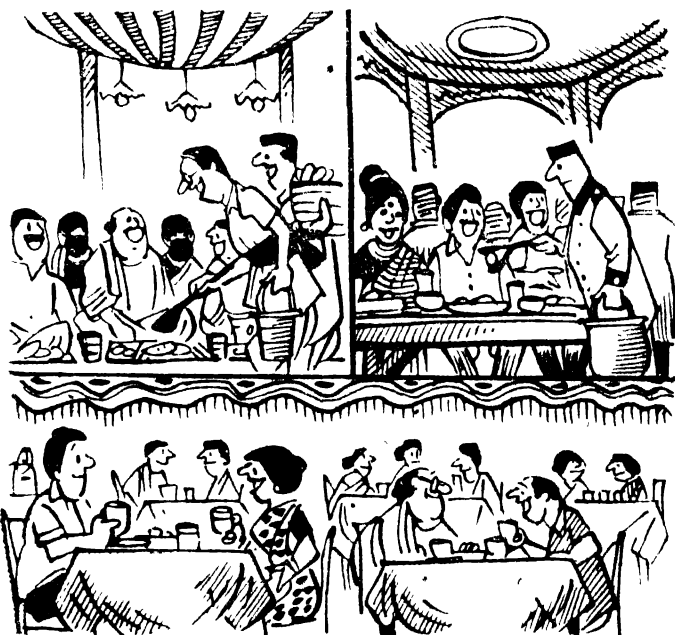
এখন কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ির চেহারাটা বদলে গিয়েছে। ছেলেমেয়েরা এখন জন্মেই জয়েন্ট এণ্ট্রান্সের জন্য তৈরি হয়, তাদের ভোরের লোকাল ট্রেন থেকে মাছ কিনে আনার সময় নেই। রাত জেগে ভিয়েন না বসিয়ে তারা ভিয়েনা যাবার জন্য রাত জেগে পড়ে। সকলেরই এখন বিস্তর কাজ আছে। নেমন্তন্ন বাড়িতে এসে হৈ-হৈ এখন আর কেউ করে না। পরিবেশন করার আর্ট কেউ আর শেখে না। কীভাবে মাছের স্টক বাঁচিয়ে রাখতে হয়, ঢালাও মিষ্টি দেবার হাঁক দিয়েও কোন ইসারায় মিষ্টি খাওয়ার স্টিম নিবিয়ে দেওয়া যায়—

এসব কৌশল যাদের হাতে শিল্পকলা হয়ে উঠত, তারা সব গত প্রজন্মের মানুষ।

এখনকার বিয়ে বাড়িতে গিয়ে হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটারের কথা মনে হবে। শাদা অ্যাপ্রনের মত জামা পরে অনেকটা কমাণ্ডো বাহিনীর মত কঠিন এবং নিষ্প্রাণ মুখে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওরা যে অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে এসেছে তা হল অপারেশন কেটারিং। নিভুল অথচ নির্বিকার মুখে ওরা প্লেটে তুলে দেবে কাশ্মীরি আলুরদম, রাশিয়ান স্যালাড। চটপট সবাইকে খাইয়ে ঝটপট চলে যাবে তারা। যাঁরা এখানে খেতে আসেন, তাঁরাও খুবই সুশৃংখলভাবে লাইন বেঁধে এগোন, যেন আইন মেনে সাইবেরিয়ায় চলেছে বিষণ্ণ জনতা। তাড়াতাড়ি খাওয়া। সেরে হাওয়া হয়ে যেতে হবে। একফাঁকে লাইনে দাঁড়িয়ে নতুন বৌকে উপহারও দিয়ে আসা হয়ে গিয়েছে প্রথম সুযোগেই। পরের যোগাযোগেই খাওয়া এইটুকুই চাওয়া এখানে। মানুষের সঙ্গে মেলা নয়, মেশা তো নয়ই, মেলামেশা তো অকল্পনীয়। খাবার মেনুও বদলেছে—সর্বত্র সেই ভয়াবহ ফ্রায়েড রাইস, রবারের মতো মাংস, গলে-যাওয়া আইসক্রিম। খেতে দেওয়া, প্লেট ধোয়া সবই এখন প্রফেশনালদের হাতে। কোমরে গামছা বাঁধা কেউ নেই, যাকে আকুল হয়ে গিন্নী কর্তা ডাকছেন। যাঁরা আসেন তাঁরা একটু অফিস টক্ করেন। তারপরেই টুক করে সরে পড়েন। সব সংক্ষেপ হচ্ছে। হৈ-হৈ-এর সময় এখন নয়। বোধহয় এ জন্মেই নয়। তা নিয়ে কারো আক্ষেপ নেই। সকলেই ব্যস্ত। স্বামীর ট্যুর, ছেলের এক্জামস, মেয়ের মিউজিক লেসনস্। কোন ফালতু ব্যাপারে কারো নজর নেই। প্রেমেও পড়ে না কেউ। বিয়ে না করলে নয়, তাই হয় এখনো। অনেকে তো নেমন্তন্নে যেতেও পারেন না। এ পাড়া থেকে ও-পাড়া, এক ভাই থেকে আর এক ভাই—গ্রিটিংস টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দায় সারেন। যাঁরা আপিসের দৌলতে ওয়েডিং পার্টিতে যান, সেখানে তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকে চাপা হাসি, মাপা কথা, অফিস জোক্স এবং খাবারের মধ্যে স্মেল অব এভরিথিং।

আরো কিছুকাল পরে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে এসবও উঠে যাবে। শুরু হবে নতুন রেওয়াজ। হয়তো এ আমার উইশফুল থিংকিং—চিরকাল fool হয়েই রইলাম, না হয় এই বিউটিফুল স্বপ্নটাই দেখি। দিন আরো কঠোর হবে, প্রথা বদলাতে হবেই। প্রথা কোন নীতি নয়, সে রীতি মাত্র। রাতা-রাতি না হলেও সেও এক যুগ থেকে আরেক যুগে বিবর্তিত হয়।

তখন কবজি ডুবিয়ে খাওয়া উঠে যাবে। শুরু হবে টি-পার্টি। জলখাবার। আয়োজনের মধ্যে থাকবে আপ্যায়ন, বিসর্জন নয়। সে

পার্টি দেওয়া হবে বিয়ের দুই পক্ষের তরফ থেকে একসঙ্গে। একই বিয়েতে দু'বার মরণাপন্ন আয়োজন কোন কাজের কথা নয়। উপহার দেবার আতঙ্ক থাকবে না। শুধু ফুল নিয়ে আসবে সবাই। খাবারের মেনু হবে সুমিত, সুস্বাদু। আনন্দের অবকাশ বাড়বে। ফুর্তি হবে স্বতঃস্ফূর্ত। সবাই এই সুযোগে জীবনকে ভালোবাসতে শিখবে। জীবন শুধু দাঁতে দাঁত দিয়ে ছিনিয়ে নেবার বস্তু নয়, এও ছেড়ে ছেড়ে দেখবার জিনিস।

এরই ফাঁকে ফাঁকে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় শুরু হবে সেই পুরনো সংলাপ। ছেলেটি বলবে, 'তোমাকে নতুন বউয়ের চেয়েও সুন্দর লাগছে।' মেয়েটি লজ্জা পেলেও খুশি হবে। এত বড় কথাটা বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, আবার অবিশ্বাস করার মতো জোরও নেই তার বুকে। আশায়, আশংকায় কাঁপতে কাঁপতে সে হাসবে, বলবে 'তুমি বানিয়ে বলছ এসব। তুমি ভারি ইয়ে—।'

বাজার করার হাজার সাজা

যতই ব্যাজার হই না কেন, বাজার করতেই হয়। রোজ রোজগার করলেই চলবে এইরকম ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখছি সেই রোজগার দিয়ে সংসারের উপকারও করতে হবে। পয়লা উপকার হল ভালো বাজার করা। অনেকে আছে যারা বাজারে যেতে আনন্দ পায়। প্রতিটা জিনিসই তারা ভাল দর করতে পারে, বাড়িতে তাদের খুব আদর। অবলীলাক্রমে তারা দাম কমায়। এ বিষয়ে একটা গল্প মনে পড়ছে। একজনকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যা দাম চাইবে তার অর্ধেক বলবি। সেও সেইমত দোকানে ঢুকে বলেছে, 'কত দাম?' দোকানী বলেছে, 'বারো টাকা।' লোকটি অনায়াসে বলেছে, 'ছ টাকায় দেবে?' দোকানী তো উড়িয়ে দিয়েছে প্রথমে কথাটা, তার পর যখন দেখছে যে লোকটি রাজি হয়নি, তখন বলেছে 'আচ্ছা, বউনির সময়, দিন ছ টাকাই দিন।' লোকটি তৎক্ষণাৎ বলেছে, 'ছটাকা' না, তিনটাকা দেব।' দোকানী এবারে অবাক—

'সে কি ? এই বললেন ছটাকা ?' লোকটি বলল—'না, তিন টাকার বেশি দেব না।' দোকানী খুব রেগে গেলেও বলল—'তাই দিন. বউনির সময়ে আর ঝামেলা করব না।' লোকটি এবারে তার থিওরি অনুযায়ী আবার আর একটা দর দিয়েছে, 'দেড়টাকা।'

শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল আমি জানিনা। তবে এইভাবে চললে হয়তো দোকানিকেই কিছু দিতে হয়ে থাকতে পারে।

আমি নিজে যতবার বাজার করতে গিয়েছি, ততবারই গোলমাল হয়েছে। হয় দাম বেশি নিয়েছে, নয় জিনিস কম দিয়েছে, অথবা খারাপ মাল গছিয়েছে। জীবনে প্রথম যে মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলাম, একদিন দেখলাম সে তার জামাইবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার জামাইবাবু শুধু যে ভাল বাজার করেন তাই নয়, সকালে বিকেলে কি জলখাবার হতে পারে, সেই ভেবে জিনিস কিনে আনেন। হয়তো বেড়াতে বেড়িয়েছেন, এক ফাঁকে গিয়ে দুটো পাঁউরুটি কিনে নিলেন, বিজয় গর্বে হাসলেন, 'কাল সকালে লাগবে।' দেখে শুনে আমি সরে পড়লাম। এ মেয়েকে বিয়ে করলে আমাকে আসলে বাজার সরকার হয়ে যেতে হবে। দেখা যাচ্ছে বাজার করতে পারার ওপরেই নির্ভর করছে আপনার বাজার কেমন হবে বৌয়ের কাছে।

অনেকে দেখেছি বার বার বাজারে যাচ্ছে। টিপেটুপে দেখছে আলু, বেগুন, মাছ। আমি চেষ্টা করে দেখেছি, কিছুই বুঝতে পারিনি। শেষে বাজারের লোকেরাও আমাকে চিনে গেল। আমি গেলেই দেখেছি হৈ হৈ লেগে যায়। সকলেই টানাটানি করে আমাকে নিয়ে—'এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।' প্রথমে ভেবেছিলাম ওরা সবাই আমাকে বোধহয় ভালবেসে ডাকছে। হয়তো আমার ব্যবহারে ওরা প্রীত। তাই ক্রেতা হিসেবে চায় আমায়। পরে বুঝলাম যে ওরা আমাকে গবেট ঠাউরেছে। জানে একেই ঝড়তি পড়তি মাল যা খুশি কম দামে চালানো যায়। যদি বলি 'ওহে ভাল না হলে মুশকিল হবে' সঙ্গে সঙ্গে বলবে, 'নিয়ে আসবেন. দাম ফেরৎ।' আমি এখন ওই করি আর কি, একবার কিনি. আরেকবার ফেরৎ দিই। যা কিনব তাতেই কি মশাই গোলমাল হবে ? বেগুনওলাকে বললাম, 'দেখেশুনে দিও বাবু. পোকাটোকা না হয়। কানা বেগুন নিয়ে গেলে আমারই চোখ কানা করে দেবে।' সে একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল, 'বলেন কি ? আপনাকে খারাপ দেব ?' বুঝুন, যেন আর সবাইকে খারাপ দেওয়া যায়, আমাকে দিলেই ওর পাপ হবে! আমাকে হাত দিতেই দিল না, বলল, আমি নিজে দেখে দিচ্ছি। দিলও খুব দেখে শুনে। প্রথমে দুটো তুলল. একটা রেখে দিল। আর একটা তুলল, এবারে আগেরটা রাখল। তারপরে আরো

দুটো নতুন তুলল। ঘুরিয়ে দেখল দুটোকে। আবার একটা রেখে আরেকটা তুলল। দাঁড়িপাল্লার চড়াতে গিয়েও একটাকে নামিয়ে রাখল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। লোকটির ড্রামা-সেন্স খুব প্রখর। ঠিক দাঁড়িপাল্লার ক্লাইম্যাক্সের সময়ে সিচুয়েশন বদলে দিয়ে এক্সপ্রেশন বাড়িয়ে দেওয়ার কৌশলটা ও জানে। এই কৌশলের কলায় ওর সিদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ আমায় কলা দেখাতে পেরেছে। বাড়ি এসে দেখলাম ওর মধ্যে একটা বেগুন পোকায় ধরা। সে কথা বলতে গেলাম। তখন ও বলল হতেই পারে না, আমি অত দেখে দিলাম। আমি বললাম, 'ভাই, বউ বলেছে বদলে আনতে।' লোকটা তখন আমার মনের কথাই বলল, 'তার চেয়ে আপনি বউ বদলে নিন।'

মাছের দোকানে গিয়ে বলেছি—'কত দাম?' একগাল হেসে লোকটি বলেছে, 'শুধু আপনার জন্য সত্তর। নইলে আশিতে দিচ্ছি, এই শুনেই সত্তর আসি বলা উচিত ছিল, বলিনি। ওই আপনার জন্য শুনেই গলে গেছি। মনে হয়েছিল একবার আমি তো ওর বাপের গুরুঠাকুর নই, আমার জন্য ও কেন কমাবে? আরো বলেছে, 'আপনাকে আমি দেখে দিচ্ছি। মা মাছ চেনে, আপনি তো চেনেন না।' মা মানে আমার বউ। যাক এও আমায় চিনে ফেলেছে। এখন যা দেবে হাসিমুখে নিয়ে যেতে হবে। জানি নিয়ে গেলেই বউ বলবে, 'এতো সবটাই পেটি দিয়ে দিয়েছে। গাদা দেখে আনতে পারোনি? জান ছেলেরা গাদা ছাড়া খায় না।' চুপ করে রইলাম, গাদা গাদা নানা কথা শুনতে হল। লোকটা কিন্তু বলেছিল 'গাদাই দেব আপনাকে।' গাদা বলেছিল, না গাধা বলেছিল, এখন মনে করতে পারছি না।

বাজার করার আর একটা মুশকিল হল, আইটেম ঠিক করা। কি কি কিনব? যা-ই নিয়ে যাই, শুনি ঠিক হয়নি। সব নিয়েছি, তবু একফালি কুমড়ো কেন কিনিনি, এই নিয়ে কথা শুনিয়ে আমাকে ফালা ফালা করে দিয়েছে বউ। ছোট মাছ নিয়ে গেলে বলেছে এত ছোট মাছের কাঁটা বাছবে কে? বড় মাছ আনলে শুনেছি, এত বড় মাছ কাটবে কে? মনে হয় বলি, মাছ নয়, আমাকেই কাটো, ল্যাঠা চুকে যাক। আসলে আমাকে তো এক কোপে কাটবে না, সারাজীবন ধরে কোপাবে।

যেদিন কুমড়ো এনেছি, সেদিন বউ বলেছে, 'দুটো ডাঁটা আনতে পারো না?' আমি বলেছি, 'তুমি লিখে দিও কি কি আনতে হবে, আমি মিলিয়ে মিলিয়ে নিয়ে আসব।' তার জবাবে ভুরু কুঁচকে বলেছে বউ, 'লিখে দেব কি আবার? নিজে বুদ্ধি করে আনতে পারো না?' আরে, বুদ্ধি-ই যদি

থাকবে, তবে কি আর বিয়ে করি আমি ? সে কথা বলে লাভ নেই। বউ আমাকে বোঝায়, কি আনলে সঙ্গে কি আনতে হবে। বোঝা গেল এবারে আমায় রান্নাটাও শিখতে হচ্ছে। নইলে জানব কি করে কিসে কি লাগে ? আর কি জন্য কি বাজার করতে হয় ? বুঝুন, শুধু রোজগার করলেই হবে না—এমনিতেই তো আমার রোজগারের পরিমাণ বউয়ের পছন্দ হয়নি—তার ওপরে রান্নাও জানতে হবে। বাজারের সময় ভেবে নিতে হবে কি কি রাঁধা হবে বাড়িতে।

এজন্য আমার আনা বাজার রোজই ভুল হয়। প্রায়ই আমাকে দ্বিতীয়বার

ছুটতে হয় বাজারে। ঐ দ্বিতীয়বারেই যা ঠিকঠাক কেনাকাটা হয়। এক এক সময়ে ভাবি গোড়াতেই যদি ঐ দ্বিতীয়বারের বাজারটা করে ফেলা যেত, অথবা প্রথমবারে না গিয়ে যদি দ্বিতীয়বারেই যেতাম প্রথমে, তবে কেমন হতো।

কোন কোনদিন আমার সঙ্গে বউও বাজারে যায়। ভুল বললাম, বউয়ের সঙ্গে আমি বাজারে যাই। বউকে অনেকে দেখলাম খাতির করে, আমি সেই খ্যাতির বিড়ম্বনায় ভুগি। আমাকে কেউ ফিরেও দেখে না, মনে করে বউয়ের কাজের লোক বুঝি। হাতের ব্যাগ টেনে নিয়ে ভরে দেয় আলু পটল—

বউকে বলে পয়সা দিতে হবে না আজ, খেয়ে দাম দেবেনে। আমার বউ বিজয়গর্বে হাসে। বলে, দেখো, দেখে শেখো। আমি আর কি বলব -- মেয়েদের জোর এখনো চলে সে তো জানা কথাই। আমি বড় জোর একটি চাষী মেয়ের কাছ থেকে শাক আর কুমড়ো কিনি। মেয়েটি হাসে আর হেসে হেসে জিনিস তুলে দেয় ঝুলিতে। তাই হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরি। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, কুমড়োটা নেই। অথচ কমড়ো আমি কিনেছিলাম। পড়ে গেল নাকি? নাকি দেয়ইনি মোটে? বউ বলল, 'নিশ্চয় মেয়েদের দিকে তাকিয়েছিলে, কুমড়োটা নিতেই ভুলে গিয়েছ। মেয়ে দেখলে তো ভুলেই যাও যে তোমার বিয়ে হয়েছে।' আমি বললাম 'ঠিক উল্টো। তখন আমার বেশি করে মনে পড়ে যে আমার বিয়ে হয়েছে।'

বাজার করে কোনদিনই বউকে খুশি করতে পারিনি। হয় ঠিক জিনিস কেনা হয়নি, নয়তো ঠিক দামে কিনিনি। তবু ছাড়ান নেই। বাজারে আমাকেই যেতে হবে। আমার এক বন্ধু অনেকদিন আগে শিখিয়েছিল, বাজারে যেতে বললে খারাপ জিনিস আনবি। দেখবি তোকে আর বাজার যেতে বলবে না। আমাকে চেষ্টা করতে হয়নি। আমি এমনিতেই খারাপ বাজার করে থাকি। কিন্তু আমার বাজার যাওয়া বন্ধ হয়নি। রোজ আমাকেই যেতে হয়। কখনো দুবার, কখনো তিনবার যেতে হয়। দুবার সকালে, একবার বিকেলে। সকালে আজকের খাওয়ার জোগাড়, বিকেলে যেতে হয় পরেরদিন সকালের ব্রেকফাস্টের জন্য। এছাড়া আছে মাসকাবারি বাজার, আছে কেরাসিন তেল, সরষের তেল, গ্যাসের দোকান। এসবই করতে হয়, কোনটাই ঠিক হয় না। মনে মনে ভাবি কোনদিন কি দোকান বাজার করে বউকে খুশি করতে পারব? ছেলেবেলায় স্কুলে না গিয়ে বাজার যাওয়াই উচিত ছিল। বউ এমনিতেই বলে কিছুই জানো না দেখছি। কত জনকে দেখেছি বাজার করে নাম করে ফেলেছে। তারা না হলে বাড়ির কোন উৎসবের বাজারই হয় না।

যদি হঠাৎ কোনদিন আমার বাজার দেখে বউ বলে, 'আজ ঠিক আছে, তখন বলে ফেলি, দেখেছ তো কেমন বাজার করি!' বউ বলে 'তুমি কি আর করো, আমিই তো তোমায় শেখালাম। এত বকুনি না দিলে কি আর শিখতে তুমি?'

মাটন এবং চিকেন

ভেড়া এবং মুরগিও বলা যেত, কিন্তু এখন ইংলিশ মিডিয়ামের যুগ। ইলিশকে যেমন ইংলিশ মিডিয়ামে হিল্সা বলা হয়, ভেড়া আর মুরগিকেও আমরা মাটন আর চিকেন বলি। মাটন না বললে ভেড়ার মাংস জাতে ওঠে না, মুরগিকে আমরা বাংলাতেও আদর করে ইংরেজি নামে চিকেন বলে ডাকি। এতে বেশ লাগে—শুধু খেতে নয়, বলতেও আরাম। যেমন কুকুরের নাম আজকাল আর কেউ বাঘা বা ভেলি রাখে না, ডাকে রোজি বা মিকি ব'লে—তেমনি মাটন আর চিকেন বললেই মনে হয় ফরেন ঘুরে এলাম। তাই মুরগি আর ভেড়া না বলে চিকেন আর মাটনই বলি, কেমন?

মাংসের নাম ইংরেজিতে বললেও মাংস আমরা বহুদিন ধরেই খাচ্ছি। পুরাণের পুরোনো দিনেও মাংস চলত। বড় বড় সাধুরা রীতিমত মাংস খেয়ে তপস্যায় বসতেন, আবার মাংস খেয়ে তপস্যা ভঙ্গ করতেন। রাজশেখর বসু তাঁর একটি গল্পে দেখিয়েছেন যে বালির তপস্যা বন্ধ করার জন্য নারদ যে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাতে কেবল অপ্সরাই নেই, সেই সঙ্গে রয়েছে একশত বন্যকুক্কুট নিয়ে যাবার নির্দেশ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য যে সুষম খাদ্য প্রেসক্রাইব করেছিলেন তাতে বলেছিলেন :

> কত কাল রবে বল ভারত রে
> শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে
> দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন
> ধরো হুইস্কি সোডা আর মুরগি মটন।

তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন মুরগি আর মটন আমাদের খেতে হবেই। অথচ এককালে মুরগি খেলে আমাদের জাত যেত, এখন মুরগি না খাওয়ালে আমাদের মান যায়। আগে আমরা কালেভদ্রে নেমন্তন্ন বাড়িতে পাঁঠার মাংস খেতে পেতাম। এখন জমানা বদল গয়া, নিজেদের বাড়িতেই প্রায়ই মাংস রান্না হচ্ছে। আগে আমাদের খাবার ছিল, ডায়েট ছিল না, এখন আমরা শুধু খাই তা-ই নয়, ক্যালোরি মিলিয়ে ফুডের যোগান দিই শরীরে।

প্রোটিনটা জরুরী তাই নিয়মিত মাংস ভক্ষণ প্রয়োজন—কেউ প্রতিদিন, কেউ প্রতি সপ্তাহে।

মুশকিল হচ্ছে আমাদের এই যে প্রোটিন খাবার আয়োজন তা মার খেয়ে যাচ্ছে দাম বাড়ার জন্য। মাংস কিনতে গিয়ে দাম শুনে মনে হয় এর চেয়ে গায়ের মাংস খুলে দিই বরং। মানুষের মধ্যে যার বুদ্ধি নেই, যার কিছু হবে না, তাকে আমরা পাঁঠা বলি, অথচ সেই পাঁঠাই এখন দুর্মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মধ্যে যে পাঁঠা, তার বড়ই অবহেলা, অথচ জন্তুর মধ্যে যে পাঁঠা তার দাম মেলাই। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে দামটা। অগত্যা মানুষ ঝুঁকেছে চিকেন এবং মাটনে। সঙ্গে সঙ্গে এদের দামও হচ্ছে আকাশছোঁয়া Sky is the limit—মাটন তো এরই মধ্যে ষাটে পেঁছেছে, দাম শুনেই হিক্কা উঠে যায়—ষাট ষাট বলে জল খেয়ে ছুটি চিকেনের দিকে, তাওতো তিরিশ পেরিয়ে গিয়েছে, সেটাও পালক সুদ্ধু, এও চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে।

চিকেন বা মাটন কিনতে গেলে অর্থ লাগছে প্রচুর, তাছাড়া এরা আমাদের জীবনের অর্থও পাল্টে দিয়েছে। মাটন মানে ভেড়া, মুরগি মানে একটি সহজে বধযোগ্য প্রাণী। তেমন বোকাসোকা, ঠকতে প্রস্তুত কাউকে দেখলে আমরা বলেই থাকি যে একটা মুরগি পাওয়া গেছে, আর বিয়ের পরে তো অনেককেই আমরা ভেড়া বনে যেতে দেখলাম। ভেড়া বনবার জন্য কামাখ্যা যাবার দরকার নেই, বিয়ের মধ্যেই সে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

মানুষের কথা থাক, সোজাসুজি চিকেন নিয়ে কথা হোক। বাইরে কোথাও দুদিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে লোকে ট্রেন থেকে নেমেই যেটির খোঁজ করে, সেটি হল চিকেন। এখানে কি মুরগি পাওয়া যায়? কোথায়? দাম কি সস্তা? স্বাদ কেমন? সুপুষ্ট মুরগি? সাঁওতাল পরগণায় গেলে আমরা যে সাঁওতালের খোঁজ করি অবধারিত ভাবে, তার কারণ সে মুরগি বেচতে আসে। এই মুরগির জন্য লালা ঝরে যায় মুখে। পিকনিকের লিস্ট বানাতে বসে প্রথমেই লিখি মুরগি। একটা মুরগির মোটে দুটো ঠ্যাং এটা দুঃখের কথা বটেই। এর মধ্যে যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় যে মাংস খেলেও মুরগি খায়না, তবে তার ঠ্যাং দুটো নিয়ে টানাটানি করি। তার ঠ্যাং মানে তার পাওনা মুরগির ঠ্যাং বুঝতে হবে। সে দুটোর ভাগ নেয় অন্য কেউ।

যদ্দুর মনে পড়ছে শরৎচন্দ্রের সতীশও মুরগি খাওয়াটা অনাচার হিসেবেই দেখত। শরৎবাবু যা কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করতেন তা হল লুচি আর রসগোল্লা। আজকের দিন হলে তাঁকে মুরগি রাঁধাতেই হতো, তবে তাতে

তাঁর জাত যেত না। এখন তো ছুটির দিন হলেই চিকেন বা মাটন কিনতে বাজারে যেতে হয় আমাদের। কী করে যে যাই সে আমরাই জানি।

সেদিন আর কিছু কেনার তাকত থাকেনা আমাদের ট্যাঁকে। বাবা নিয়মিত নিরামিষ খান, তাঁর জন্য কিছু শাক সব্জি, মানে যাকে বলে ভেজিটেবলস আনতে হয়। সেগুলো আগের দিনই এনে রাখা গেছে। পরেরদিন শুধু মাটন বা চিকেন। নয়তো বিকেলে ছেলেমেয়েরা বলবে—হোটেলে চলো। সেখানে গিয়েই খাব। মাটন সেখানে একপ্লেট প'চিশের ওপরে—আপনাকে টুকরো করে কেটে ওরা কয়েক টুকরো মাংস খায়। সারা-জীবন বৌয়ের খিদমত করে আপনার রক্তে ঘুণ ধরেছে, ডাক্তার বলেছে Red Meat খাবেন না। এসব না জেনেই আপনি যে এতকাল কি করে বেঁচে ছিলেন এটাই আশ্চর্যের। একমাত্র পাখির মাংস খেতে পারেন। পাখি মানে রামপাখি। রাম কি এই পাখি খেতেন? রামায়ণটা না পড়া পর্যন্ত বলতে পারছি না। আপাতত মাংসের দোকানে যাই চলুন। কী ভিড় দোকানে। সবাই উর্ধ্বমুখ এবং উর্ধ্ববাহু হয়ে দেখাচ্ছে, ওইটা, ওইটা আমি। ওইরকম ঝুলে আছি সংসারে, ওইরকম ভেড়াই বটে।

ভেড়ার মাংসের দাম বাড়ছে চড়চড় করে Neck and Neck রেস দিচ্ছে পাঁঠা আর ভেড়া। তাই চলছে মুরগি ওরফে চিকেন। সেও আর কতদিন পিছিয়ে থাকবে, কে জানে! এখনো চিকেনের দাম তুলনায় কম, যদিও সস্তা নয় মোটেই, তাছাড়া এক কেজি চিকেন কিনলে বেছে বুছে দাঁড়াবে সাতশো গ্রাম। গ্রাম থেকে শহরে যাঁরা নিয়ে আসে, তারা শুধু দামেই নয়, ওজনেও এইভাবে রোজগার করে। উপায় নেই, এইটাই রীতি। ব্রয়লার নেবেন? তার দাম বয়লারে আগুন দেবার মত—বেড়েই যাচ্ছে। তবে ডাক্তাররা বলেন মুরগিতে নাকি মাটনের চেয়ে প্রোটিন বেশি, ফ্যাট কম। প্রোটিন পাচ্ছেন, ডায়াবিটিসের চান্স কমছে, তাহলে কি মুরগিটাই প্রেফার করবেন?

অবশ্য মুরগিটা আপনার বাড়িতেও সবার বোধহয় বেশি পছন্দ। ছেলের বা মেয়ের জন্মদিনে তাই মুরগিটাই আসে। কী রান্না হবে - চিলি চিকেন না চিকেন কারি। সেটা ওরাই ঠিক করবে। অসুখ বিসুখ হলে সেরে ওঠার জন্য যে পথ্যি চায় ওরা তার মধ্যে আছে চিকেন স্টু। এ পথ্যিটা অবশ্য বড়ই নিরীহ, রগরগে নয়, তবু চিকেন তো! ওই নামেই এর সুনাম। বাজারে আজকাল চিকেন কিউবও বেরিয়েছে। ফেলে দিন জলে,-তুলে দিন মুখে। সোয়াদ যেমন, স্বাস্থ্যও তেমন। কিনুন আর খান। অথবা খাওয়ান। আপনার অত দামী জিনিস খাবার দরকার নেই। ছেলেমেয়েকে খাওয়ান। নিজের ছেলেবেলা কেটেছে বার্লি খেয়ে, তাই এখনো চিঁ চিঁ করছেন -ওরা খাক এসব, যাতে ওরা আপনাকে ছি ছি না করে।

জানি আপনাকে এসব বলা মানে আপনাকে কষ্ট দেওয়া। কী করে, কেমন করে যে এসব আনছেন কিনে সে কি আর আমি জানিনা? কোত্থেকে যে টাকার জোগাড় করেছেন সে রহস্য আপনি নিজেও ভেদ করতে পারবেন না। আপনি যে বেঁচে আছেন তাই কি প্রমাণ করতে পারবেন? খুব কঠিন। আপনার যা রোজগার, যত বড় আপনার পরিবার, যা দাম বাজারে—এসব সারকামসট্যানসিয়াল এভিডেন্স দেখালে আপনি বেঁচে আছেন এটা প্রমাণ করা টেকনিক্যালি অসম্ভব। অবশ্য মিরাকল তো ঘটে, তবে মিরাকল বোধহয় হয় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়।
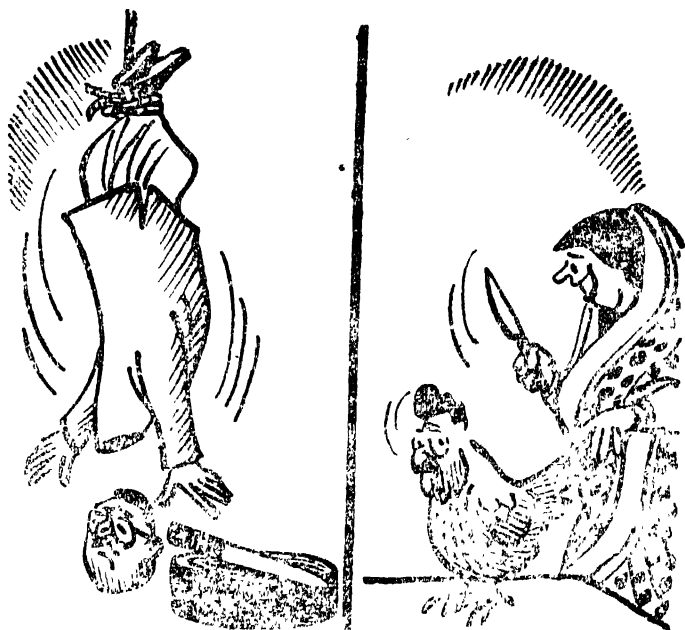
যাই হোক, ওসব তর্ক থাক। ধরে নিচ্ছি আপনি ধার করে, চুরি করে, জোচ্চুরি করে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন সংসারে। অন্য কোথাও ধরা পড়েননি, তবে চোরের মত হয়ে আছেন বৌয়ের কাছে। সে যে আপনাকে পুলিশে দেয়নি কেন তা কে জানে, আসলে বৌ-ই তো আপনার জেলার। ভেবেছিলেন আপনি তার Boss, এখন জেনেছেন আপনি তার বশ। বৌ আপনাকে শোষণ করেই ছেলেদের মাংস খাওয়াচ্ছে।

মাটন চপটা উপাদেয়, চিকেন কাটলেটও সুস্বাদু। একটা খেলে পেটও ভরে না, মনও ভরে না। দুটোই চাই। চিরকুমার সভা নাটকে একজন বলেছিল, মুরগিই ভালো, কাটলেট কি বলেন? অন্যজন বলেছিল, মাটনটাই

বা মন্দ কি ভাই, চপ ? তখন সমাধান দিয়েছিল অক্ষয়—দুইই হবে, দোমনা করে খেয়ে সুখ হয়না।

কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তকে দোমনা করেই খেতে হচ্ছে। দুটোরই যা দাম। শাস্ত্রমতে শক্তিসঞ্চয়ের জন্যই এই মাংস ভক্ষণ কিন্তু পকেটে টান পড়ছে আর ভেতরে ভেতরে টানটান হয়ে আছেন, কখন বৌ বলবে, চিকেন বা মাটন একটা আনো, ছেলেরা খাবে কি ?

খেতে বসে আপনার চোখে আর জিভে জল আসবে, তবু জ্বলজ্বল করে দেখবেন যে সিংহ ভাগটা ওরাই নিয়েছে। এতদিনে নিশ্চয় বুঝেছেন যে সংসারে আপনিই সেই ভেড়া যাকে বৌ মুরগি হিসেবে জবাই করে থাকে।'

ডাক্তার কখন দরকার

বন্ধুবর প্রশান্ত খুব শান্তকণ্ঠে একটা মজার ঘটনা শোনাচ্ছিল। একটি মেয়ের ঠোঁট ফেটেছে ঠাণ্ডায়। এমন ফেটেছে যে, মুখ ফাঁক করলেই রক্ত ঝরছে, ব্যথা করছে খুব। এই অবস্থায় তাকে একজন হাসির গল্প শুনিয়েছে। ঠোঁট চেপে রেখেও শেষ পর্যন্ত মেয়েটি আর পারেনি, তাকে হাসতে হয়েছে। কিন্তু হাসতে গিয়েই ঠোঁটে এমন জ্বালা করে উঠেছে যে, সে কেঁদে উঠেছে। তার মা তাকে জিগ্যেস করল, 'কাঁদছিস কেন ?' মেয়েটি বলল, 'হাসাচ্ছে যে।'

হাসতে গিয়ে মেয়েটিকে কাঁদতে হয়েছিল, মজার লেখা লিখতে গিয়ে এক লেখকের কি হয়েছিল, তাও যথেষ্ট করুণ। একটি গল্পে পড়েছিলাম যে, একজন বিখ্যাত লেখক বাড়িতে অসুস্থ মেয়ের পরিচর্যা করছেন, খাণ্ডারনী বৌয়ের মোকাবিলা করছেন আর নিজের প্রচণ্ড মাথা ধরার জন্য ওষুধ খাচ্ছেন। ঐ অবস্থাতেই হাসির গল্প ভাবতে হচ্ছে তাঁকে কারণ হাসির গল্প লেখাতেই তাঁর নাম।

দু' দুটো অসুস্থতার খবর দিতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে পাড়ার এক ভদ্রলোকের কথা। তাঁর ধারণা, তাঁর শরীরটা কেবলই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে সাধারণত যে সংলাপ বিনিময় হয়, তা এই রকম—

'কী খবর? কেমন আছেন?' এর উত্তরে 'ভালো' বলেই লোকে সরে পড়ে. কারণ সত্যি সত্যি কেউ যদি খবর দিতে শুরু করে, তা শোনার সময়ই বা কার আছে, ইচ্ছেই বা কার? কিন্তু এঁর কাছে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। উনি তাঁর সংলাপ শুরু করে দেন, 'আর বোলো না ভাই, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।'

'কেন? কি হয়েছে?' এবারে আমাকে দাঁড়াতেই হয়।

'কাল এমন ঠাণ্ডা লেগেছে যে কাশির চোটে ঘুমোতে পারিনি। সর্দি'ও হয়েছে খুব।'

'ওষুধ কিছু খেয়েছেন?'

'কী আর খাব? তবু অনেক ক্যাপসুল দিয়ে গেছে, খেয়েছিও। সুবিধে হয়নি।'

বললাম, 'দেখুন, আজকে হয়তো কমে যাবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এদিকে আবার আর এক কাণ্ড।'

'কী হল?' আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তবু উপায় নেই।

কাল বুঝলে, বুকের মধ্যে এমন করে উঠল. মনে হল এই বুঝি শেষ। ছেলে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল ই-সি-জি করা হল ঐ রাত্তিরেই।'

'কিছু পাওয়া গেল?' জিগ্যেস করতেই হল আমাকে।

'ডাক্তার তো তেমন কিছু বলল না। বলে, আমার হয়ত অম্বল হয়েছে। আমার মনে হয় ওর যন্তরটাতেই গোলমাল।'

ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি যে, গোলমাল আসলে ভদ্রলোকের মাথায়। এ ধরনের বাতিকগ্রস্ত লোক অনেক আছে। এরা সর্বদাই রোগের ভয়ে ডাক্তার ডাকছে। না, ঠিক ভয় নয়, এটাই এদের বিলাস। যদি কখনো তাঁদের বলা হয়, 'আপনাকে আজ বেশ ভালো দেখাচ্ছে, শরীর ভাল আছে নিশ্চয়,' তাহলে এঁরা ভয়ানক বিরক্ত হন, এমন কি রেগেও যান। ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'ভালোর কি দেখলে? আমি এখন একটু হেঁটেই হাঁপিয়ে যাই। রাত্তিরে ঘুম হয় না, যা খাই তাতেই চোঁয়া ঢেকুর। ভোরের দিকে একটু ঘুম আসে, তাও দুঃস্বপ্ন দেখি। মনে যে কী আতঙ্ক, তা কি বলব।'

বলাটা ভুল হয়ে গেছে বুঝতে হবে। তখন বলতে হয়, 'না না, একটু ইয়ে তো লাগছেই, ভাবলাম হয়ত ইয়েটা ইয়ে হয়েছে আর কি।' ইয়ে বলে চালাতে হল. ইয়ের তো নির্দিষ্ট মানে নেই, যা মানে করতে চান, তাই হয়।

ভদ্রলোক এবারে ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'কি করব ভেবে পাচ্ছি না। এ্যালোপ্যাথি করে দেখলাম, টাকার শ্রাদ্ধ অথচ কোন উপকার হল না।'

আমি বললাম, 'ভালো হোমিওপ্যাথ কাউকে…' পুরোটা বলতে হল না, উনি বলে উঠলেন, 'তাও করেছি, ৬৪ টাকা ভিজিট দিয়ে দেখিয়েছি, ফল কী হল? লবডঙ্কা। কিসু্য হল না।' ভেবেচিন্তে বললাম, 'প্রেসারটা দেখিয়েছিলেন?' ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ, ওইখানেই গোলমাল। হাই রয়েছে।' জিগ্যেস করলাম—'কত?' এখন তো আমরা নিজেরাই হাফ ডাক্তার হয়ে গেছি, প্রেসার কত হলে হাই, কত হলে লো, ইসিজিতে হার্ট ব্লক কাকে বলে, সুগার হলে কি হয়—এ সব আমরা নিজেরাই জানি। বাড়িতে ডাক্তার এলে সে আর কতটা ডাক্তারি করে, আমরাই তো অনেকটা করে দিই। আমার কথার উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'নুনটা কম খেতে বলেছে, আমার আবার পাতে নুন না হলে খাওয়াই হয় না।'

বাজারের দেরি হয়ে গেল। সেদিন শুধু আলু আর ছোট মাছ এনে সারলুম। বাড়িতে বৌয়ের কাছে শুনতে হল খুব, 'বাজারটা ঠিক করে করতে পারো না। এতক্ষণ কোথায় আড্ডা দিয়ে এলে?' ভাবলাম বলি আসল কথাটা, বললাম না। জানি ওতে কাজ হবে না। চুপ করে আছি দেখে বৌ রান্নাঘর থেকেই চেঁচাতে থাকল, 'এখন এতগুলো লোককে আমি কী খেতে দিই? তুমি তো এখুনি আপিসে আড্ডা দিতে বেরিয়ে যাবে। এতগুলো বছর শুধু বেঁচেই আছ, কোন কাজে লাগলে না।' বেঁচে আছি বলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে ভাবলুম, ডাক্তারের কাছ থেকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ লিখিয়ে এনে দেব নাকি বৌকে একবার বিধবা করে! দেখুক, কত চালে কতটা কাঁকর।

পরের দিনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। আজ ওঁর আর্থ্রাইটিস হয়েছে। দোষের মধ্যে বলে ফেলেছিলাম,—'একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন যেন।' ব্যাস, আর দেখতে হল না। আর্থ্রাইটিস আর বাত—এ দুয়ে কী তফাৎ, ওঁর বাবার এই রোগ ছিল ইত্যাদি সমস্ত তথ্য জানা গেল। বুকের মধ্যে গুরগুর করছিল, আজও যদি বাজারে দেরি হয় তবে বৌ আর রক্ষে রাখবে না, হয়ত মেরেই ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। কিন্তু এসব লোককে ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কোন ডাক্তার এ ব্যাপারে কী বলেছে, সমস্ত শুনতে হল! শুনতে শুনতে এমন হল যে, যখন বাজারে ঢুকছি, মনে হচ্ছে আমারও যেন পায়ে ব্যথা, যেন খুঁড়িয়ে চললে ভাল হয়।

এই ধরনের লোকেরা সর্বদাই ডাক্তার ডেকে থাকেন। এঁরা চিরকালই ভাবেন যে, এঁদের অসুখ বড় ভীষণ। ক্রমান্বয়ে এঁরা ডাক্তার বদলে চলেন। যদি কোনো ডাক্তার বলে যে, আপনার আর ওষুধ খাবার দরকার নেই, তাহলে এঁরা সিদ্ধান্ত নেন, এই ডাক্তার কিছুই জানে না। যে ডাক্তার এঁদের

কথায় তাল দেন, সর্বদাই একটা না একটা ওষুধ খেতে বলেন, তাঁরা এঁদের বয়স্য হয়ে দাঁড়ান। এসব ডাক্তার রোজই এঁদের পরীক্ষা করেন আর গম্ভীর মুখে বলেন, 'যা অবস্থা দেখছি, আপনি বলেই টি'কে আছেন এখনো।' নিজেদের অসুখ নিয়ে এঁরা বেশ গর্বিত। মরার পরে যদি এঁরা কথা বলতে পারতেন, তাহলে তখনো নিশ্চয় বলতেন, 'দেখলে তো, বলেছিলাম আমি অসুস্থ। এখন বিশ্বাস হয়েছে?'

আবার আর এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁরা জীবনে ডাক্তার ডাকেন না। একজনের ডাক্তার ছাড়া চলে না, আর একজন ডাক্তার কেমন তাই জানেন না। ডাক্তার ডাকতে বললে এঁরা বলেন, 'ডাক্তার মানে কি জানো? 'ডাক তাঁর।' তিনি ডাকলেই ডাক্তার আসে আর চলে যেতে হয়। আমার সে রকম

অবস্থা এখনো হয়নি।' এঁরা রোগকে গ্রাহ্যই করেন না। বয়স ৮০ হয়ে গেল, এখনো কিছু বেভাব হলেই বলেন, 'উপোস দিলাম দু'দিন, সব ঠিক হয়ে গেল, বুঝলে। আরে সব গোলমাল এই দুটো জায়গায়, মুড়ি আর ভুঁড়ি। খাওয়া কমাও আর ভালো করে চান করো। ব্যাস, সব ঠিক থাকবে।' যদি বলি, তাহলেও একটা ডাক্তার দেখান, বয়স হয়েছে,' উনি হেসে বলবেন, 'ডাক্তার বয়স কমিয়ে দেবে? সে আর কি করবে? ওষুধই তো খেতে দেবে। আমি তো খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছি। ওষুধও না পথ্যও না। ওই খাওয়াটা ধরাকাট কর, দেখবে সব শায়েস্তা হয়ে যাবে।'

বুঝলাম, ইনি একেবারে উল্টো গোত্রের, সব সময় ভাল থাকেন। এমন কি যখন ভাল নেই, তখনো বিশ্বাস করেন যে, ভাল হয়ে যাবেন। ডাক্তারের

উপর এঁরা ভরসা করেন না। এ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজি —কোনটাতেই এঁরা রাজী নন। এঁরা কেউ কেউ নেচারপ্যাথি করেন। নেচার বা প্রকৃতির ওপর ভরসা করাই এঁদের প্রকৃতি। ঠান্ডা লাগলে এঁরা রোদ্দুরে গরম করা তেল মাখেন, রোদের গরমে পড়লে আম পুড়িয়ে খান। এঁদের যদি বলা যায়, 'শরীরটা একটু কাহিল দেখছি। কেমন আছেন?' ওঁরা সব কিছু উড়িয়ে দেবার সুরে বলবেন, 'সব ঠিক আছে। শরীর আবার কাহিল হবে কেন? মনকে পাত্তা দেবে না। মনের তুমি না তোমার মন?'

এ রকম লোককে কাবু করা কঠিন। শরীরে যে অসুখ হতে পারে সেটাই এঁরা মানতে চান না। মন ভালো রাখেন এঁরা সর্বদাই। লোকের উপকার করেন, সকলের খোঁজখবর নেন, ভালো জিনিসের সন্ধান রাখেন। ডাক্তার দেখলে এঁরা ডাক্তারেরই কুশল জানতে চান, 'কি ডাক্তার, কেমন আছ? না না, একটু শুকনো দেখাচ্ছে। বোধহয় খাটনি বেড়েছে। রাতবিরেতে দৌড়তে হচ্ছে নিশ্চয়?' ডাক্তার নিজেই অবাক। সে অন্য কোনো কথা বলার আগেই ভদ্রলোক বলবেন, 'এত যে খাটছ, খাচ্ছ তো সেইমতো? খাবে, ভাল করে খাবে।' ডাক্তার হয়ত বলবে, 'আপনি তো কিছুই খান না।' ভদ্রলোক হাসবেন খানিকটা—'আরে আমার বয়স হয়েছে, আমি তো কম খাব। আমার খাটনিও নেই। কিন্তু তুমি? বয়স অল্প, খাটতে হচ্ছে, তুমি তো খাওয়া দাওয়া করবে। কী বলে তোমাদের ডাক্তারিতে?' এ কথায় ডাক্তার হাসে। ভদ্রলোক বলবেন, 'সময় করে একদিন এসো বাড়িতে। সব বুঝিয়ে দেব।' ডাক্তার বলবে, 'আপনার বাড়িতে আমার তো আর যেতে হয়নি কোনদিন।' আবার হাসবেন ভদ্রলোক, 'সে যেতে হবে না। আমার তো ডাক্তার লাগে না। তবে এমনিই এসো। লোকের বাড়িতে লোকে যায় না? ও তোমার বোধহয় সময় নেই। রুগীর বাড়ি ছাড়া কোথাও যাও না।'

তারপরে ৮৫ পেরিয়ে একদিন ভদ্রলোক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ছেলেরা ধরাধরি করে শুইয়ে দিল। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এল তাঁর, চোখ চেয়েই বললেন, 'ডাক্তার। একজন ডাক্তার!' ডাক্তার অবশ্য এসে গিয়েছিল আগেই। তাকে ডেকে বললেন, 'জীবনে প্রথম ডাক্তার ডাকতে হল হে। একটা সার্টিফিকেট তো লাগবে। নইলে অসুবিধে হবে এদের।'

চিকিৎসার কিস্‌সা

ট্রামে চড়ে যাচ্ছিলাম। বেশ ভিড় হয়েছে। কিন্তু আমি বরাতজোরে বসার জায়গা পেয়েছিলাম। যাচ্ছিলাম ঠিক, হঠাৎ নাকটা সুরসুর করে উঠল। কয়েকবার চাপার চেষ্টা করলাম নাকে রুমাল দিয়ে, পারলাম না। প্রচণ্ড জোরে হাঁচলাম কয়েকবার। সবাই তাকালেন, বললেন না কিছু। আবার খানিকক্ষণ পরে শুরু হল হাঁচি। চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। ভারি বিশ্রি লাগছিল।

পাশেই দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক বললেন—'খুব হাঁচছেন দেখছি। গরমে? না ঠাণ্ডায়?' কিছু বলতে পারলাম না, কারণ আবার হাঁচি এসে গেছে। এবারে এ পাশে নয়, ও পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'ঠাণ্ডা কোথায় লাগবে? রোদ্দুরেই লেগেছে। যা চড়া রোদ!' এ পাশের লোকটি কড়া চোখে তাকালেন, 'রোদ চড়া হলে কি ঠাণ্ডা লাগে না?' আমিও অবাক হয়ে তাকালাম—কি করে? প্রশ্নটা করলেন ওপাশের ভদ্রলোক। এ পাশ থেকে জবাব এল 'কেন মশাই? কোল্ড ড্রিংক নেই? আইসক্রিম? আজকাল তো সবাই গরম লাগলেই ওইগুলো খায়।' আমি মনে করতে পারলাম না আইসক্রিম খেয়েছি কিনা। আমার ছেলে খাচ্ছিল, আমি জুলজুল করে সেদিকে চেয়েছিলাম বটে।

এ পাশের ভদ্রলোক আবার বললেন—'রাসটক্স খেয়ে দেখতে পারেন। নয়তো মার্কসল।' ও পাশের ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন 'আরে, না না মশাই, ওসবে হবে না। অ্যান্টিবায়োটিক ঠেসে দিন দিনে তিনটে। দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে।' পেছন থেকে একজনের গলা শোনা গেল অ্যান্টিবায়োটিক যখন তখন খাওয়া ঠিক নয়। আপনি একটু সি-ভিটামিন খান। ওতেই হবে।' সামনে থেকে একজন পিছিয়ে এলেন এদিকে—'আপনি যেরকম হাঁচছেন, তাতে ওষুধ ক্যাপসুলে আপনার হবে না মশাই। ম্যাকালভিট ইনজেকশনটা নিয়ে দেখুন দেখি! দিনে দুটো। সাতদিন।'

এঁদের প্রেসক্রিপশন শুনতে শুনতে হাঁচিটা একটু ধরেছিল। আবার শুরু হয়ে গেল। একজন ভদ্রমহিলা লেডিজ সীট থেকে গলা বাড়ালেন—'দুবেলা চ্যবনপ্রাশ খান দেখি। হাঁচি পড়পড়িয়ে পালাবে।'

আমি তখন ক্রমাগত হেঁচে চলেছি। ট্রাম সুদ্ধ লোক ক্রুদ্ধ চোখে তাকাচ্ছে। কোন স্টপে এসে দাঁড়ালে রাস্তার গাড়ির আরোহীরা ফিরে ফিরে দেখছে আমাকে। জানলার পাশে বসেই হাঁচছি আর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবার। একটি ছোকরা পাশ দিয়ে স্কুটার চালাতে চালাতে বলল—'দাদা কি এককালে বোমা বানাতেন? যা আওয়াজ এখনো ছাড়ছেন!'

আমি যথেষ্ট লজ্জিত, কিন্তু কি করব বুঝতে পারছি না। আরেক ভদ্রলোক বললেন 'ডাক্তার দেখিয়েছেন?' হাঁচিটা একটু জিরেন দিয়েছিল, বললাম, 'কেউ তো কিছু করতে পারে না। বলে সর্দিকাশি ওষুধ খেলে সারে সাত দিনে, না খেলে এক হপ্তায়।' এ কথায় হাসলেন কেউ কেউ। এমন সময়ে ট্রামটা থামিয়ে ড্রাইভার তাঁর কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বললেন, 'রাতে শোবার আগে গরম জলে আধঘণ্টা পা ডুবিয়ে বসে থাকুন। ভোরে সব ঠিক হয়ে যাবে।' এইটুকু বলেই তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। ফিরে গেলেন ট্রাম চালাতে। আমি তখন নামব বলে উঠে দাঁড়িয়েছি। দরজার কাছে আসতেই কণ্ডাক্টর বললেন, 'আমার একটা কথা শুনবেন?'

হাঁচি সারুক বা না সারুক, বোঝা গেল ডাক্তারি আমরা সবাই জানি। আপনি কাউকে জিগ্যেস করুন—সাহিত্য জান? উত্তর পাবেন—না। বলুন—বিজ্ঞান জান? না। দর্শন? না। চিকিৎসা? কিছু কিছু জানি। আমি ঠিক করলাম ডাক্তারের কাছেই যাব। গেলামও। বাড়ির কাছে যিনি সবচেয়ে বেশি ফি নেন, তাঁর কাছেই হাজির হলাম একদিন। ফি নিয়ে মায়া করলে চলবে না, টাকাটা এখানে বড়ো কথা নয়। হাঁচির চোটে নিজে তো কষ্ট পাচ্ছিই, অন্য সবাইও কষ্ট পাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রে হাঁচির ধাক্কায় নিজে তো জেগে থাকি, আর সেই হাঁচির আওয়াজ শুনে পাড়াসুদ্ধ লোক জেগে থাকে। সকালে কেউ কেউ জানতে চান—হাঁচিটা কেমন আছে? বলতে হয়— ভালই আছে, সারারাত প্র্যাকটিস করেছি তো!

ডাক্তারবাবু সব শুনে আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন। তারপরে শুরু করলেন পরীক্ষা। পালস দেখলেন, ব্লাডপ্রেসার মাপলেন, সারা শরীরে নানা খোঁচা দিয়ে খোদায় মালুম কি সব বুঝলেন। এইভাবে আধঘণ্টা কাটিয়ে উনি কিছুই ধরতে পারলেন না—তবে ফি নিলেন একশো টাকা। তারপরে বললেন, ব্লাড টেস্ট করে আনুন। করালাম। সেখানেও মোটা টাকা দিতে হল। কিচ্ছু পাওয়া গেল না। তখন বললেন—বুকের একটা এক্স-রে করান। করালাম। করকরে টাকা ঝরঝর করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এবারও কিছু পাওয়া গেল না। বুঝলাম, উনি শুধু আন্দাজে ঢিল

ছ‍ুঁড়ছেন। আন্দাজ একটাও লাগছে না। তবে ধান্দাটা হয়ে যাচ্ছে। অনেক দামি দামি ওষুধ দিতে লাগলেন। তারপর বললেন—ব্লাড কালচার করান। বলে ঐ এখানের ঠিকানাটা দিলেন। ও'র পছন্দমত জায়গায় রক্ত পরীক্ষা করাতে গিয়ে আমার রক্ত জল হয়ে যেতে লাগল। ততক্ষণে আমিও ব্যাপারটায় মজা পেয়ে গিয়েছি।

আমি ধরতে পেরেছি যে ডাক্তারবাবু কিছুই ধরতে পারছেন না। ব্যাপারটা কোথায় যায় সেটাই এখন দেখার। আমার হাঁচি কাশি সব তুচ্ছ হয়ে গেল। দেখতে হবে চিকিৎসাটা কতদূর যায়। আপনারা নিশ্চয় জানতে চাইবেন যে অসুখটা কি হল আমার। সেরে গেল। পুরো শীতটা ভুগলাম। শীত চলে যেতেই হাঁচি কাশি আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। ততদিনে ওষুধ খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছি আমি। বুঝেছি, এ ওষুধের কম্ম নয়।

এক ভদ্রলোকের অসুখের কথা আমি জানি। যাঁর ই সি জি, আলট্রা-সোনোগ্রাফ ইত্যাদি অনেক ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল। কিছু বোঝা যায়নি। মেডিক্যাল বোর্ড বসেছিল। পাঁচজন ডাক্তার পরামর্শ করতেন। ইনি বলতেন ম্যালেরিয়া, উনি বলতেন ফাইলেরিয়া। তিনি বলতেন থ্রমবোসিস. অন্যজন বলতেন, বোধহয় ক্যান্সার। কেউ চেপে ধরলে বলতেন, এখনো হয়নি, তবে হয়ে যাবে। পাঁচ নম্বর ডাক্তার এ'দেরটা শুনতেন, সহজে কিছু বলতেন না। কখনো বলতেন, তাহলে ভোট হোক। ভোটের ফল অনুসারে রোগ নির্ণয় হতো, চিকিৎসা শুরু হতো সেই রকম। পরের সপ্তাহে আবার ফল বদলে যেত। আবার নতুন চিকিৎসা চালু করতে হতো। টি ভি দেখলে টি বি হয় কিনা এ কথাও ভাবতেন ত'রা। সব রোগই ও'রা চেস্টা করে দেখেছেন। শুধু এড্সটা বলেননি। কারণ সেটার কি ওষুধ দেবেন, তা এখনো জানা যায়নি। শেষ পর্যন্ত রোগীকে মরতে হল। বাড়ির লোক তাঁদের কাছে জানতে চাইল—আপনারা এতজনে মিলে বাঁচাতে পারলেন না? ডাক্তাররা বললেন—বলেন কি? পাঁচজন মিলে একজনকে মারতে পারব না?

এইসব ডাক্তারদের কাছেই আমাদের বাঁচবার চেস্টা করবার জন্য যেতে হয়। যতক্ষণ না অন্য কোন উপায় আবিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ তা ছাড়া উপায় নেই। এইভাবেই মরতে হবে। উকিলদের হাতে অবশ্য আপনি শুধু ধনেই মরবেন, ডাক্তারদের হাতে মরবেন ধনেপ্রাণে। কেউ বলতে পারেন টাকাই যদি চলে গেল, তবে আর প্রাণে বে'চে কি লাভ? সত্যি কথা বলতে কি প্রাণের চেয়েও টাকাই বোধহয় বড়ো, নইলে আমরা কেন 'ধনেপ্রাণে

মলুম' বলি, কই 'প্রাণে ধনে মলুম' তো বলি না। আসলে ডাক্তারদের কাজ মোটামুটি জ্যান্ত মানুষ নিয়েই চলে, উকিলদের কারবার শুরু হয় অনেক সময়েই মরে যাবার পরে। একজন মারে, আরেকজন শ্রাদ্ধ করে। শনি বড় না কলি বড়, সে তর্ক করে ফল নেই।

উকিলদের কথা থাক, বেশি বললে তারা মামলা ঠুকে দেবে। আমার হয়ে মামলা চালাবার মতো পাল্টা উকিল কি আসবে তখন? বরং ডাক্তারদের কথাই বলি। এমনিতেও তারা ওষুধের নামে বিষুধ দেয়, এ লেখা পড়ে হয়তো সরাসরি বিষ-ই দেবে—তাও ভাল, তাতে অন্তত বিষয় বাঁচবে। ডাক্তার কাউকেই বাঁচায় না, নিজেকে ছাড়া। তার বাড়ি-গাড়ি সম্পত্তি হয়, আশ্চর্য তার কিন্তু অসুখ হয় না। এজন্য তাকে কখনো ডাক্তার দেখাতে যাবার ঝামেলা পোয়াতে হয়নি কখনো। প্রতি বছর তার রেট বাড়ে, আমাদের মতো নিরেট লোকদের পকেট ফাঁক হয়। অপারেশান চার্জ নেবার সময়ে এরা ছুরি কাঁচির আলাদা দাম ধরে নেয়। হাসপাতালের বদলে এরা কাটাকুটি করে নার্সিংহোমে—যেখানে রোগীর পার্স গলে যায়—কার্স করেও লাভ হয় না।

এদের হাতে রুগীর অবস্থা যতই বাড়ন্ত হোক না কেন, এদের বাড়বাড়ন্ত হওয়া থেমে থাকে না। এদের সঙ্গে রুগীর দেখা হওয়াই ভার। দেখা করতে গেলে মুখ ভার করে শুনতে হবে, তিন সপ্তাহের আগে ডেট পাওয়া যাবে না। যদি বলেন, ততদিনে তো আমি মরে যেতে পারি! তাহলে শুনবেন, সে অবস্থায় আপনি ডেট ক্যান্সেল করতে পারেন।

ডেট পেলেও এঁদের চেম্বারে আপনাকে ওয়েট করতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেখা হবার পরে যখন আপনার রোগের বৃত্তান্ত জানতে চাইবেন ডাক্তার, তখন বলবেন আপনি, 'ডাক্তারবাবু, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আপনার চেম্বারে এসে এসে এই দু'ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে আমার যেন কেমন মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। মনে হয় খুন করি কাউকে।'

এইসব ডাক্তারের গাড়ি সারায় যে মেকানিক, সে বিল বানায় বেশি করে। ডাক্তার রেগেমেগে বলে, 'এইটুকু কাজের জন্য এত টাকা? আমরা তো এত বেশি টাকা চাই না।' মেকানিক রসিক হলে জবাব দেয়, 'শুনুন, আপনারা চিরকাল একটা মডেল নিয়েই কাজ করেন। আমাদের কাছে রোজ কত নতুন মডেল আসছে বলুন তো?'

ডাক্তারদের গ্রাহ্য করে না এরকম লোকও আছে। সে খুব সর্দিতে ভুগছে—অথচ হুইস্কি নিয়ে বসেছে। ডাক্তার বলেছে—'একি করছেন?'

লোকটি বলেছে—'আমি জানি হুইস্কিতে সর্দি যায় না, কিন্তু সে তো চিকিৎসাতেও যায় না।'

ছেলের পেটে কৃমি দেখে বাবা গিয়েছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বলেছে —'কৃমি? ও তো আমি পারব না।' বাবা অবাক হয়ে বলেছে—'কেন?' ডাক্তার সপ্রতিভভাবে জবাব দিয়েছে—'আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার আগের বারে কৃমি এসেছিল। আমরা ওটা বাদ দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের আগের বারে পাশ করেছে এমন কোন ডাক্তারের কাছে যান আপনি।'

এর পরে একটা শেষ গোপন কথা শোনাই। পায়ে চোট লেগে ফুলেছিল

খুব। ডাক্তারকে বলতে উনি বললেন, 'গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখুন।' তাই করলাম। কিন্তু বেড়ে গেল ভীষণ। বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে, সে বলল, 'ঠাণ্ডাজলে ডুবিয়ে রাখুন পা।' তখন তাই করলাম। এবারে সেরে গেল চট্ করে। ডাক্তারকে বললাম—'এটা কিরকম হল? আপনি বললেন গরম জলে ডুবোতে। তাতে উপকার হল না। বাড়ির ঝি বলল, ঠাণ্ডা জলে ডুবোতে। তাতেই সারল। আপনি তো ডোবালেন মশাই।' ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, 'ঠাণ্ডা জলে সারল? সে কি? আমাদের বাড়ির ঝি-টা তো গরম জলই বলেছিল।'

বনধ এবং প্রভাতফেরী

মনুজেন্দ্রকে একজন জিগ্যেস করেছিল, 'আপনি কাদের দিকে?' মনুজেন্দ্র বলল, 'তার মানে?' প্রশ্নকর্তা বলল, 'একদল বন্ধ ডেকেছে ৮ তারিখে, আর এক দল ডেকেছে ২০ তারিখে। আপনি কাদের দিকে?' মনুজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলেছিল,—'আমি কারো দিকে নই। যে ৮ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত একটানা বন্ধ ডাকবে, আমি তার দিকে।'

বোঝা যাচ্ছে যে বন্ধ মানে আমরা ছুটি বুঝি। বন্ধ হলে কোন সুরাহা হবে না তা জানি, সুতরাং তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ছুটিটাই ভোগ করে নেওয়া যাক। বন্ধের আওতা থেকে কিছু জরুরী কাজকর্মকে ছাড় দেওয়া হয়, যেমন বিদ্যুৎ (অবশ্য এটা স্বাভাবিক সময়েও বন্ধই থাকে), সংবাদপত্র ইত্যাদি। আরো দুয়েকটা জিনিস এতে যোগ করা উচিত। যেমন সিগারেটের দোকান, ইভ্নিং শো'র সিনেমা, কেরোসিন তেলের বিক্রী, ভিডিও পার্লার।

আমরা ছেলেবেলায় প্রভাতফেরী বলে একটা শোভাযাত্রা দেখতাম। কোনো বিশেষ দিনে সবাই জড়ো হতো পাড়ায় পাড়ায়। সকাল থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যেত। ছোট ছোট ছেলেরা শাদা শার্ট প্যান্ট পরে লাইন দিয়ে দাঁড়াত। একটু বড়ো যারা, তারা তুলে নিত ব্যান্ড। তারা আবার মাথায় পরত রঙিন টুপি। কি সুন্দর কায়দায় তারা মার্চ করত। গম্ভীর মুখে ব্যান্ডের দুপাশে স্টিক দিয়ে বাজাত। কখনো দুহাতে ব্যান্ডের দুপাশে বাজাচ্ছে, আবার কখনো হাত দুটো ক্রস করে ডান হাত দিয়ে ব্যান্ডের বাঁদিকটা আর বাঁ হাত দিয়ে ব্যান্ডের ডান দিকটায় ঘা নিচ্ছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখতাম, মনে হতো আমি কবে ওই রকম বাজাতে পারব। যখন সগর্বে দলটা হেঁটে যেত, তখন ভীড় হয়ে যেত রাস্তায়। পাড়ার চেনাজানা মেয়েরা তখন আমাদের দিকে তাকাতই না, কেবল ওদেরই দেখত। ওরাও কোন দিকে চাইত না, শুধু একমনে ব্যান্ডে বাজিয়ে যেত কত রকমের সুর। সেসব এখন আর দেখি না। ঐভাবে ব্যান্ড বাজাতে আর কেউ শেখে না। সকলে শুধু ক্যাসেটে হিন্দি গান শোনে। অথচ ঐ রকম প্রভাতফেরী বেরোলে মনটা কেমন যেন তাজা হয়ে যেত। আমার মনে হয়

বন্‌ধের দিন আবার প্রভাতফেরী শুরু করা যাক। যারা বন্‌ধ সমর্থন করে তারা পরুক শাদা ইউনিফর্ম, যারা বন্‌ধের বিরোধী তারা পরুক রঙিন জামা। এতেই তফাৎ বোঝা যাবে। এখন দু-দলে দেখা হলেই মারামারি হয়ে যায়। তখন দেখা হলেই দুজনে দুরকম গান বাজাবে। এ যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়, ও বাজাবে দ্বিজেন্দ্রলাল। ও যদি নজরুল ধরে, এ তবে ধরবে অতুলপ্রসাদ। কখনো সলিল চৌধুরী। দু-পক্ষই বেশ উদ্দীপ্ত হবে, মনে করবে তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। কিন্তু কোন মারামারি হবে না। বরং বাজনা শুনে, ও পক্ষের কোন মেয়ে প্রেমে পড়ে যাবে এ পক্ষের ছেলের।

আসলে প্রভাতফেরী ব্যাপারটাই রোমাঞ্চকর। বন্‌ধের দিনে সে রোমান্স জাগিয়ে দেবে। আমাদের সময়ে এই সূত্রে কতবার কত জোড়া হৃদয়ে রং লেগেছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রায় সময়েই তাদের মধ্যে বিয়ে হতো না, কিন্তু বিয়ের দিন দুজনেই মনে করতো সে বছরের ১৫ই আগস্টের প্রভাত-ফেরীটা কেমন হয়েছিল। এখন মিছিলে শ্লোগান হয়, তার বদলে শ্লো রীদ্‌মে গান ধরবে সবাই। তখন বন্‌ধের দিন বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় হবে না। এখন বাড়ির ছাদে উঠে সবাই দু-পক্ষের মারামারি দেখে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, চা খেতে খেতে, প্রায় টেলিভিশন সিরিয়াল দেখার মত সকলে লক্ষ্য করে কে বোমা মারল, গুলি লাগল কার গায়ে। কেউ বেরোতে চায় না এখন।

অথচ আমরা মৌজ করে বেরোতাম বন্‌ধের দিনে। রাস্তায় খেলা হত, ফুটবলের সীজ্‌নে ফুটবল, ক্রিকেট সীজ্‌নে ক্রিকেট। সন্ধেবেলা মনে হত মেলা বসেছে পথে। কত লোক, কত স্ত্রীলোক। বিকেলের দিকে সব খুলে যেত আবার। দোকানপাট, সিনেমা, থিয়েটার। কেবল আপিস যেতে হত না। আমার মনে আছে তখন বছরে দু-তিনটে বন্‌ধ বাঁধা ছিল। পুজোর আগে যেটা হত, সেটার পরেই পুজোর কেনাকাটা শুরু হয়ে যেত। আমাদের কারখানায় একটি ছেলে ইউনিয়নকে বলেছিল, আপনাদের উচিত মাসে একটা করে বন্‌ধ করা। কোন ইস্যু না থাকলেও করা দরকার, আপনাদের শক্তিটা জানিয়ে রাখা চাই।

তার মানে সবাই বন্‌ধের নামে কাজ থেকে রেহাই চাইত। তখনো বন্‌ধ করে কোন বিষয়ে কিছু কাজ হয়েছে, এমন মনে পড়ে না। এখনো বন্‌ধ করে কিছু লাভ হয়, তা কেউ বলতে পারবে না। তাহলে শুধু শুধু মারপিট করার কি প্রয়োজন? বরং প্রভাতফেরীর মত গানটান করে বেশ ভালভাবে দিনটা কাটালেই হয়। এভাবে একটা সংহতি গড়ে উঠতে পারে।

তখন অনেক সময়ে একটা বন্‌ধের পরে একদিন বাদ দিয়ে আবার আরেকটা বন্‌ধ হয়েছে। দুটো আলাদা ইস্যুতে দুদিন ডাকা হয়েছে বন্‌ধ। মাঝ-খানের দিনটা বাজার করার জন্য খোলা ছিল সব। বন্‌ধের আগের দিন সবাই ভাল করে বাজার করে। কাল ছুটি, বেশ ভাল খাওয়া দাওয়া হবে।

কোন দিন বন্‌ধ করে ছুটি পাওয়া ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। তাই যদি হবে, তাহলে আমরা যে কোন বিষয় নিয়েই বন্‌ধ ডাকতে পারি। ইরাক-কুয়েতের লড়াই, ইজরাইল-প্যালেস্টাইন বিরোধ, আমেরিকা-রাশিয়ার দ্বন্দ্ব, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ,—এ সমস্ত কারণে বন্‌ধ ডাকা যেতে পারে।

বের করা যেতে পারে প্রভাতফেরী। বিদেশি ব্যাপার হলে কিছু বিদেশি গানও গাওয়া চলে। তাতে আরো জমবে ব্যাপারটা। কোন মারামারি হবে না, কেউ মরবে না, কাঁদবে না কেউ। শুধু মজা, শুধু হাসি।

প্রভাতফেরীটা যদি ফের বিশেষ দিনের প্রভাতে চালু হয়, তাহলে অনেক নতুন জীবিকার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ধরুন, ব্যান্ড বাজানো যদি সবাই শিখতে আসে, তাহলে ব্যান্ড তৈরি হবে আরো বেশি। অর্থাৎ ব্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়াতে হবে। নতুন একটা ট্রেড তাহলে চলবে। কেউ

বানাবে, কেউ তার পার্ট'স সাপ্লাই দেবে, কেউ বাজানো শেখাবে। আর এটাও ভেবে দেখা যেতে পারে যে ঐ ব্র্যাণ্ড বাজালে, মানে গানের সুর ভাঁজলে মানুষের মন একটু নরম হয়েও থাকবে। পাড়ায় পাড়ায় বেশ একটা সম্প্রীতি গড়ে উঠতে পারে। তখন তো দু-দলে মারামারি হবে না, গান গাওয়া হবে। জিতলেও সুখ, হারলেও মজা। এমন হতে পারে যে ঘন-ঘন বন্ধ ডাকতে পারলে ঘনঘন নতুন নতুন ড্রাম বাজানোর দল তৈরি হবে। যত বন্ধ হবে, তত আর্টিস্ট তৈরি হবে। তাহলে গণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে ঐ ড্রাম বাজানো নিয়েই আমরা ট্যাবলো বানাতে পারব। প্রভাত-ফেরীতে শুধু ব্যাণ্ড বাজানো হয় এমন নয়, এতে দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা গান গাইতে গাইতে এগোয়। দেশাত্মবোধক গানই হয়,—এতে বেশ চেঁচিয়ে গাইলে সকলেরই দম বাড়ে,—ফুসফুস এবং হার্ট, এ দুটোরই উপকার হয় এতে। তার মানে আমাদের স্বাস্থ্যও এর ফলে ভাল হয়ে যেতে পারে। স্ট্যামিনা বাড়বে, বাড়বে পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

প্রভাতফেরীর ট্রেনিং দেবার জন্য ক্লাশ খোলা যেতে পারে। সেখানে সবাইকে চেঁচিয়ে গাইতে শেখানো হবে। অর্থাৎ এখানেও একটা জীবিকার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন একটু হিসেব করে বন্ধ ডাকতে পারলে সমাজের কত উপকার হওয়া সম্ভব। আর্টিস্ট পাচ্ছেন, কাজ পাচ্ছেন, রোজগারের সুযোগ পাচ্ছেন। যারা একা একা গাইবার উপযুক্ত নয় এবং সেজন্য জলসায় চান্স পাচ্ছে না, তারা এইভাবে কোরাস আর্টিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বন্ধের দিনে কোন সোলো বা একক অনুষ্ঠান চলবে না, সমবেত সঙ্গীতই সেদিনের বাজার রাখবে। তার ফলে কোন্ কোরাস আর্টিস্টেরই নিজেকে ছোট মনে হবে না, বরং সবাই মিলে গাইতে গাইতে হাঁটলে নিজেকে সকলের একজন বলে মনে হবে।

এভাবে প্রভাতফেরী যদি চলতে থাকে, তাহলে আমরা এক ধরনের গায়ক, গীতিকার এবং সুরকার পাব, যারা এই উদ্দীপক গান গাইবে, লিখবে, সুর দেবে। সমাজে নতুন একটি শ্রেণী তৈরি হবে, যাদের কাজই হবে গান বানানো। সেই পুরোনো চারণ কবি বা চারণ গায়ক আবার ফিরে আসবে আমাদের মধ্যে।

তবে আমার চিরকালের লোভ ঐ ড্রামটা তুলে নিয়ে বাজানো। আমার শরীরে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে পারব কিনা জানি না। ড্রামের ওজন সম্ভবত আমার ওজনের চেয়ে বেশি। ওই ওজন ঘাড়ে নিয়ে আর নাকে অক্সিজেন হয়তো টানতে পারব না। তথাপি আমার ঐ বাসনাটাই আছে,—ওইভাবে ড্রাম বাজাব, দুহাত ক্রস করে ডানহাতে বাঁদিকটা, আর

বাঁহাতে ডানদিকটা বাজাতে বাজাতে এগোব। রাস্তার মোড়ের বাড়িটায় যে মধ্যবয়স্কা বৌটি থাকে, সে কাপড় মেলতে মেলতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখবে, দুচোখে তার মুগ্ধতা, তার ঘরকুনো স্বামীকে ডেকে আঙুল তুলে আমাকেই দেখাবে। আর আমাদের বয়স নেই, তবু এই প্রভাতফেরী আবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কিশোর বেলায়, যখন বন্ধ মানে খুনোখুনি ছিল না, ছিল ছুটির সুযোগ, ছিল জিরেন পাবার মওকা।

সারমেয়র কথা অমৃত সমান

ভিক্ষে চাই না, কুকুর ঠ্যাকাও—এ কথাটা বুঝবার জন্য কোন কুকুরওলা বাড়িতে গেলেই হয়। ভিক্ষে চাইবারও দরকার হয় না, শুধু বাড়িতে ঢুকলেই হবে। এমন কি, না ঢুকলেও আপনি কুকুরের হাঁকডাক শুনবেন এবং তাতেই রক্ত জল হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যে কুকুরটা আছে, সে নাকি কেউ এলেই তার সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করতে চায়। তার সেই খেলা করার ইচ্ছে দেখে আমার বন্ধুর বৌ এবং ছেলে কি খুশি। আরো খুশি আমার ভয় পাওয়া দেখে। কোথাও কিছু নেই, কুকুরটা হঠাৎ আমার পিঠের ওপরে লাফ মেরে এসে দাঁড়াল। আমি যে কী করে দাঁড়িয়ে রইলাম তা নিজেও জানি না। আমার বন্ধু আর তার বৌয়ের কী হাসি। আর একটা বাড়িতে দেখেছি, দরজার কড়া নাড়লেই ভেতরে কুকুরের চিৎকার শুরু হয়ে যায়। সে যে কী হিংস্র চিৎকার তা কি বলব। দরজা খুললেই দেখি দাঁড়িয়ে আছে সেই কুকুর, তার পেছনে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে বাড়ির ছেলেটি। তাকে বললাম, 'কুকুরটা সরাও আমি ওকে খুব ভয় পাই।' ছেলেটি বলল, 'তুমি জানো না, কুকুরটা আরো ভীতু। ও শুধু চ্যাঁচায়। তুমি ঢুকলেই ও সরে পড়বে।' আমার পক্ষে সে এক্সপেরিমেণ্ট করা সম্ভব হয়নি, কুকুর ভীতু না আমি ভীতু, এ নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন নেই আমার।

মানুষকে পছন্দ করা কঠিন, আরো সুকঠিন কুকুরকে পছন্দ করা। নানা রকম ট্রেনিং দিলে নাকি কুকুর 'মানুষ' হয়ে ওঠে। জানি না। তবে

মানুষও যে কুকুর হয়ে উঠতে পারে তা জানি। কুকুরের মতই কামড়া-কামড়ি করে, এ ওকে খিঁচোয়, তেড়ে যায়। সেটাই খবর। কুকুর মানুষকে কামড়ালে খবর হয় না, কিন্তু মানুষ যদি কুকুরকে কামড়ায় তবে সেটা খবর হয়ে ওঠে। কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক, মানুষ কামড়ালে শুধুই আতঙ্ক। শুধু জলে নয়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই মানুষের আতঙ্ক।

কিন্তু মানুষের কথা থাক। কুকুরের কথাই বলি। অবশ্য কুকুরের কথা বলতে গেলে পাশাপাশি মানুষের কথাও বলতে হবে। কারণ মানুষই কুকুর পোষে, এখনো কোনো কুকুর মানুষ পুষেছে বলে শুনিনি। তবে মানুষে কুকুরে খুব ভাব হতে দেখেছি কোথাও কোথাও। এ জন্য অনেক সময়ে কোনো কোনো মানুষকে 'কুত্তার বাচ্চা' বলে গাল দিলে ভুল হয় না। লক্ষ্য করলে দেখবেন যে কুত্তার বাচ্চা বললে মানুষ কিন্তু খুব চটে যায়। বাঘের বাচ্চা বললে কিন্তু সবাই খুশি হয়। কেন, তা বুঝতে আমি অক্ষম। দুটোই মানবেতর প্রাণী, দুজনেই মানুষের তুলনায় ইতর বিশেষ, সে জন্য দু'জনের বাচ্চা বললে কোনো ইতর-বিশেষ হবার কথা নয়, তবু কেন যে একটায় লোকে খুশি, আরেকটার দুষী ভাবে, তা বুঝি না। আমি অবশ্য বাঘের মত কুকুরের কথাও শুনেছি। সে গল্পটা এখানে দাখিল করি। বিমলবাবু বেড়াতে গেছেন শ্যামলবাবুর বাড়ি। শ্যামল বাবুর বাইরের ঘরে বসেছেন দু'জনে। হঠাৎ শ্যামলবাবুর দশাসই একটি কুকুর এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। কুকুরটা এসেই শ্যামলবাবুর পা চেটে নিয়ে বসে পড়ল, চেয়ে রইল বিমলবাবুর দিকে। শ্যামলবাবু বললেন, 'আর ভাই বলো না, এ কুকুরটাকে নিয়ে যা ঝামেলায় পড়েছিলাম একদিন।' বিমলবাবু মোটেই কুকুর পছন্দ করেন না, তাঁর মতে কুকুরই একটা ঝামেলা, শুধু ঝুট-ঝামেলা বলে উড়িয়ে দেবার মতো ঝুট মোটেই নয়। তবু ব্যাপারটা তিনি জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছিল?' 'আরে ভাই, এক ব্যাটা মুশকো কাবুলিওয়ালা এসে ঢুকেছিল বাড়িতে—কেন যে কে জানে। সুদ চাইবার মতো কেউ নেই এখানে, হয়তো হিং বিক্রি করতে এসেছিল।' বিমলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ ওই হিংয়ের নাম করে এসে হিং টিং ছট করার তালে ছিল হয়তো। চট করে সরে পড়ত তারপরে।' শ্যামলবাবু বললেন, 'কুকুরটা এক লাফে কাবুলিটার ঘাড়ে উঠে এমন টুঁটি চেপে ধরল যে, ব্যাটা মাটিতে পড়েই অক্কা। সে কি গোলমাল। পাড়ার ছেলেদের মোটা টাকা কবুলে তবে রক্ষে পাই।' বিমলবাবু হাঁ করে শুনছিলেন, দম আটকে আসছিল তাঁর। এমন সময়ে পাশের ঘরে টেলিফোন বাজল। শ্যামলবাবু 'আসছি ভাই' বলে ফোন ধরতে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা লাফ দিয়ে বিমলবাবুর সামনে

টেবিলটায় উঠে বসল। মুখটা ফাঁক করা, জিভটা একটু বেরিয়ে আছে, মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প হ্যা হ্যা ধরনের শব্দ। হাসছে না ধমকাচ্ছে ধরা যাচ্ছে না। বিমলবাবু যদি ডানদিকে ঘাড় ফেরান, তবে কুকুরও সেদিকে ঘোরে। যদি উনি বাঁদিকে ঘোরেন, কুকুরও তাই ঘোরে। কোনো চ্যাঁচামেচি নেই, আর কোনো নড়াচড়া নেই। কেবল বিমলবাবু নড়লে সে নড়ে। যেন বিমলবাবুর ছায়া পড়েছে আয়নায়। তিনি যা করছেন, ছায়া তাই করছে। বিমলবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটার সাহসটুকু পর্যন্ত হচ্ছে না। প্রায় দশ মিনিট বাদে ঘরে এলেন শ্যামলবাবু। অমনি

কুকুরটা টেবিল থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে বসল। বিমলবাবু বললেন, 'ভাই আমি হার্টের রুগী। এই খুনে কুকুরটাকে আমার সামনে রেখে তুমি চলে গেলে? যদি হার্ট ফেল করত?'

আমার তো কুকুর দেখলেই মনে হয় এবারে আমাকে কামড়াবে। এক একটার চ্যাঁচানি শুনলে যা মনে হয় তা আর বলার মত নয়। কুকুরের মালিকের ভাব দেখে মনে হয় তিনি চ্যাঁচানিটা উপভোগ করছেন—খাসা তোর চ্যাঁচানি। কেউ বলেন যে, কুকুরটা আসলে ভয়েই চ্যাঁচায়, কিন্তু ওতে যে আমিও ভয় পাই, একথা কেউ বোঝে না। কেউ বলেন, 'ও কিছু

বলবে না।' আমি বলি, 'আর কি বলবে, এই তো অনেক বলছে। এবার বোধহয় কামড়াবে।'

একবার লীলা মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে বসে অনেকক্ষণ গল্প করছিলাম। ও'র সঙ্গে কথা বলতে এত ভাল লাগছিল যে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ও'র একটা পাঁচকে কুকুর এসে হাজির। প্রায় কোলে উঠে পড়ে আর কি! আমার হাসি হাসি মুখে ভয়ে কাশি এসে গেল। বাধ্য হয়ে বললাম, 'কুকুরটা যদি সরান তবে ভাল হয়।' উনি রাগ করলেন না, কাকে ডেকে বললেন, 'ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যা।'

কুকুর দেখলে অনেকে তাদের জাতটা ধরে ফেলেন। আমি তো মাদী না মদ্দা তাও ধরতে পারি না। মাদী হোক, মদ্দা হোক, মা হোক বাবা হোক—দুটো একই রকমের ভয়াল। বাস্কারভিলের রহস্য যে কেন ঐ হাউণ্ডকে নিয়েই লেখা হয়েছিল, তা বুঝতে গেলে কুকুরের সাউণ্ড শুনতে হবে।

আমার দুই বন্ধুর বাড়িতে কুকুর আছে। নিশ্চয় দুজনেই বড়োলোক। নইলে কুকুর পোষার শখ হয়? আমরা যেখানে কালেভদ্রে কোন ভদ্রলোক নেমন্তন্ন করলে মাংস খেতে পাই, সেখানে কুকুরের জন্য রোজই মাংস বরাদ্দ। আমার দুই বন্ধুর বাড়িতে আমার যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। একজনের বাড়িতে দেখেছি কুকুর মরলে জাতীয় শোক উপস্থিত হয়, তার স্ত্রী ঘোরতর অসুস্থ হলেও তাকে বিচলিত হতে দেখিনি। আর এক বন্ধুর বাড়িতে কুকুর তারা সন্তান-স্নেহে পালন করে থাকে। তাদের প্রায় কোলে কোলেই থাকে সে কুকুর। সে বাড়িতে গেলে কুকুরটা এমন গায়েপড়া ভাব দেখায় যে গা শিরশির করে ওঠে। ওরা বলে, ওইভাবে নাকি কুকুরটা নতুন লোক এলেই তাকে শুঁকে নেয়—তাতেই ও বুঝে ফেলে লোকটি কেমন। একথায় কেমন সিঁটিয়ে যাই আমি। কুকুরের পেডিগ্রি দেখলেই নাকি মনিবের পয়সার ডিগ্রিটা ধরা পড়ে। এই একটি কারণে আমি পয়সা চাই না। তাহলে যদি আমারও কুকুর পোষার ইচ্ছে হয়? তখন তো সবাই বাড়িতে এলে কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও গাল দেবে। বলা যায় না সে কুকুর হয়তো আমাকেই কামড়াবে। তখন? তার চেয়ে বরং এখন যে কুকুরের জীবন কাটাচ্ছি, তাই চলুক।

আমার বাড়িতে একবার আমার ভাই কিছুদিন কুকুর পুষেছিল। সে কি বিপদ। নিজের বাড়িতেই নিজে ঢুকতে পারিনে। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে এসে দেখি অন্ধকারে নিচে যেন কি নড়ে উঠল। চমকে উঠে দেখলাম

ঐ কুকুরটা। আতকে যে চিৎকার করে উঠিনি, তা সাহসী বলে নয়, ভীতু বলে। ভয়েতে ভয়েস চলে গিয়েছিল।

গভীর রাত্রে একবার শ্মশানে যেতে হয়েছিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার। একটি মৃত্যুর খবর পেয়ে যাচ্ছিলাম। একা। কোথাও কোনো লোক নেই। হঠাৎ পাশ থেকে উঠে এল দু'টি কুকুর। দু'পাশে তারা দু'জনে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে তারা আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। কথাই, সেসব কথা কিছুই বুঝছিলাম না, শুধু ঘেমে উঠছিলাম। একজন সগর্জনে বলল, ঘেউ ঘেউ। অন্যজন জবাব দিল, খ্যাক খ্যাক। একজন দীর্ঘ প্রলম্বিত ধ্বনি তুলল—কেঁ-উ-উ। অন্যজন চাপা গলায় বলল—গর-র। সমস্তটাই আতঙ্ককর। মনে হচ্ছিল, অন্য কারো জন্য নয়, নিজের জন্যই শ্মশানে যাচ্ছি। এরাই নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। মনে হল, হাতে একটা কিছু নিয়ে বেরোলে হতো।

একটা মহল্লা পার হতেই দেখলাম কুকুর দুটো ফিরে গেল। যেন ওরা পার করে দিয়ে গেল পথটুকু। ঘাম মুছে নিঃশ্বাস ফেলার আগেই দেখলাম অন্য দুটো কুকুর এসে দাঁড়িয়েছে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এটা বোধহয় এদের মহল্লা। না, কেঁদে উঠিনি ককিয়ে। আবার চলতে শুরু করেছি।

তবু এই কুকুর যদি কাউকে অন্যের হয়ে সামলাতে হয়, তবে সে একটা করুণ কাহিনী বটে। ধীরেশের সায়েব দেশে যাবার সময়ে তার কুকুরটিকে ধীরেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। দিন পনেরোর মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন, সেই ক দিন যদি ধীরেশ একটু দেখে কুকুরটাকে। সায়েবের কুকুর, মোসাহেবের বাড়ি। ধীরেশরা সারা মাস নিরিমিষ্যি খায়। সায়েবের কুকুরের জন্য সে ছোট মাছ এনেছিল, কিন্তু সে দেখা গেল মাংস না হলে খায় না। কাজীর বাড়ির বাঁদীও দু'কলম লিখতে পারে, সায়েবের কুকুরও মাংস ছাড়া খাবার মুখে তোলে না। পনেরো দিনে ধীরেশের বাড়ির সকলের খাওয়া কমিয়ে দিতে হল, কুকুরের আঁচড়ে ধীরেশের মেয়ের পায়ে রক্ত বেরোল, সেজন্য ডাক্তার বলল, কুকুরটাকে নজরে রাখুন। কুকুর যদি পাগল হয়ে যায় তবে ইনজেকশন দিতে হবে মেয়েকে। নজর রাখতে গিয়ে ধীরেশই পাগল হবার যোগাড়। এছাড়া কুকুরের কামড়ে ধীরেশের বউয়ের দুটো শাড়ি ছিঁড়েছে, বিছানার চাদর ফুটো হয়েছে। সব শুনে সায়েব বলল, টম ইজ ভেরি নটি। ধীরেশ ভাবল কুকুরের কেন ইংরেজি নাম হয় কে জানে।

ঘরে বাইরে কুকুর দেখলাম অনেক। মানুষও কম দেখলাম না। কে

যেন বলেছিলেন—The more I see of men the more I love dogs—এটা আমি পুরো মানি না। মানুষকে ক্ষমা করা যায় না ঠিকই, তাই বলে কুকুরকে ভালবাসা সম্ভব নয়। যুধিষ্ঠির মনে হয় ঐ ইংরেজি কথাটা কোথাও সংস্কৃত অনুবাদে পড়ে থাকবেন বা হিন্দি সিরিয়ালে দেখে থাকবেন। সেই জন্য স্বর্গে যাবার বেলায় সব মানুষ, এমনকি নিজের মেয়েমানুষকেও ফেলে রেখে শুধু পড়ে পাওয়া কুকুরটিকে নিয়ে অমৃতের সন্ধানে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

পুজোর কথায়

বন্যা এবং ভূমিকম্পের পরে কম্প দিয়ে জ্বর আসার মতো দুর্গাপুজো এসে গেল। প্রতিবারই এইরকম হয়। হয় বন্যা, নয় খরা—ঘোটকে আগমন, দোলায় গমন। ঘোড়ার দোলানিতে হয় মড়ক, নয় ছত্রভঙ্গ।

তথাপি খুশি হয়ে উঠতে বাধে না। আবহাওয়াতে কেমন যেন ছলনা। ললনাদের মতোই এরও প্রসাধনের সাধনা দেখবার মত। না বৃষ্টি, না গরম, না শীত,—যেন সুসময় এসে গিয়েছে।

ব্যাপারটা কিন্তু সকলের কাছে সমান নয়। বাবার যা মনে হয়, ছেলের হয় তার উল্টো। একজন বড়ো হয়, আরেকজন বুড়ো হয়। একজনের পাওনা হয় প্রীতি, অন্যজনের দেনা হয় স্মৃতি। একজন ভরে যায় স্বাদে, অন্যজন বিষাদে।

পুজো এলেই আপনাকে কুঁজো হয়ে যেতে হয়। বউ এসে দাঁড়ায় ফর্দ নিয়ে, তাতে আপনাকে ফর্দাফাঁই করে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। জানলার পর্দা থেকে শুরু করে বিছানার চাদর, ছেলের প্যান্ট, মেয়ের ফ্রক, কি নেই তাতে? এছাড়া রয়েছে বউয়ের নিজস্ব বায়না, 'মনে রেখো' পাড়ের শাড়ি। মনে না রেখে উপায় নেই, কারণ ওর দাম দিতে গিয়ে আপনার নাম ভুলে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আজকাল আবার পাড়ার মেয়েরা অনেকে শাড়ি বেচার কারবার খুলেছেন—তাঁরা এসে যখন দাঁড়ালেন সামনে, তখন আপনার

কেনাকাটা সারা। কিন্তু খাঁড়া সরেনি, এঁরা এসেছেন দম নিয়ে। আপনার বউ এঁদের কাছে সওদা করতে চান কিনা বোঝবারই আগেই এঁরা দামি কিছু শাড়ি নামিয়ে দিয়েছেন দফায় দফায়। রফা না করতে পারলে আপনার দফা রফা হবেই। অগত্যা একটা কিস্তির বন্দোবস্ত করতে হল। এতেই যে এবারে কিস্তিমাত করতে পারলেন, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখনো ছেলের বন্ধুদের বিজয়া সম্মিলনী বাকি আছে। সেখানে শুধু চাঁদা দিয়ে রেহাই পাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু আপনার মেয়েকে ওরা গাইতে নিয়ে যাবে, আপনাকে হাই চাপতে চাপতে তাকে পাহারা দিতে যেতে হবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে আপনি পাহারা দিচ্ছেন, সময়ে অসময়ে এই ছেলেদেরই তো দরকার হতে পারে। এসব আপনার বউ আপনাকে জলের মত বুঝিয়ে দেবে, এতসব ফিচলেমি আপনার আবার আসে না। সারা বছর এধার ওধার থেকে ধার করে কর্ম সারা করেছেন, ভেবেছিলেন পুজোয় যে ক'টা টাকা বেশি পাবেন, তাই দিয়ে সামলাবেন সব। কিন্তু বোনাসই আপনার বিনাশ হয়ে দাঁড়াল। বউয়ের দাবি মানতেই হয়েছে, ছেলের বিজয়া-সম্মিলনীর চাঁদাও দিতে হল মোটারকম। তাও তো ভাইফোঁটা বাকি রইল এখনো।

তবু এই সময়টা লোকে বেহিসেবী হতে ভালবাসে। সারা বছর করণকষ্যি করেই চলছে, এখন একটু দস্যিপনা করতে সাধ যায়। বছরভর স্যাকরার ঠুকঠাক, বচ্ছরকার দিনে কামারের এক ঘা। যা কিছু কামাই তা এখন কাবার করার বাসনা। মাসকাবারে আবার সেই গিন্নির গাল শোনা, তবু আজকের আবুহোসেনি কে আটকায়! সারা জীবন একই বেড়াজালে কাটল, এখন একবার বেড়াতে বেরোই। কাশী বা কাশ্মীর না-ই বা হল, ঘরের কাছে কোনো নির্জন সৈকতে, শহরের গায়ে লাগা কোন গাঁয়েই না হয় দুদিন জিরিয়ে আসি। বুক টান করে হাঁটি, মাথা উঁচু করে তাকাই। বলা যায় না, বৌ হয়তো আরেকবার খুশিও হয়ে যেতে পারে।

আর যদি কোথাও না যাওয়া হয়, তাতেই বা কি। এই শহরেও রোদ্দুর নরম হয়ে এসেছে, পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘে সেজেছে আকাশ। পথে পথে মানুষ—প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ভিড়। যেন কোথাও কষ্ট নেই, ভাবনা নেই। মেলা বসেছে চারদিকে, কত মেলামেশার অবকাশ। নতুন কোন দিগন্ত খুলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে রোজকার এই রোজগারের নামে গুণ টেনে টেনে চলা। সারা বছর টানা বিয়োগ করে চলতে হয়েছে, যোগ করার সুযোগ পাননি। মনে হচ্ছে সেই দুর্যোগ বুঝি কেটে গেল। প্যাণ্ডেল আলোয় আলো—ক্যাণ্ডল জ্বালাতে হয়নি,—এ ক'দিন লোডশেডিংও হয় না, সবই প্রসন্ন।

কিন্তু সামনের বাঁকেই বিষণ্ণতা দাঁড়িয়ে আছে, দুর্যোগ কাটেনি, শুধু কেটেছে আপনার কপাল। এর পরেই আবার সেই ধারের জন্য ধরাধরি। একদিন নয়, প্রতিদিনই শুধু ঋণ। ঋণই তখন আয়ের একমাত্র উপায়।

পুজোয় শুধু জামা-কাপড় কিনলেই চলে না. শারদীয় সাহিত্যও কিনতে হয়। সারা বছর বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বই পড়ার অভ্যাসই চলে গেছে, তবু পুজোসংখ্যা না কিনলে মুখ দেখানো যায় না যে! যদিও একথা আর অজানা নেই যে সব জানা লেখকদের সবচেয়ে খারাপ লেখাগুলোই পুজোর জন্য তোলা থাকে। আশ্চর্য, তারই জন্য ও'রা তোলা পান সবচেয়ে বেশি।

সব পুজোসংখ্যার চেহারা একই রকম হয়ে থাকে। দুর্গার নামে লেখা একটি পাতা উল্টে-যাওয়া প্রবন্ধ দিয়ে শুরু, তার পরেই উপন্যাসের নামে টেনে বাড়ানো-গল্প। দুর্গা এবং চিত্রতারকার রঙিন ছবি। দুর্গা দুর্গা।

পুজোর দিনগুলোতে আর দৌড়োদৌড়ি চাইনা কেউ। এই সময়টা মিলখা সিংয়ের মত নয়, রিল্যাক্‌সিংয়ের মতোই কাটুক। ঘুম ভেঙে উঠে ফিরিয়ে দেবেন যত বিরক্তি। তার পরে বসবেন টাটকা চা আর বাসি খবর নিয়ে। কাগজের সব খবরই আগের দিনের. সুতরাং সেগুলো বাসি ছাড়া আর কি? অবিশ্যি সব কাগজ তো বেরোয় না এই কদিন।

এর পরে বউ পাঠাবে বাজারে। ধমক না দিয়ে নরম গলায় বলবে ভালমন্দ নিয়ে আসতে। গলা-কাটা দাম হলেও সে মাছ খেতে গলায় কাঁটা বিঁধবে না আজ। ছেলে-বৌয়ের মুখে দেখবেন দেবদুর্লভ হাসি। দেবতারই লভ্য যা। দেবী দুর্গার বরে আপনায় দেবী আজ চামুণ্ডা নন। জুৎ করে খানা সেরে নিয়ে একখানা পুজোসংখ্যা পড়তে বসবেন। আপনার বউয়ের হাতে আরেকখানা। অনেকদিন বাদে আপনি স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। নিষ্ঠার সঙ্গে সংলাপ উচ্চারণ করে দেখবেন, আজ মনে হয় আপনার স্ত্রী ঝাঁকিয়ে কথা বলবেন না। বেটার মনে হবে বেটার-হাফ্‌কে। দু-একটা পুরনো দিনের বেতারে শোনা গানও দু'কলি গেয়ে উঠতে পারেন। সাহস বেড়ে গেলে বৌকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বেরোতে পারেন একবার। আলোর মালায় গাঁথা পথে নিজের বৌকে কেমন যেন অন্যের বৌ বলে ভুল হয়ে যাবে বার বার। মনে হবে যে কথাটা একে বলতে চান তা এখনো বলা হয়নি। আপনার বৌ-ও সদয় চোখে তাকাবে আপনার দিকে, তারও মনে হবে লোকটা নেহাৎ মন্দ নয়।

রাতে চাঁদ উঠবে এক টুকরো। তার নিচে শুয়ে টুকরো টুকরো স্বপ্ন দেখবেন আপনি। পুজো এখনো শেষ হয়নি।

তবু বিজয়া এসে পড়বে। শুধু ছুটি ফুরোবে তাই নয়, জুড়িয়ে যাবে এক মুঠি আশ্বাস। এক পলকেই শেষ হয়ে যাবে এক ঝলক হাওয়া। এখন থেকে আবার নিঃশ্বাস পড়বে দ্রুত, বিশ্বাস হবে চ্যুত।

বিজয়ার দিন কি করবেন আপনি? রোজ যে আপনাকে ভাত বেড়ে দেয়, তাকে এখনো বেড়ে লাগছে, তবু তাকে ছেড়ে চলে আসুন পুরনো বন্ধুর বাড়িতে। তার সঙ্গে এককালে পুজোয় বেরিয়ে পড়তেন প্রতিমা দেখতে। আসলে পাড়ার প্রতিমার মত মেয়েদের অনুসরণ করতেন শুধু। কখনো কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে পারেন নি, আজকের মত এসব তখন অনায়াস ছিল না। ঘুরতে ঘুরতে আপনাকে বার বার দেখতে দেখতে তারা নিজেদের মধ্যে হেসে উঠত জলতরঙ্গ বাজিয়ে। মনে হত ওরা আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, তবু পালিয়ে যেতে পারেন নি। কি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে পরের পুজোয় আবার গিয়েছেন একই ভাবে। আজ তারা সবাই আর কারে ভালবাসে। তবু একবার একটি মেয়ে আপনার দিকে চেয়ে হেসেছে, সেই পুজোতেই সে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছিল। তৎক্ষণাৎ আপনার ধমনীতে আপনি রক্তের গর্জন শুনেছিলেন। বন্ধুর সঙ্গে সেই কথার স্মৃতিচারণা করতে গিয়েই বুকের মধ্যে পুজোর সেই ঢাকটা আবার বেজে উঠবে।

শারদা থেকে সারদা

পুজো আসছে বললে আমরা দুর্গাপুজোই বুঝি প্রথমে। পরে টের পাই যে মা দুর্গা তাঁর সঙ্গে যে ক'জনকে নিয়ে আসেন, তাঁদের সবাইকে আলাদা করে পুজো না দেওয়া পর্যন্ত এই পুজোর সীজন কাটে না আমাদের জীবন থেকে। বর্ষা যেমন আষাঢ়ে এসে আশ্বিন পর্যন্ত থেকে যায়, পুজোও তেমনি আশ্বিনে শুরু হয়ে মাঘ পর্যন্ত গড়ায়। তাতেই গড়াগড়ি খেতে হয় আমাদের। এক পুজোয় যে টাকাটা অ্যাডভান্স নিয়েছি, তা শোধ হবার আগেই পরের বারের পুজো এসে যায়। একটু অ্যাডভান্সই আসে। সময় দেয় না। বারো মাসের বদলে এগারো মাসের মাথাতেই পুজোর আগমন—ফল ছত্রভঙ্গ। আমাদের জীবন বলুন, সংসার বলুন, সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুরনো ধার থেকে নতুন ধারের ধারণা।

আশ্বিনে বর্ষা চলে গেলেও ভরসা হয় না, কারণ তখন শুধু যে আকাশ ফরসা হয় তাই নয়, আমাদের পকেটও ফরসা হয়ে যায়। একটি বালক অবশ্য পকেট ফরসা হলেও খুশি হয়েছিল। সে একটি শ্যামবর্ণ বালক—রাস্তার ধারে পয়সা ফেলে বাজি ধরেছিল সে। বাজির ঘুঁটি চেলে বাজিকর বলে উঠেছিল—এহে—ফ-র-সা। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আবার পয়সা দিয়ে বলেছিল, আরেকবার বল ভাই—ফ-র-সা, শুনি একবার। আমার মা'ও আমাকে ফরসা বলতে পারে না।

পুজোয় এখন অনেক খরচ। শুধু মোটা চাঁদা দিয়েই রেহাই পাবেন এমন নয়, পাড়ার ছেলেরা এসে আবদার ধরবে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দেবার জন্য। অফিসে একে ওকে ধরে একটা এনে দিতেই হবে। অফিসে এমনিতেই আপনার অবস্থা খারাপ, মানে যাকে বলে পজিশন ঢিলে, এখন বিজ্ঞাপন চাইতে যাওয়া আপনার পক্ষে সঙ্গত হবে না, তবু সম্মত না হয়ে উপায় থাকে না।

দুর্গাপুজো বাবদে শাড়ি জামা কিনে আপনার হামা দেবার মত অবস্থা হয়ে এসেছে, বৌ ছেলেমেয়ে আর শ্বশুরবাড়ির বস্ত্র সমস্যার সমাধান করে নিজের জন্য একটি রুমাল কিনতে পেরেছেন শুধু। তাই দিয়ে চোখের জল মুছে আর পুজোর ভোগ খেয়ে কাটাবেন ভেবেছেন, কিন্তু আপনার ভোগ কাটেনি এখনো। বৌ বায়না ধরেছে, পুজোয় কোথাও বেড়িয়ে আসি

চলো। আপনি বলতে পারতেন, আয়না কি দেখো? তাহলে আর এই আহ্লাদে বায়না করতে না। অবশ্য বলার সাহস হবে না আপনার বরং ঐ রুমাল দিয়েই কপালের ঘাম মুছে বেরিয়েছেন খোঁজ নিতে, কোথায় যাওয়া যায়। যাওয়া তো শুধু যাওয়ার জন্য নয়, বলার জন্য। এবারে কোথায় যাচ্ছেন, এই কথা যদি বলতে না পারলেন, তাহলে তো যাবার মজাই রইল না। যাবার ফিফটি পার্সেন্ট মজা তো বলায়। তাই নিয়ে বলাবলি করবে সবাই। সেজন্য দূরের কোন বড় জায়গা বলতে না পারলে ছোট হয়ে যেতে হয়। বনে না গিয়ে যেতে হয় বম্বে। দিল্লি না গেলে ইল্লি শুনতে হবে।

যে বৌকে বিয়ের দিন মধুর এক চন্দ্রিমা মনে হয়েছিল, মধুচন্দ্রিমার পরেই তার মুখ থেকে সব মধু ঝরে গিয়েছে। আপনার মতো বে-আক্কেলে, বে-তরিবৎ, বে-ফায়দা মানুষকে তার ঘাড়ে বেমক্কা গছানো হয়েছে, নিত্য সে এই অভিযোগ করে নৃত্য ক'রে থাকে। তবু তার দাবিতে ঘরে চাবি দিয়ে বেরোতে হবে বেড়াতে। পুজোয় আপনার পকেট কেটে শাড়ির প্যাকেট এসেছে, পাড়ায় মোটা চাঁদা দিতে গিয়ে কাঁদাকাটা করেছেন, রেহাই মেলেনি। এখন বৌয়ের সঙ্গে তেহাই দিচ্ছে ছেলেমেয়েরা। বেড়াতে চলো। কোথায় যাবেন? এক রাঁচি যাওয়া যায়। গেলে আর আসতে হয় না। এখানে থেকে পাগল হওয়ার চেয়ে, পাগল হয়ে ওখানে থাকা বরং ভাল। পুজোর আগে যা পেয়েছেন, পুজোর পরে তাব চেয়ে বেশি বেরিয়ে গেল। পকেট ফাঁক করে ফাঁকিতেই পড়লেন। এখন রাঁচি গেলেও হয়, করাচি গেলেও হয়। দু'জায়গা থেকেই ফেরার ভাবনা ভাবতে হবে না।

অগত্যা শারদা মা দুর্গার মেয়ে লক্ষ্মীর পুজোর আয়োজনে নামলেন লক্ষ্মীলাভের আশায়। সে আশা অবশ্য তামাশায় পরিণত হল যখন দেখলেন যে এ পুজো করলে ধনলাভ হয় বটে তবে ধনলাভ না করলে এ পুজো করা যায় না। এ বাজারে দাম যা চড়েছে, তা দেখে আপনার মেজাজ চড়েছে আরো বেশি। কিন্তু আর পিছোবার উপায় নেই। দুর্গার বেলায় মায়ের সামনে তবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিয়েছেন, এখন মেয়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়া ছাড়া আপনি কি করতে পারেন? তিনি যদি দাঁড় করিয়ে দেন, তবেই আবার দাঁড়াতে পারবেন।

এরপরে পায়ে পায়ে এসে গেল কালীপুজো। যেন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে এল। মাসের ২০ তারিখ হয়ে গেছে। গত মাসের মাইনে ফুরিয়ে গেছে ১০ দিন আগে, পরের মাসের মাইনে পেতে আরো ১০ দিন বাকি। এখন শুধু বাকিতে চলছে। তবু দর না করেই কিনতে হল বাজি। এটাই এর দস্তুর। প্রায় ভোজবাজির মত উড়ে আর পুড়ে গেল টাকা।

তারপরে কী কারণে কে জানে, বারোয়ারিতলায় কারণ পান করতে বসল বারো দুগুণে চব্বিশটি ছোকরা। চব্বিশের পর আর গোণা যায়নি, চব্বিশ পরগণাতেও সেই (অ) কারণ উৎসব শেষ হয়নি। জেলায় জেলায় জ্বালা ধরাতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সারা রাত বাজির শব্দকল্পদ্রুম শুনতে শুনতে ভাল ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে একটু চোখ দুটো লেগে গিয়েছিল। রাত না পোয়াতেই বৌ আপনার খুতনিতে গুঁতুনি দেবে—ভাইফোঁটার কী ব্যবস্থা করলে? চিরকাল নিজের ভাইফোঁটা হয়ে এসেছে একটি প্রদীপ আর দুটি সন্দেশ দিয়ে। চন্দনের

ফোঁটা কেটে বসতে কি মজাই না ছিল। আর আজ যেন আপনাকেই কেটে বসছে কেউ। বৌ ভাইফোঁটা দেবে, তার জন্য চিলি চিকেন, মাটন পোলাও। রাবড়ি খাওয়া হবে সাবড়ে। সব শেষে কালাকাঁদ। কালামুখী, আর কত কাঁদাবি?

মা দুর্গার সঙ্গে এসেছিলেন কার্ত্তিক ঠাকুর। এবার তাঁর একলা পুজো। কার্ত্তিক ঠাকুর হ্যাংলা, একবার আসেন মায়ের সঙ্গে, একবার আসেন একলা। এও বোধহয় চাঁদার আওতায় পড়তে চলেছে। হয়তো আর দু-এক বছরের

মধ্যেই পাড়ার কার্ত্তিকের মত ছেলেরা এসে ফিল্মস্টারের কায়দায় চাঁদা চাইবে। দেব-সেনাপতির সেনাদের দেব-দিচ্ছি বলে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

ওরই মধ্যে মা নিজে একবার জগদ্ধাত্রী সেজে আর এক পালা পুজোর গাওনা গেয়ে নিলেন। এ পুজোর পালা মহানগরে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি চন্দননগরে। বৌ ধরেছে, সেখানে গিয়ে পুজো দেখবে। সেখানে ছোট কেউ নয়, সব বড়ো বড়ো প্রতিমা। ছোটো সেখানে। দেখো আলোর রোশনাই। পুজোর বোল বোলাও। নিজের বোল আর বোলাতে হচ্ছে না। প্রতিটি প্রতিমার কাছেই 'মা' 'মা' বলে ডেকেছেন, বলেছেন, ডেকে নাও মা, আর যে পারি না। মা ডাকেননি, বৌ ডেকে নিয়ে গিয়েছে বাড়িতে। আপনার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে সে। সেই সঙ্গে আপনাকেও সেদ্ধ করছে যে।

শুধু পুজোতেই শেষ নয়। এর পরে আছে ফাংশন। বিজয়ার পরে বিজয়া সম্মিলনী। প্রণামের পরে মিষ্টিমুখ। পরিশেষের পরে পুনশ্চ। এর জন্যেও দিতে হবে গচ্চা। অনুষ্ঠান শুরু হবে হেমন্তের এক সন্ধ্যাবেলা। কোনদিনই এখানে হেমন্ত বা সন্ধ্যা গাইতে আসেননি, এসেছে তারাই যারা এঁদের গলা নকল করতে পারে। তাদের কোন নিজস্ব নাম নেই, তারা অমুক কণ্ঠ বা তমুক কণ্ঠী। দুনিম্বরী খেলায় মেতে উঠেছে সবাই। তাতেই সবাই খুশি। দুধের বদলে পিটুলিগোলা খেয়েই মনে হচ্ছে দুধ খেলাম। আসলে খেলাম ঘোল। আসরে টুনি বালব না লাগালে পিটুনি দেবে কর্মকর্তারা। বড়ো আলো তারা চায় না। বড়ো কিছুই আর চাই না, শুধু নোট্‌টা চাই বড়ো দেখে।

ফাংশানে যে গান শুনবেন, তা শুনে মেসিনগান তুলে নিতে ইচ্ছে হবে আপনার। গান যে শোনে না, সে নাকি খুন করতে পারে। কিন্তু এমন গানও আছে, যা শোনামাত্রই খুন করতে ইচ্ছে হয়। মনে হবে মায়ের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল যে অসুর, এখানে তারই পুজো হচ্ছে। মা দুর্গার চালচিত্রের মধ্যে সে এতদিন স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে, এতদিনে সে বেরিয়ে পড়েছে মার মার করতে করতে।

এসবে নজর না দিয়ে আপনি যদি অসংখ্য পুজো সংখ্যার একটি নিয়ে পড়তে বসেন তবে আপনার শেষ শিক্ষা হয়ে যাবে। ফিনফিনে পাতা, হাত লাগলেই ছিঁড়ে যায়, লেখার চেয়ে বেশি আছে বিজ্ঞাপন, দাম শুনেই নাড়ি ছেড়ে যাবে। পড়তে দিলে আপনাকে ছেড়ে যাবে আপনার নারী। কারণ আনাড়ির মতো যে সংখ্যাটা এনেছেন, সেটি অত্যন্ত বাজে। বৌ জানে না যে এর চেয়ে ভাল সংখ্যা বেরোয় না পুজোয়। লেখার মান এখন

এইরকমই। অভিমান করে লাভ নেই। দু'নম্বরী হিসেবের মতো সাহিত্যও এখন দু'নম্বরী বস্তু। প্রথম নম্বর হল বিজ্ঞাপন। *সাহিত্যের এখন স্পনসর চাই। নতুবা সে স্পন্ডিলাইটিস হয়ে ধুঁকবে। যেদিন গল্প পাওয়া যাবে,* অথচ বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না, সেদিন পত্রিকাও বেরোবে না। শুধু বিজ্ঞাপন ছাপিয়েও বেরোতে পারে কাগজ—লেখা পেলেও হয়, না পেলেও হয়। আগে ছিল লেখার ফাঁকে বিজ্ঞাপন, এখন বিজ্ঞাপনের ফাঁকে লেখা। এই ফাঁকে ট্যাঁক ফাঁক করা।

এখনো গণেশ আর সরস্বতী বাকী রয়ে গেছেন। গণেশ যদিও সিদ্ধিদাতা, তবু আমরা এ পুজোয় তেমন নামিনি। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হালখাতা, মানে ব্যবসা। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী আমরা বলি বটে, কিন্তু করি না। ব্যবসায়ী ছেলের বিয়ে হয় না, মেয়ে জোটে না। তবে ভক্তিতে না হোক, ভয়েই একদিন গণেশ পুজোয় নামতে হবে। খেতে না পেলে ক্ষেতে-খামারে ব্যবসায়ে নামবে সবাই। তখন ঐ-হাতির শুঁড়েই নিউ থিয়েটার্সের মত সিদ্ধি কামনা শুরু হবে সুর সুর করে।

আবার একটা ঢেউ উঠবে সরস্বতী পুজোয়। শারদা মায়ের শেষ মেয়ে মা সারদা। এতদিন পুজো করেছে বড়রা। এবারে ছোটদেরই বড়ো পার্ট। 'স্বরস্বতী' বানান লিখে প্যান্ডেল বানাতে বসেছে তারা। বড়রা এতে নেই। বড়রা লেখাপড়া ছেড়েছে, ছোটরা লেখাপড়া ধরেনি। তবু পুজো ছাড়েনি তারা। পুজো করতে করতে যদি পড়ায় মন আসে। ততদিন এত পুজো দেখে আপনি ঢোঁক গিললেও আপনাকে ছাড়বে না এরা। ছেঁকে ধরবে সবাই। ছেঁকে নেবে আপনার মানিব্যাগ। মানি না বললেও চলবে না। আপনি ভাববেন, এত যদি বাণীবন্দনা, তবে বিদ্যার কেন কোরবানি এদেশে।

এ জন্মে শুধু বন্দনা—তাও তো মন্দ না। সাধনা কি পরজন্মে?

লুক বিফোর দি লীপ

ইংরেজিতে একটা কথা আছে Look before the leap—এই বাক্যটির ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছিলেন দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল। তাঁর গল্পে নায়ককে বাগড়া দিয়েছিল যে, তার নাম ছিল দিলীপ। তখন নায়কের প্রতিক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে লেখক বলেছিলেন, ইংরেজি ঐ কথাটার মানে হল দিলীপের দিকে নজর রাখো! ঐ দিলীপই ঝামেলা করবে।

তখন হেসেছিলাম। The leap কে দিলীপ বানিয়ে দেওয়ায় মজা পেয়েছিলাম। এখন কিন্তু মনে হয় অনেকটা ঠিকই বলেছিলেন সান্যাল মশাই। আমার নিজের জীবনেই দেখে শিখলাম এটা। দেখে এবং ঠেকে। সবসময়েই আমাকে যে ঠকাতে চেষ্টা করেছে তার নাম দিলীপ। এত নিরীহ নাম হয় যাদের, তাদের হাতেই আমাদের নিগ্রহ। এক এক করে বলি।

কলেজে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে আমার পার্টনারের নাম ছিল দিলীপ। অনেক বুদ্ধিমানের সঙ্গে আরো অনেক বোকার মত আমিও বিজ্ঞান পড়তে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এতে জীবনে বড়ো Leap দেওয়া যাবে। বিরাট লাফে টাকার পাহাড়ে উঠব। লাফ দিলে যে হাত পা ভাঙতে পারে এটা ভাবিনি। যাই হোক, দিলীপ আমার পার্টনার। কিন্তু সে কিছুই করে না। সব আমি করি। ক্লাসে ইনস্ট্রুমেন্ট সাজানো, পরে সেগুলি গুছিয়ে তোলা, খাতা লেখা, এসমস্ত খুঁটিনাটি আমাকেই করতে হয়। দিলীপ ক্লাসে আসে, একটু-আধটু এক্সপেরিমেন্ট করে,—ব্যস। আর ফাঁক পেলেই ওর বোনের গল্প করে। সে যে কত সুন্দর দেখতে, কত সুন্দর কথা বলে, কবিতা বলে কি সুন্দর ইত্যাদি। আমার মনে হতো ও যেন আমার সামনে টোপ ফেলছে, যাতে আমি পাত্রী পছন্দ করি। আমি অবশ্য মনে মনে টোপ গিলেই ফেলেছি, তাই ল্যাবরেটরির সব কাজ আমিই করি। দিলীপকে খাটতে দিই না। আমি রোজই ভাবি এইবারে দিলীপ ওর বোনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। দুয়েকবার ওর বাড়িতেও গিয়েছি। ওর বোনের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছি মায়ের সঙ্গে মাসির বাড়ি গিয়েছে।

মায়ের কাছে মাসির গল্প, এই কথাটা আমার মনে হওয়া উচিত ছিল

য়েনি। কারণ আমি তখন বন্ধুর মুখে বোনের গল্প শুনতেই ব্যাকুল হয়ে আছি।

এইভাবে দু'বছর কেটে গেল। এর মধ্যে দিলীপের ল্যাবরেটরি খাতা লিখে দিয়েছি, ভারি ভারি ইনস্ট্রুমেণ্ট একাই বয়ে নিয়ে এসেছি, আবার তুলে রেখে দিয়েছি। পরীক্ষা এসে গেল। এখন আর কোনদিকে তাকাবার সময় নেই। তখনকার মত দিলীপের বোনের কথা শিকেয় তুলে রেখেছি। এইভাবে পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষার পরে একদিন রাস্তায় দিলীপের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে একটি বাচ্চা মেয়ে। বললাম, 'এ কেরে?' দিলীপ বলল, 'এই ত আমার বোন। এবারে ক্লাশ থিুতে উঠবে। ভাল কবিতা বলে। শুনবি?'

বললাম, 'না, থাক। আজ নয়।'

এরপরে যে দিলীপের কথা বলব তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কারখানায়। বিজ্ঞান পড়ে কারখানাতেই ঢুকতে হল। লোহাতেই নাকি পয়সা। লোহা কেটে সোনা। অবশ্য তা শোনা কথা হয়েই রইল। ঐ কারখানায় দিলীপ বলে একটি ছেলে কাজ করত। চুপচাপ বসে থাকত সে। একমনে কাজ করে যেত। কথা বললেও উত্তর দিত না। শুনলাম, ও পাগল। কেউ ওকে ঘাটায় না। দেখতাম প্রচণ্ড রোদ্দুরে যখন কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না, বেরোলেও ছায়া খুঁজছে, তখন দিলীপ বাইরে মাঠের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে। পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলেও ও তাকায় না, যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেছে। কেউ ওকে ডাকলেও ও উত্তর দেয় না। খুব স্বচ্ছন্দে ও ঠা-ঠা রোদ্দুরে বসে থাকে।

এই দিলীপ আমায় একবার কেমন বেইজ্জৎ করল, সেইটে বলি। সব কারখানায় যেমন হয়ে থাকে, আমাদের কারখানাতেও সেইরকম ধর্মঘট হয়েছে। চলছে বহুদিন ধরে। খুব জটিল অবস্থা। নানা আলাপ আলোচনা চলছে, তবু কিছু স্থির হতে পারেনি। এই সময়ে একদিন রাস্তার মোড়ে দিলীপের সঙ্গে দেখা। দাড়ি কামায়নি, ও অবশ্য প্রায়ই কামাত না, সার্ট-প্যাণ্টের মূল রং কি ছিল তা এখন আর চেনার উপায় নেই, ও যে পাগল তা এখন আর কাউকে বলে দিতে হয় না। চুলে তেল নেই, হাঁটার স্টেপগুলো স্বাভাবিক নয়। আমার সঙ্গে আমার শ্যালিকা। সেজেগুজে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। দিলীপের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। হঠাৎ দিলীপ এগিয়ে এল, 'কি খবর? কারখানার খবর দিতে পার?' আমি দ্রুত এগোতে এগোতে বললাম, 'এবারে বোধহয় খুলবে।' দিলীপ বলল, 'খুলবে? কি যে বল তুমি? ওইজন্যই তো তোমাকে আমরা পাগল বলি।' শুনে আমি হাঁ, আমার শ্যালিকাও তদ্রূপ। এ খবর আমার

বৌয়ের কাছে গেলে যে কি হবে কে জানে। বৌ অবশ্য আমায় পাগল বলে না, ছাগল বলে। এরপরে সোজাসুজি পাগল ছাগল বলবে। পাগলেই যখন আমায় পাগল বলছে, তখন বৌ তো বলবেই।

আমি যাকে বিয়ে করেছি, তাকে নাকি এক ব্যক্তি একবার রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিল। আমার বৌ যে হবে, সে সেখানে গিয়ে ঐ ব্যক্তির চেহারার প্রশংসা করেছে, তার আবৃত্তির সুখ্যাতি করেছে। তার নামও দিলীপ। মুগ্ধ হয়ে সে আরো খাবারের অর্ডার দিয়েছে। আমার বৌ যে হবে, সে সেইসব খাবার আরাম করে খেয়েছে আর দিলীপের দিকে তাকিয়ে
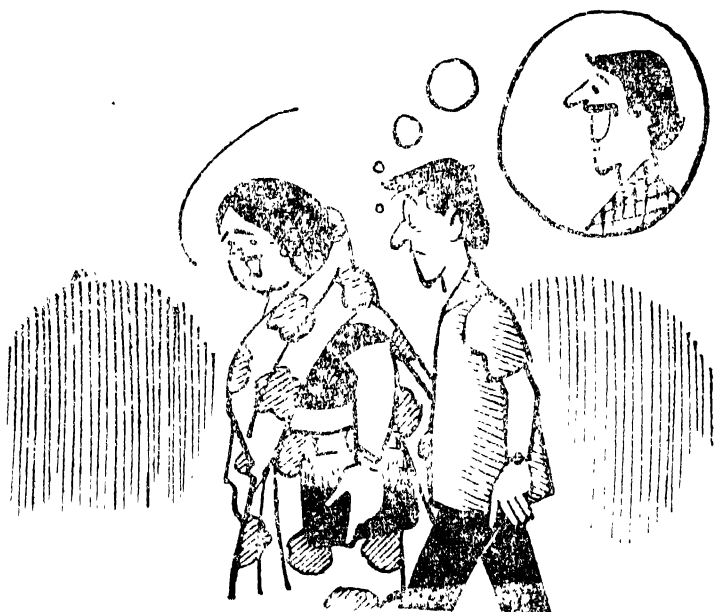
হেসে হেসে গল্প করে গিয়েছে। দিলীপ দুয়েকটা কবিতা শুনিয়েছে। আমার বৌকে বলেছে, তোমাকে ভারি সুন্দর দেখতে। তখনো সে আমার বৌ হয়নি যদিও, তবে হবে তো। তবু শেষরক্ষা করতে পারল কি?

শেষ পর্যন্ত দিলীপ আর থাকতে পারেনি, ঝট করে হাত ধরেছে আমার বৌয়ের। মানে যে আমার বৌ হবে, তার। আমার হবু বৌ যেন কিছুই বুঝতে পারেনি এইভাবে আরেকটা কাটলেট খেতে চেয়েছে। নতুন অর্ডার দেবার জন্য দিলীপকে হাত তুলে নিতে হয়েছে বৌয়ের হাত থেকে। আবার খানিকটা কথা চালাতে চালাতে সে আবার হাতটা ধরেছে আমার যে বৌ হবে তার। এবারে আর ভুল নেই। এই হাত ধরার অন্য মানে হয় না।

এখন মানে মানে দুজনে হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেই হয়। আমার বৌ (যে হবে আর কি) যথেষ্ট চালু। এইরকম এ্যাগ্রেসিভ্ লোক নিয়ে তার চলবে না। তার আমার মত একটি গবেট চাই। এমন লোককে চাই যার আমার মত নিরেট মাথা। তাই দিলীপকে সে এগোতে দেবে না ঠিক করল। অথচ সোজাসুজি ফিরিয়েও দিল না। হাতে রাখল। কে যে কখন কাজ দেয় তাকে জানে! সে দিলীপকে বলল সবিস্ময়ে, 'আপনি হাতটা ছাড়ুন দি-লী-প-দা। কে দেখে ফেলবে।' দিলীপ একটু থতমত খেল। তবু শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ভালবাস।' আমার ঘাড়ে পড়বে যে বৌ, সে এমনভাবে হাসল, যার মানে বোঝা দিলীপের কম্ম নয়। অর্থাৎ এখনই হ্যাঁ বলতে পারছি না। পরে খবর দেব।

ব্যাপারটা বুঝলেন আপনারা? দিলীপ যে আমার বৌয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিল, আমি তাতে দোষ ধরছি না, করতে পারলে আমি তাকে বাহবাই দিতাম, কিন্তু হল কি? ঐভাবে সে আমার বৌয়ের দরটা নাহক বাড়িয়ে দিল। এখনো আমার বৌ আমাকে শোনায় যে দিলীপ তার প্রেমিক ছিল। দিলীপ নিজে প্রেম করতেও পারল না, শুধু ছোঁকছোঁক করে ঘুরল—এতে দিলীপের মোটিভটা কি গোলমেলে মনে হচ্ছে না? বিয়ের পরেও সে আমার বৌয়ের সঙ্গে খাতির জমাতে চেয়েছে। তখন তাহলে জলে নামলেও চুল ভিজবে না। মাঝখান থেকে বৌয়ের হাতে আমার হেনস্থা চলছেই। ঐ দিলীপের গুণে? না কি দিলীপের দোষে? গুণ হইয়া দোষ হইল দিলীপের বিদ্যায়। কপালে লিখিতং ঝ্যাটা, কোন শালা কিং করিষ্যতি।

দিলীপ নামটা খুব ডিসেপ্টিভ্। শুনলেই মনে হয় নিরীহ যুবক যেন। অথবা বোকাসোকা কিশোর। কিন্তু দিলীপও তো বৃদ্ধ হয়। তখন তার ছলনা কেমনতর? সে তখন পাড়ার পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট অথবা বে-পাড়ার পাঠাগারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তখন তার ভাইস্ থাকবে না, এমন তো নয়। চেহারা বদলাবে, তবে বদলা নেবার জন্য সে ফন্দি আঁটবেই। দিলীপ যখন কিশোর, তখনো সে অতিষ্ঠ করেছে, বয়স হলে সে গজ্গজ্ করবে, তবে গজের চাল দিতে চাইবেই।

এসব অবশ্য দিলীপ যার নাম নয়, সেও করতে পারে। তবে দিলীপ নামটাই ভারি সুবিধের। এ নাম যার, তাকে কখনোই আপনার বিশেষ কেউ বলে মনে হবে না। কারখানার কারিগর, ব্লকের মাস্তান, বান্ধবীর ভাই, স্কুলের শিক্ষক বা কেরাণী, কলেজের অধ্যাপক বা বেয়ারা, ছবির পরিচালক বা অভিনেতা বা মেকাপম্যান, কিছুই হতে তার বাধা নেই। পাগল কিংবা মতলববাজ হতেও তার আটকাচ্ছে না। দিলীপকে বিশ্বাস করা মুস্কিল।

ক্রিকেটের দখল অথবা ধকল

আপনি যদি শীতকালের মেলা, কার্নিভাল পিকনিক, ফ্যান্সি ড্রেস, খানিকটা সার্কাস, এই সমস্ত বস্তু এক সঙ্গে পেতে চান তবে ক্রিকেট টেস্ট দেখতে গেলেই সব পেয়ে যাবেন। যে বছর ইডেনে টেস্ট ম্যাচ থাকে না, সে বছরে বহু বুড়োবুড়ি এবং অনেক ছোঁড়াছুঁড়ির মন খারাপ হয়ে যায়। পাঁচ দিন ধরে এমন মোচ্ছব আর কোথায় পাওয়া যাবে।

ধরুন খেলা শুরুর মুহূর্তে আপনি যদি না পেঁছিতে পারেন এবং সেদিন যদি ভারতের ব্যাটিং থাকে, তাহলে একটা ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনি। যদি আপনার মাঠে ঢুকতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে হয়তো শ্রীকান্ত, আজাহার, রবি শাস্ত্রী আউট হয়ে গেছে। তার মানে আপনি এদের তিনজনের ব্যাটিং দেখতে পেলেন না। এ জন্য আপনার মাঠে যাওয়ার তাড়া অফিস যাওয়ার চেয়েও বেশি। ভোরে উঠে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে নিতে হবে লাঞ্চ—ভালো জাতের খাবার। সবার সামনে খেতে হবে তো। এছাড়া চায়ের ফ্লাস্ক, কিছু স্ন্যাকস, এসবও চাই। মাঠে গেলে মনে হবে বিরাট পিকনিকের আসর বসেছে বুঝি। কত রকমের খাওয়া-দাওয়া, কত লোক, কত হৈ, হৈ। জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক, টিফিন ক্যারিয়ার। কেউ কেউ জলের বোতলে চুপি চুপি রাম ঢেলে নিয়ে আসেন। বোতলে ডোবানো স্ট্র দিয়ে রাম টানতে টানতে খেলা দেখেন। পাশে বসা লোকটি ভাবছেন যে উনি মাঝে মাঝে জল খাচ্ছেন বুঝি। জলের বদলে এই কায়দা করে ঘোল খাওয়ার এমন প্রশস্ত পরিসর আর কই?

মাঠে ঢুকলেই আপনার মন ভাল হয়ে যাবে। বাইরে দেখে এসেছেন কত গাড়ি পার্কিং করা হয়েছে। শীতকাল, তাই ভালোভাবে সেজে এসেছেন সবাই। বাস থেকে নামলেও আপাতত ক'ঘণ্টা ঐ গাড়িওয়ালাদের সঙ্গেই বসবাস করবেন আপনি। ভুলে যাবেন সংসারের অসার জীবনযাত্রা। মাঠের ভেতরে স্টেডিয়ামের ওপরের দিকে দাঁড়ালে পুরো মাঠটার একটা বার্ডস-আই ভিউ পাবেন। দেখতে পাবেন গোল স্টেডিয়ামের সব সীটই ভর্তি। কত লোক, কত স্ত্রীলোক, কত রং। বেরং কিছু নেই। আমি তো মাঠে যেতাম খেতে আর দেখতে। এত ধরনের মহিলারা আসেন যে পুলকিত না

হয়ে পারি না। একজনের কার্ডিগান, অন্য জনের নয়নবাণ, কারো বা শাড়ির আঁচল, কারো বা শালোয়ার কামিজ। কেউ সিঁদুর পরেও পাশে, কেউ শাদা সিঁথিতেও সুন্দরে। কারো হাতে উল, কারো কানে দুল। কেউ সোয়েটার বুনছেন, কেউ ম্যাগাজিন পড়ছেন। কারো ম্যাচিং লিপস্টিক, কারো ক্যাচিং আই-ল্যাশ। ক্রিকেট মাঠে পাঁচ দিন পর পর এসে তারপরে পরস্পর প্রেমে পড়েছে কোন ছেলেমেয়ে এমন গল্প কেউ লেখে নি কেন জানি না। অথচ এমন প্রেম তো হতেই পারে। আমি তো মাঠে গেলে বাঁশবনে ডোমকানা হয়ে যাই। যার পাশে যাই তারেই লাগে ভালো।

একটার পর একটা দেখি, একটার পর আরেকটা ওভারল্যাপ করে যায়—সারাদিনে বোধহয় শ'তিনেক মেয়ের প্রেমে পড়ে যাই আমি। এদের সবাইকেই আমি বিয়ে করতে পারতাম, যদি আগে টেস্ট খেলা দেখতে ইডেনে আসতাম। তার বদলে যাকে বিয়ে করেছি, বাড়িতে সে অপেক্ষা করে আছে—দু'হাতে ফর্দ, মুখেতে কটুভাষ। প্রথম যখন দেখি তখন এত নিরীহ দেখেছিলাম যে মনে হয়েছিল আমি বিয়ে না করলে এর আর বিয়েই

হবে না। সেই নিরীহ এখন অবতার বদলে হয়েছে বরাহ। তার গুঁতো খেতেই বেঁচে আছি।

আমার এই বৌ-ও ক্রিকেট খেলা দেখে। তবে আমার সঙ্গে নয়। কারণ আমায় সঙ্গে দেখে সুখ পাওয়া যায় না, আমি তো খেলাটা বুঝি না কিছুই।

এটা অবশ্য ঠিক কথা। খেলাটা এবং বৌ আমার আজো বোধগম্য হল না। আমি ডাংগুলি বুঝতে পারি, বল ছুঁড়ে সাজানো ইঁট ভেঙে দিয়ে পিট্টু খেলতে পারি, কিন্তু এ দুয়ে মিলেমিশে বানানো ক্রিকেট খেলাটা বোঝা হল না। এজন্য আমার বৌ খেলা দেখতে যায় বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে। আমার থেকে আলাদা। ওরা বসে স্টেডিয়ামের যে দিকে, আমাকে যেতে হয় ঠিক তার উল্টো দিকে। ওদের মুখে ছায়া, আমার মুখে রোদ। ওদের উপভোগ, আমার দুর্ভোগ। ওদের পাশে বসে ফিল্ম স্টার, আমার পাশে বসে স্টার মাস্তান। ওদের টিফিন কেরিয়ার বইতে হয় আমাকে। ঐ মিশনের কারণেই আমাকে মাঠে যাবার পারমিশান দেয় ওরা। ওরা তো খাবার বইবে না। বড়োজোর বউয়ের হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, বয়ফ্রেণ্ডের হাতে রোল করা স্ন্যাকস। তার বেশি নয়। বৌয়ের চোখে গগলস। আমার বেলায় যে নয়নে উপেক্ষা, ফ্রেণ্ডের বেলায় সেখানে অপেক্ষা। এদের খাবার নিয়ে আমার উল্টোদিকের সীট খুঁজে নিতে হবে। লাঞ্চের আগে শেষ ওভার শেষ হবার আগেই উঠতে হবে ওঁদের কাছে যাবার জন্য। খাবার পরে আবার রওনা হতে হবে উল্টো দিকের সীটে।

তখন দুপুরের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। একে খোঁচা দিয়ে, ওর পা মাড়িয়ে আমি যখন বসলাম, তখন ঐ তল্লাটে সবাই আমায় ছ্যা ছ্যা করছে—'এত বড়ো খাবার জায়গা কেন? আপনি কি এখন খাবার বিক্রি করতে গিয়েছিলেন?' বুঝুন, সবাই ভাবছে আমি খেলা দেখার নাম করে আসলে ব্যবসা করছি। স্টল ভাড়া ফাঁকি দিয়ে এই ফাঁকে রোজগার করছি কিছু। দ্বিতীয় দিন থেকে তাই আমি লাঞ্চের পরে আর মাঠে না ঢুকে বাড়ি চলে যেতাম। ওদের ঐ খেলা তো বুঝিও না। তবে আমি দেখেছি, আমার মতো আরো অনেকেই খেলা বোঝে না। প্রথম দিন কে যেন ব্যাট চালাল সজোরে, আর সে বলটা টপাং করে লুফে নিল কেউ। আউট। সারা মাঠ হায় হায় করল - আরে ওখান দিয়ে কি মারতে হয়? সবাই দেখলাম খেলায় কিভাবে মারা উচিত, তা বোঝে নিখুঁতভাবে, বোঝে না শুধু যারা খেলছে। আমিও ভাবলাম আমারও কিছু বলা উচিত। তাই এদিক ওদিক তাকিয়ে পাশে বসা ভদ্রলোকটিকে বললাম, 'বলটা গালি'র

ভেতর দিয়ে চালানো উচিত ছিল, তাই না ?' ভদ্রলোকও আমার সঙ্গে একমত হলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।'

খানিকক্ষণ পরে আমার মনে হল, দুম করে একটা শোনা কথা বলে তো দিলাম, কিন্তু গালি' কাকে বলে তাই তো জানি না। আমি তো গালি' বলতে গালাগালিই বুঝি। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে বললাম, 'দেখুন শুনে শুনে বলেছি! আসলে আমি কথাটার মানে জানি না। 'গালি কোনটাকে বলে বলুন তো ?' ভদ্রলোক খুব একচোট হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমিও জানি না। আসুন একটা সিগারেট খান।' সেদিনই বুঝেছি আমার মতো আরো অনেক চালিয়াত আছে। যাদের কাছে ক্রিকেট মাঠ আর সার্কাসের তাঁবুতে কোন তফাত নেই। স্রেফ মজা দেখতে আসা। পাড়ায় প্রেস্টিজ রাখা। মাঠে যাচ্ছি, একথা যদি বলতে না পারলেন, তাহলে মাঠময় হয়ে গেল আপনার। তার চেয়ে মাঠে বসে স্যার্কাসের ভেলকি দেখার মত ক্রিকেট দেখি, নইলে কোথাও কল্কে পাওয়া যাবে না। ক্রিকেটে দখল না থাকলেও তাই এই ধকল নিতে হয়।

মাঠে খেলা দেখতে বসেও অনেকে পকেটে নিয়ে আসেন ট্রানজিস্টর। দেখছেন চোখে, শুনছেন কানে। নইলে ও'রা বুঝতেই পারেন না কি হচ্ছে মাঠে। কে খেলছে, কাকে খেলছে। আউট হল, না ডাউট ছিল ? এবারে হয়তো মিনি টিভি আনা হবে। মাঠে বসেও পর্দায় দেখবে সবাই। যেমন সূর্যগ্রহণ দেখিয়েছিল টি ভিতে। আকাশে না দেখে বাকশোতে দেখেছে সবাই। মেয়েরা তো এই ক'দিন বেশ কয়েকটা সোয়েটার বুনে ফেলেন। বোধহয় ও'রা অর্ডার নেন কোনো দোকান থেকে। নয়তো এত সোয়েটার পরে কে ?

যেবারে ইডেনে ক্রিকেট থাকে না কেমন যেন খালি খালি লাগে। যদিও আমি মাঠে যেতে চাই যাতে আমার মাথায় কেউ কাঁঠাল ভাঙতে পারে, মানে আমায় বৌ ঐ সুবাদে বয়-ফ্রেণ্ড নিয়ে মাঠের হাওয়ায় জুড়িয়ে নিতে পারে, তবু আমারও তো আঠা কম নয়। মাঠে কত মেয়েকে দেখে আমিও তো মুগ্ধ হই। পরীর মতো দেখতে ঐসব পরের স্ত্রী-ই তো আমার পরস্ত্রীকাতরতার সুখ।

ক্ষমা করো মোরে কিশোরকুমার

ইস্কুলে থাকতে 'অভিসার' কবিতাটা বোধহয় সকলেই পড়েছেন। দু একটা লাইন শুনলেই মনে পড়ে যাবে কবিতাটা—

ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর
দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিন একটি স্কুলে এই কবিতাটার আবৃত্তি আরেকবার শুনলাম আমি। সেখানে এই লাইনগুলো এইরকম শোনা গেল—

ক্ষমা করো মোরে কিশোর কুমার
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর—
ইত্যাদি।

'কুমার কিশোর' হয়ে গেছে 'কিশোর কুমার।' এটা কেউ ধরতে পারেনি। যে বলছে, সেও না,—যারা শুনছে, তারাও না। এ থেকে বোঝা যায় যে সিনেমা আমাদের জীবনে কেমন প্রভাব ফেলেছে। সবার অজান্তেই কবিতার লাইন বদলে যাচ্ছে, অথচ আমাদের রসবোধে কোন বাধা হচ্ছে না।

সিনেমা এখনকার যুগের নতুন নাম। মা বলার আগেই লোকে সিনেমা বলে এখন। অমিতাভ বুদ্ধকে চেনে না, অমিতাভ বচ্চনকে জানে। সিনেমায় নামার জন্য কত ছেলে বম্বে পালাবার চেষ্টা করেছে এসব আমরা জানি। এখন বোধহয় সেটা কমেছে। তবে সিনেমার চিন্তা লোকের কমেনি। আমার পাশের বাড়ির একটি ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। তাকে বললাম—'কেমন পরীক্ষা হল ?' ছেলেটি বলল—'ভালই।' আমি বললাম—'প্রশ্ন কেমন হয়েছে ?' ছেলেটি বলল—'বাংলা পরীক্ষায় ডিরোজিও সম্বন্ধে লিখতে দিয়েছিল, ওটা আমি আবার পড়ে যাইনি।' আমি তখন বললাম—'ওটা বাদ দিতে হল তো ? তবে অন্য প্রশ্ন এর বদলে ছিল নিশ্চয়।' ছেলেটি যা বলল, তাতে অবাক হয়ে গেলাম,—'না ওটাই

লিখলাম। 'ঝড়' সিনেমাটা দেখেছিলাম, সেটা তো ঐ ডিরোজিওকে নিয়েই তুলেছিল,—ঐ সিনেমার গল্পটাই লিখে দিলাম।'

এই ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে যে সিনেমা লোকে বেশ মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সিনেমা কেমন করে তোলা হয়, এ বিষয়েও এখন অনেকে খবর রাখে। এককালে চারজন ছেলের সঙ্গে যদি কথা বলা যেত, তবে দেখা যেত তার মধ্যে তিনজন কবিতা লেখে। এখন যদি চারজনের সঙ্গে কথা বলেন, তার মধ্যে তিনজন সিনেমা ডিরেক্টর হতে চায়। তারা সবাই পৃথিবীর নতুন ডিরেক্টরদের নাম জানে, কিভাবে তারা ছবি তোলে তাও জানে। নিজেরা কি গল্প নিয়ে ছবি করবে তা ঠিক করাই আছে। এখনো টাকা যোগাড়টা হয়নি। হলেই একটা নতুন ধরনের New Wave শুরু হবে, এ বিশ্বাস তাদের স্পষ্ট।

এরা অনেকে সিনেমাব ভাষাতেই কথা বলে। শুনলে প্রথমটায় অবাক লাগবে, পরে মজাও পাবেন। একটা উদাহরণ দিই। এই হবু পরিচালকেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের আসন্ন ফিল্ম প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলছে এমন সময়ে এক ভদ্রলোক তাদের জিগ্যেস করলেন,—আচ্ছা দুই বাই তিন বাই একশো সতেরোটা কোথায় হবে, বলতে পারেন? এক পরিচালক ভুরু কুঁচকে বলল, —'আপনি কি ওদিকটা দেখেছেন?' ভদ্রলোক বললেন—'হ্যাঁ ওদিকটা ঘুরেই আসছি।' তখন একজন বলল—'তাহলে এটা হবে টেক টু। ঠিক আছে, ক্যাপস্টিক দিয়ে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক একটু হাঁ হলেন, তবু দমে গেলেন না। ছেলেটি এবার তার দুটো হাত চোখের সামনে তুলে বলল,— 'আপনি এদিকে সোজা চলে যান। ডানদিকে দুটো গলি পড়বে, সে দুটো ছেড়ে তৃতীয়টার সামনে গিয়ে কাট্—ডানদিকে ঘুরলেন, আবার এগিয়ে যাবেন। মোড়ের মাথায় গিয়ে কাট্—এবারে বাঁ দিকে ঘুরেই আবার ডানদিকে স্লো মোশানে যাবেন। একটু এগিয়ে ডানদিকে লং শটে দেখবেন একটা তালগাছ। এই গাছটার নিচে টিল্ট করে নেমে পেছনদিকে প্যান করলেই দেখবেন একটা লাল বাড়ি। দরজায় জুম করে গিয়ে কড়া ধরে নাড়বেন। অফ্‌ভয়েসে ভেতর থেকে সাউণ্ড পেয়ে যাবেন।' ভদ্রলোক একেবারেই স্তম্ভিত হয়ে আছেন দেখে ছেলেটি বলল,—'দাঁড়িয়ে আছেন কেন, স্টার্ট অ্যাকশন।'

এখন মেয়েরাও ছবি তুলতে চায়। আমি ছোট ছোট মেয়েদের দেখেছি, তারা নিয়মিত ফেস্টিভ্যাল দেখতে দিল্লি বম্বে যায়, নিজেরা স্ক্রিপ্ট লেখে। সকলেই এখন সত্যজিৎ রায়, বার্গম্যান, ত্রুফো, গদার। এরা কুরোশোওয়ার ভাই পুরোশোওয়া।

পাড়ায় আপনি লাইব্রেরি খুলুন, দেখাশোনা করার জন্য কাউকে পাবেন

না। বড়োজোর তারা এসে আপনাকে বলবে, 'আইনস্টাইনের ফিল্ম সেন্স বইটা আনুন লাইব্রেরিতে।' নামটা যে আইনস্টাইন নয়, আইজেনস্টাইন, একথা বলে লাভ নেই, কারণ ওরা আপনার কথা শুনবে না। ফিল্মস্টারের নামে ফ্যান ক্লাব বানান, দেখবেন প্রচুর ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে গিয়েছে। অমিতাভ হোক বা মিঠুন হোক,—দুজনেরই ফ্যান অনেক। কেউ কেউ আবার দুজনেরই ফ্যান। এই সব ক্লাবে কি হয় কেউ জানে না। তবে কোন ছুতোয় যদি গুরু স্টারদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় সেই লোভেই সবাই এই ফ্যান ক্লাবের মেম্বার হতে যায়। এদের কাছে অমিতাভ বা মিঠুন

ভগবানের ওপরে,—গড্ নয়, গডের চেয়ে বেশি। আমি একজনকে জানি সে তার গুরুর ছবি সাধারণত গড়ে আঠারোবার দেখত। প্রথমবারটা কেবল গোড়া থেকে দেখত। তারপর থেকে ঢুকত ঠিক তখনই যখন গুরু আসত পর্দায়। ধরুন, তিনটেয় শুরু হচ্ছে ছবি, গুরু আসছে তিনটে পঁয়ত্রিশে,— ছুলোটি হলে ঢুকত তিনটে তেত্রিশে। সীটে গিয়ে বসত, আর গুরুর মুখ দেখা যেত পর্দায়।

সিনেমায় নামার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল একটি ছেলে,—তারপরে

গিয়ে পেঁছেছিল পাগলদের আড্ডায়। গল্পটা নারায়ণ গাঙ্গুলি লিখেছিলেন, কিন্তু এটা গল্প হলেও সত্যি হতে পারে। এখন গল্পটা শোনা যাক। একটি ছেলে সিনেমায় নামার জন্য ব্যাকুল। রাস্তার চা-য়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে একদিন সে দেখল একটি লোক চা খাচ্ছে, তার ব্যাগের ওপরে লেখা আছে,—ডিরেক্টর। ছেলেটা তাকে চেপে ধরল,—আপনি নিশ্চয় ফিল্ম ডিরেক্টর। লোকটি বলল, হ্যাঁ। ছেলেটি লাফিয়ে উঠল,—দাঁড়ান দাঁড়ান, ওরে এঁকে টোস্ট অমলেট চা দিয়ে যা। লোকটি সব তারিয়ে তারিয়ে খেল, তারপরে বলল,—ছবিতে নামবেন? কাল চলে আসুন এই ঠিকানায়। আমরা ৫০ জন এক্সট্রা চাই,—ক্রাউড সীনের জন্য। আপনাকে একটা পার্ট দিয়ে দেব। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন গটমট করে, ট্রাম, বাস, গাড়ি, লোকজন, আর আপনি।

ছেলেটি পরেরদিন হাজির হল সেই ঠিকানায়। গেট বন্ধ দেখে ছেলেটি বাইরে থেকে ডাকতে লাগল,—কেউ আছেন? কেউ আছেন? একটা মুখ দেখা গেল,—কাকে চাই? ছেলেটি বলল,—আমায় চন্দ্রবদনবাবু আসতে বলেছেন, ফিল্মে নামাবেন আমায়। সেই মুখের মালিক হাসল—তারপরে বলল, ও আপনি এসে গেছেন? আসুন আসুন। চন্দ্রবদনবাবু আজকে নেই। আজ আমিই ডিরেক্টর। আমার নাম সূর্যবদন।

ছেলেটি আশ্বস্ত হল। যাক তাহলে সিনেমায় নামা যাবে। 'কিন্তু ঢুকবো কোথা দিয়ে? গেট তো বন্ধ।' সূর্যবদন বলল,—'গেট টপকে ঢুকুন, সিনেমায় নামবেন আর গেট টপকাতে পারবেন না?' ছেলেটি বুঝল, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশ করলেই তার ভাগ্যে ভাল পার্ট নাচছে। হাঁচোড় পাঁচোড় করে গেট টপকে ঢুকে গেল সে। সূর্যবদন বলল,—'বাঃ! এই তো চাই। এবারে এক পা তুলে দাঁড়ান দেখি।' ছেলেটি এক পা তুলল। 'এবারে আরেক পা তুলুন।' ছেলেটি অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু দুপা তুলে সে দাঁড়াতে পারল না। খুব মন খারাপ হয়ে গেল তার। সূর্যবদন বলল—'সিনেমায় নামার ইচ্ছে আছে আর দুপা তুলে দাঁড়াতে পারছ না?' ছেলেটি প্রায় কেঁদে ফেলল, তাহলে কি সিনেমায় নামা হবে না? সূর্যবদন কাকে যেন ডাকল, তাকে বলল,—'তুমি এই ছেলেটির সন্তরণটা দেখে নাও।' লোকটা এগিয়ে এল। ছেলেটি এবারে ভয় পেল, সে তো সাঁতার জানে না। কিন্তু তার কথা শুনলোই না কেউ। ওই মুশকো লোকটা তাকে ঠেলে একটা পুকুরের মধ্যে ফেলে দিল। ছেলেটি ডুবেই যেত তবে তক্ষুণি একদল লোক হৈ হৈ করতে করতে ওখানে পেঁছে গিয়েছিল তারাই তুলল ছেলেটিকে। তারা পাগলা গারদ থেকে পালানো

দুই পাগলকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সূর্যবদন আর ঐ লোকটা,—এই দুজনেই হল সেই পালানো পাগল।

গল্পটা শুনে অবশ্য ঐ ছেলেটাকেও পাগল বলে মনে হতে পারে। সিনেমা মানুষকে এইভাবে পাগল বানিয়ে দেয়।

আজকাল পাড়ায় পাড়ায়, কলেজে কলেজে ফিল্ম ক্লাব হয়েছে। সেখানে গম্ভীর মুখে সবাই বিদেশি সিনেমা দেখে। সে সব ছবি কোনদিনই বাজারে বেরোবে না, আঁতেলদের জন্য করা যেন তোলে এই ছবি। আমি এরকম গোটা দুয়েক ছবি দেখেছি। একদম কিছুই বোঝা যায় না। হয়ত একজন হাঁটছে তো হাঁটছেই, কেন হাঁটছে কোথায় যাচ্ছে আধ ঘণ্টার চেষ্টাতেও বুঝলাম না। আর কেউ বুঝেছে বলেও মনে হল না, কিন্তু সবাই খুব সিরিয়াস মুখ করে বসে আছে দেখলাম। হঠাৎ দেখলাম দুটো বাচ্চা ছেলে খুব জোরে দৌড়চ্ছে—এরা আবার কোত্থেকে এল? দৌড়তে দৌড়তে তারা মাঠ পেরোল, সমুদ্র পেরোল, আকাশে সূর্য উঠে আবার ডুবে গেল,—ছবির গল্পের সঙ্গে এদের কোথায় যোগ বুঝতে পারছি না। আশে-পাশের সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছি, কেউ ধরতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু সবাই এমন স্মিতমুখে কপাল টিপে ধরে ছবি দেখছে যে মনে হচ্ছে এরা ছবিতে ডুবে গিয়েছে। ভাবলাম একটার গলা টিপে ধরে বলি, 'কি বুঝেছিস বল দেখি, সত্যি কথা বলবি।'

হঠাৎ দেখলাম ঐ বাচ্চা দুটো এসে দাঁড়িয়েছে একটা দোকানের সামনে, বলছে অমুক চকোলেট আছে? দোকানদারটা চকোলেটের চকচকে প্যাকেট দিচ্ছে ওদের হাতে। ও হরি, এটা আসলে বিজ্ঞাপন, ছবির মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তখন সবাইয়ের মুখে কি হাসি। এতক্ষণে একটা ছবি বোঝা গেল। আমি উঠে পড়লাম। শুধু বিজ্ঞাপনে আমার হবে না। ঐ চকোলেট একটা হাতে দিলে তবে বাকী ছবিটা দেখার চেষ্টা করতাম।

না বুঝে ছবি দেখার বিড়ম্বনা অনেক। হাসির জায়গায় ধরতে পারলাম না, কান্নার জায়গাও বুঝতে পারছি না। এ বিষয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেইটে শুনিয়ে শেষ করি।

'দেবদাস' দেখতে গেছি। বড়ুয়ার ছবি, খুব জমিয়ে দেখছি, গলায় একটা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। আমার পাশে তিনটি ছেলে এসে বসেছে। তারা কেউ বাংলা জানে না। আমাকে একটা ছেলে বলল,—দাদা, এ ছবির হাসির জায়গা এলে বলবেন। আমি একটু ভেবে বললাম,—এ বইটায় সবটাই হাসির।

সেই যে ওরা হাসতে শুরু করল, ছবি শেষ হওয়ার আগে থামল না।

আপদ এবং বিপদ

প্রথমে একটা গল্প বলি। এক ধনী ব্যক্তি তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে বসে-ছিলেন। নানা কথার ফাঁকে একবার তিনি একজনকে বললেন, 'ওহে কেষ্ট, তোমাকে একবার মেদিনীপুর যেতে হবে।' কথাটা শেষ হল না। কে যেন এসে কি খবর দিল। ও'কে উঠে চলে যেতে হল। পরেরদিন মজলিশে কেষ্টকে কিন্তু দেখা গেল না। দু'দিন বাদে একবার ভদ্রলোক বললেন, 'কেষ্ট কোথায়? তাকে দেখছি না তো।' কেউ বলতে পারল না কেষ্ট কোথায়? হঠাৎ একদিন কেষ্ট এসে হাজির।

'কি ব্যাপার? কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে আমি মেদিনীপুর গিয়েছিলাম, তা ওরা তো কিছু বলতে পারল না।'

'হঠাৎ মেদিনীপুর গিয়েছিলে কেন?'

'আজ্ঞে আপনি যে সেদিন বললেন, কেষ্ট তোমায় একবার মেদিনীপুর যেতে হবে। তাই চলে গেলাম, কিন্তু ওরা কেউ বলতে পারল না যে কি দরকার।'

'আরে তুমি একেবারে মেদিনীপুর চলে গেলে? কিছু না শুনেই—'

এটা ঘটনা না রটনা বলতে পারব না। তবে এটাকে মোসাহেবির একটি উৎকৃষ্ট নমুনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের কাজের ফলও নিশ্চয় কিছু পাওয়া যায়।

এই ধরনের লোক আপনি আশেপাশে অনেক দেখবেন। তারা প্রতি মুহূর্তেই ওপরওয়ালার সামনে গিয়ে কিছু না কিছু বলে থাকে। এতবার তারা এটা করে থাকে যে, সব সময়ে ওপরওয়ালাও এটা সহ্য করতে পারে না, তাকেও মাঝে মাঝে রূঢ় হয়ে বলতে হয়, Now I am busy please get out এরা কিন্তু এতে দমে যায় না। এসব তাদের কাছে Part of the game. খানিকটা বাদেই এরা আবার ওপরওয়ালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, 'আপনি যে বলছিলেন, ব্যস্ত আছেন, এখন কি সময় হবে আপনার?' এই তিতিক্ষাই হল উল্লেখযোগ্য।

আমি যার কথা বলছি, তাকে আমি একবার লক্ষ্য করে দেখেছি।

ম্যানেজার অফিসে আসার আধঘণ্টা আগে থেকেই সে ম্যানেজারের ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। ম্যানেজারের পক্ষে একে এড়ানো অসম্ভব। আমি ভেবে পাইনি ও এতবার কি বলে ম্যানেজারকে। একদিন ওকেই জিজ্ঞেস করলাম। ও গর্বের সঙ্গে বলল, 'প্রথমেই গিয়ে বললাম, আজ লরি পাওয়া যাচ্ছে না। মাল পাঠানোর অসুবিধে আছে। তবে আমি চেষ্টা করছি। তার আধঘণ্টার মধ্যেই আবার গিয়ে জানিয়ে এলাম যে লরি পাওয়া গেছে।'

আমরা এ নিয়ে হাসাহাসি করে থাকি। যেদিন করার মত কিছু না পাবে, সেদিনও বোধহয় এ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে পড়বে অভ্যাসমত। তারপরে ম্যানেজারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলবে এই এলাম একবার।

যতই হাস্যকর মনে হোক, এ পুজোয় এই মন্তর। এতে কমবেশি উন্নতিও হয়, সাধুবাদও পাওয়া যায়।

আর এক ধরনের লোক আছে, যাদের রকমটা আলাদা। ছুটি হলে সে বাড়ি যায় না। ছুটির পরেই তার কাজের ভনিতা শুরু হয়। তাকে কেউ বুঝিয়েছে যে ছুটির সময় হলেই যারা ছুটি পায়, তাদের কাজের লোক বলে কেউ মনে করে না। লোকের কাজ সময়ে, কাজের লোক অসময়ে। এদের বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশনে যখন ভোজ হয়, তখন অফিসের ম্যানেজার প্রমুখদের জন্য ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা থাকে। শনিবার রবিবার এবং পরিবার এরা অফিসের জন্যই উৎসর্গ করে দেয়।

আবার কাউকে সরাসরি ওপরওয়ালাকে বলতে শুনেছি, 'আপনি আছেন বলেই অফিসটা চলছে, কাজ হচ্ছে।' ব্যাপারটা একটু মোটা দাগের হলেও খোসামোদ স্বয়ং ঈশ্বর খুশি হন, আর এ তো সামান্য মনুষ্য। যে খোশামোদ শুনতে চায় না, তাকে যদি বলেন—'আমি জানি আপনি গ্যাস খান না', তাহলে সে এই গ্যাসটাই খেয়ে বসে থাকে।

অফিসে কখনো কখনো ওপরওয়ালারা নিচুতলার লোকদের পার্টি দিয়ে থাকেন। যেসব ভাগ্যবানরা এখানে নিমন্ত্রিত হন, তাঁদের মধ্যে দু' ধরনের মনোভাব কাজ করে থাকে। একদল বিব্রত হন, আরেকদল অভিভূত হন। কেউ এড়াতে চান, কেউ বাড়াতে চান। অনেকে এসব জায়গায় কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারেন না। অফিসে গালমন্দ অভ্যাস হয়ে গেছে, পার্টিতে ভালমন্দ কি হবে কে জানে। এসব জায়গায় যুগলের নিমন্ত্রণ হয়। বৌ নিয়ে যাব, না রেখে যাব, এইটেই ঠিক করে ওঠা যায় না। বৌ কাউকেই চেনে না, অন্তত সামাজিক অন্তরঙ্গতা নেই, সে জল ছাড়া মাছের মতো খাবি খেতে থাকে। সহসা ওপরওয়ালাটির সাংস্কৃতিক কর্মে উৎসাহ দেখা দেয়

জনে জনে সবার বৌকে গান গাইতে অনুরোধ করেন। এটা আরো বিপদ। কে কবে শেষ গান গেয়েছে মনে নেই। তাছাড়া বাঙালিদের সঙ্গে অবাঙালি লোকেরাও আছেন। এখানে বাংলায় গাইব, না রাষ্ট্রভাষাতেই রাণ্ট্র করব, এইটাই দ্বিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ বা বিয়ের জন্য শেখা রবীন্দ্রসঙ্গীতটা ধরেন। এসব জায়গায় সুরের যে চাপল্য আবশ্যক, তা জানা না থাকায় গানের নির্বাচন ভুল হয়। অবশ্য ওপরওয়ালাটি বিজ্ঞের মতো Oh, Tagore song এইটা বলে তাঁর বিদ্য দেখান এবং আরেকজনকে একটি চটুল হিন্দী গান গাইতে বলেন।

বৌ না নিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে কিনা, এই ভেবেও অনেকে সিঁটিয়ে থাকেন। অনেকের বৌ অবশ্য স্মার্ট হয়ে থাকে, এমন দহরম মহরম করে ফেলেন তিনি যে বোঝাই যায় পরের বারের উন্নতির লিস্টে তাঁর স্বামীর নাম অবধারিত হয়ে যাচ্ছে। এসব স্বামীরা পার্টির খবর পেলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন —কারা নিমন্ত্রিত হল, কারা হল না, এসব জরুরী তথ্য সংগ্রহের জন্য।

আমি এক ম্যানেজারকে দেখেছি, তিনি বিদেশ গেলেই তাঁকে বিদায় জানাতে সবাই জড়ো হতো এয়ারপোর্টে। একটা সাজ-সাজ রব পড়ে যেত তখন। কারা যাবে, কিভাবে যাবে। সেজে গুজে, দাঁত বার করে, রুমাল

নেড়ে সে এক এলাহী ব্যাপার। যাবার সময়ে কাস্টমস চেকিংটারও বন্দোবস্ত করে দেয়া ছিল করিৎকর্মা অফিসারদের কাস্টম। একবার এক ভদ্রলোক সময়মত এয়ারপোর্টে পেঁছিতে পারেননি। পরে যখন প্লেনের সামনে সকলের সঙ্গে ম্যানেজারের ছবি অফিস জার্নালে ছাপা হল তখন তিনি তো কেঁদে আকুল। এতো ডকুমেণ্ট হয়ে রইল। ইনক্রিমেণ্ট বা প্রোমোশনের লিস্ট বানাবার সময়ে এ ছবি ভেরিফাই করা হবে কিনা কে জানে। যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন কতটা সামলানো যায় তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

ম্যানেজার যেদিন ফিরবেন, সেদিনও সকলে এয়ারপোর্টে হাজির তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য। আকাশে প্লেন দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বকের মত গলা উঁচু করে ধরল, যদি প্লেন থেকেই ম্যানেজার কাউকে চিনে ফেলতে পারেন। ততক্ষণে ঐ ভদ্রলোক প্রায় টারমাকে পেঁছে গেছেন। প্লেন থেকে ম্যানেজার নামতেই একজন সুবেশা তরুণী তাঁর গলায় পরাল গোলাপ ফুলের মালা। ম্যানেজার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। ভদ্রলোক প্রায় গলে যেতে যেতে বললেন,—'আমার ওয়াইফ স্যার।' ম্যানেজার হাসলেন। অনেকদিন পরে ভদ্রলোক স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন।

এত সব ব্যাপার যখন আমার জানা আছে, তখন আমার নিজের উন্নতি হয়েছে কেমন, একথা জানবার ইচ্ছে হতে পারে আপনাদের। হয়নি। কারণ আমি জানি সব থিওরিটিক্যালি। প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করতে পারি না।

তবে আরো তিনজনের নাম করতে পারি, তাঁদেরও কোন উন্নতি হয়নি। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল। বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাই।

বাংলা সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটি বিপজ্জনক ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর বাংলা পরীক্ষা নিয়েছিল এক সাহেব—'টুমি কি বলিটে পারো 'আপড্' আর 'বিপড্'-যে টফাৎ কি?'

জবাবে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'যখন নদীতে ঝড়ের মুখে পড়ি, তখন সেটা আমার বিপদ, আর তুমি যে এখন আমার পরীক্ষা নিচ্ছ, এইটা আমার আপদ।'

উন্নতি করতে গেলে এই আপদেরই মুখোমুখি হতে হবে।

দূরদর্শনে অনেক দূর দর্শন

দুটি ঘটনার কথা বলি। একটি ঘটনা ইদানীংকার। দূরদর্শনে 'মহাভারত' দেখানো হচ্ছে। পাশের বাড়ির একটি মেয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আজকে কি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখাবে?' আমি জানতে চাইলাম, 'কেন?' মেয়েটি বলল, 'আমরা আজ কোচিংয়ে যাব না। কোচিং ছুটি দিয়েছে। কিন্তু যদি আজ বস্ত্রহরণ না দেখায়, তাহলে সামনের দিন দুপুরে পড়তে যেতে হবে।'

আরেকটি ঘটনা। এটি আজ থেকে বছর বারো আগেকার। টেলিভিশনে নাটক দেখা শুরু হয়েছে, ঘরে বসেই সিনেমা চলছে। ভারী আজব ব্যাপার। ঐ সময়ে একবার রেডিওতে পর পর সাত দিন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। খবরটা জেনে আমি বাড়িতে বললাম, 'এখন থেকে সাত দিন রোজ থিয়েটার হবে।' আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে, সে উল্লসিত হয়ে বলল, 'সাত দিন! কখন হবে?' আমি বললাম, রেডিওতে হবে। মেয়েটি নিরাশ হয়ে বলল, 'ও, রেডিওতে?'

এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে যে টি ভি কেমন জাঁকিয়ে বসেছে। এটাকে নাকি Idiot Box বলা হয়—খুব ভাল কথা। বিজ্ঞানীরা যে ইডিয়টের জন্য কিছু ভেবেছেন, এটা তো সুসংবাদ। ইডিয়ট হলে সে আনন্দ করতে পারবে না, এমন তো নয়। জগতে যখন ইডিয়টরাই সংখ্যায় বেশি, তখন মেজরিটির জন্য মেজর কিছু তো করাই দরকার। এক সময়ে টি বি হতো খুব, আজ তেমনি টি ভি তৈরি হচ্ছে। দুটোয় তফাৎ অবশ্য আছেই। টি বি হলে লোক মরে বাঁচত, আর টি ভি'তে স্ত্রীলোক বেঁচে থেকে মরে। এখন সবাই টি ভি দেখে না শুধু দুপুর বারোটায়। ঐ সময়টা উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় টি ভি'তে। ওসব তুচ্ছ ব্যাপার সকলে বাদ দেয়।

আমাকে এক বন্ধুর বাড়িতে যেতে হয়েছিল সন্ধ্যাবেলা। তাকিয়ে দেখলাম, ছাদের ওপরে অ্যান্টেনা রয়েছে। এই রে, এখন ঢুকলেই তো ধরে টি ভি'র সামনে বসিয়ে দেবে। যেন আমরা টি ভি দেখতেই এসেছি। ঢুকে কিন্তু দেখলাম যে সবাই বসে গল্প করছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে টি ভিও দেখতে পেলাম না। আমি বললাম, 'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ভাই।

ভাবছিলাম তোমরা হয়তো টি ভি দেখছ।' বন্ধুর স্ত্রী এবং বন্ধু দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'না, টি ভি টা মেরামত করতে দিয়েছি।'

গল্পগুজব করে ফিরে আসার সময়ে বন্ধু বললো, 'তোমায় একটা সত্যি কথা বলি। আমাদের কোনো টি ভি নেই।' আমি খুব অবাক হলাম, 'তার মানে? ঐ যে অ্যান্টেনা দেখলাম।' বন্ধু বলল, 'ঐ অ্যান্টেনাটাই কেবল রয়েছে।' আমি তো প্রথমে হাঁ। তারপরে হা হা করে উঠলাম, 'কী ব্যাপার, কিছুই বুঝছি না।' বন্ধু এরপরে হাহাকার করে উঠল, 'ভাই টি ভি কেনার ইচ্ছে নেই আমাদের। অথচ সবাই এসে যখন দেখে টি ভি কিনিনি, তখন ভাবে আমরা হয় কৃপণ, নয় গরীব। দুটোর একটাও সহ্য হয় না। তাই শুধু এ্যান্টেনাটাই কিনেছি। লোকে বুঝবে যে আমরা টি ভি'র এ্যান্টি না। কেউ এলে বলি টি ভি টা মেরামত হতে গিয়েছে।

এ থেকেই পরিষ্কার যে টি ভি এখন দরকারি। এখন আমরা অন্য বাড়িতে গিয়ে রেশনের অবস্থা কি সে গল্প করি না, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে কি না, সে কথাও বলাবলি করি না। আমরা যা নিয়ে কথা বলি, তা হল টি ভি সিরিয়াল। এটি একটি আশ্চর্য বস্তু। তাবৎ সাহিত্য, হালফিলের জগৎ সব এতে ধরা পড়েছে। এখন যদি নেহাৎ কারো কাছে কোনো দরকারে যেতে হয়, তবে হিসেব করে যাই—যাতে দরকারটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ের সিরিয়ালটাও দেখা হয়ে যায়। বাড়িতে কাজের লোক লোক রাখার সময়ে আমরা যেমন কত মাইনে দিতে হবে সেটা জেনে নিই, ওরাও জেনে নেয় আমাদের টি ভি আছে কিনা। আমরা না দেখলেও ওদের দেখতে দিতে হয়। সে সময়ে চা করার দরকার হলে বাড়ির কর্ত্রীকেই করতে হবে। তেনারা অন্য সময়ে চিত্রহারের গান ভাজতে ভাজতে ছাদে গিয়ে কাপড় ভাঁজ করবেন। নয়তো সিরিয়াল নিয়ে আপনার স্ত্রী'র সঙ্গে গসিপ করবেন।

আসল কথা, টি ভি এসেছে বলে বাঁচা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। আগে লোকে বই পড়ত, বেড়াতে যেত, লোকের সঙ্গে মিশতো, ক্লাব গড়তো। এখন সে সব দায় চুকে গেছে। শনি রবিবারে কোনো নেমন্তন্ন থাকলে ৮টার আগে কেউ যেতেই পারে না। বিয়ে বাড়ি খালি থাকে সে সময়টা। সিনেমা দেখার পরে সবাই একসঙ্গে আসে। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। একটু পরেই কোন সিরিয়াল শুরু হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা হলেই এখন চায়ের কাপ বা মদের গেলাস হাতে নিয়ে বক্সের সামনে ইডিয়েটের মত বসে থাকলেই চলে। ভাবতে হয় না, বুঝতেও হয়

না। এমন দিন হয়তো আসবে যখন ভাবা বা বোঝার শারীরিক পার্টস আর মানুষের থাকবেই না।

টি ভি আরো একটা কাজ করেছে। গড়ে তুলেছে একটা সাম্য, ঐক্য। সকলে মিলে বসে একই জিনিস উপভোগ করে এখন। বাড়িতে যারা থাকে, যারা আসে যায়, যারা কাজ করে সকলে মিলে সমাজের সর্বস্তরে একটা Common appreciation standard বানিয়ে নিয়েছে। এছাড়া টি ভি-র দৌলতে বাংলা বানানও সরল হচ্ছে। 'অঞ্জলি' বানানটা প্রায়ই আমি 'অঞ্জলী' দেখেছি। 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' লেখা হয় অনেক সময়েই। হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞানের আর দরকার নেই দেখা যাচ্ছে।
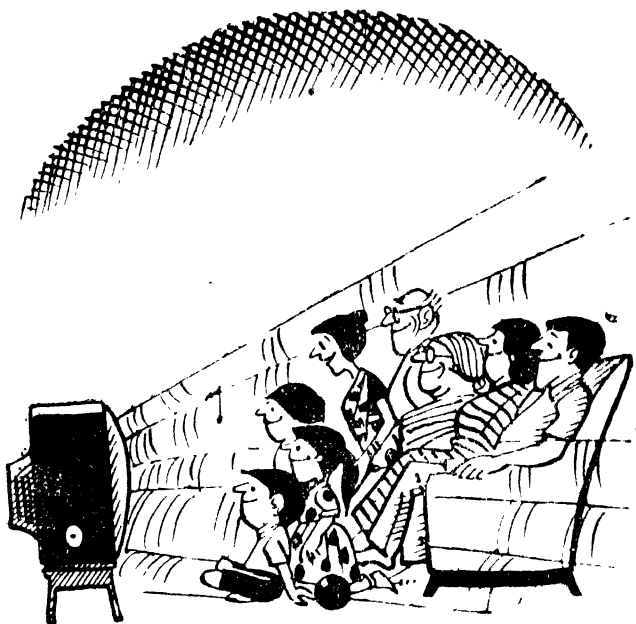
বেশ যত্ন করে নির্বোধদের জন্য টি ভি সিরিয়াল তৈরি হয়ে থাকে। না কি নির্বোধ বানাবার জন্যই এই চেষ্টা? প্রতিদিন এইসব দেখতে হলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়, চট করে আনন্দ পেতে কোন বাধা হয় না।

যে সব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাতে কেউ তৈরি হয়ে আসেন বলে মনে হয় না। প্রশ্ন কর্তাই কথা বলেন বেশি, যাঁর সাক্ষাৎকার তিনি প্রতিবেশীর মতো বসে থাকেন। অনাবশ্যক কঠিন ইংরেজি শব্দ বলেন অনেকে, শ্রোতাদের তাতে কোনোই লাভ হয় না। টি ভি পারিবারিক উপকরণ হলেও (নাকি

তাই বলেই ?) এতে এমন অনেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যা দেখে বাড়ির ছোট বড় সবাই প্রচুর গোপন বস্তু খুব দ্রুত শিখে নিচ্ছে।

টি ভি যদি বোঝা হয়, ভি সি আর তবে শাকের আঁটি। টি ভি যদি গোদ হয়, ভি সি আর তবে বিষফোঁড়া। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেলেও, শাক ঢাকা যায় না কিছুতে। টি ভি থেকে ছাড়ান পেলেও, ভি সি আর থেকে কাটান নেই। আমার জানা অনেকে আছে, যারা সারাদিন টি ভি-র পর্দায় ভি সি আর চালায়। টি ভি এখন ভি নি, ভি ডি এবং ভি সি আর। প্রথমে ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টি ভি, পরে কালার টি ভি না আসা পর্যন্ত মুখ আষাঢ়ের মতো ব্ল্যাক, তারপরে কালারফুল ভি সি আর। আর কিছু এখনো বেরোয় নি। হয়তো থ্রি-ডি-আর কিছু বেরোবে। অবশ্য সেই অনাগত থ্রি-ডি-আর এবং টি ভি'র মধ্যে মিসিং লিংকের মত এসেছে রিমোট কন্ট্রোল সুইচ। চেয়ারে বসে বোতাম টিপে টেবিলে রাখা টি ভি'র ছবি থামিয়ে বা চালিয়ে দেওয়া যায়, এইটেই রিমোট সুইচের মোট কথা। মোটা কথাও বটে। এ না হলে এখন বৌয়ের কাছে খোঁটা খেতে হচ্ছে। ধার করে বাড়ি আর ধরাধরি করে গাড়ি এনেও নারীর কাছে মুখ থাকছে না। বৌ-ই তো আমাদের রিমোট কন্ট্রোল। বৌরাই তো ঘোঁট পাকিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে। তারা এখন অনেকে রোজগার করে। বাড়িতে থাকে না, চাকরি করে। চাকরিতেও শানাচ্ছে না, অনেক বৌ আবার অনেক রকম ব্যবসা করে। সংসার করাটা কোনো কাজই নয় এখন। বাড়িতে বসে কেউ আর বই পড়ে না গান শোনে না চিত্রহার ছাড়া। প্রথম নাইটে টি ভি, লেট নাইটে নাইটি পরে ভি-সি আর দেখে বাড়ির বৌ। অথচ টি ভিতে ছবি দেখে আরাম হয় না, ব্যারাম হয়। চোখের ব্যারাম। এবং হয় বুদ্ধুরাম। ভোঁতা হবার এমন রামরাজত্ব আগে আসে নি। এছাড়া এসেছে কেবল টি ভি, কেবল টি ভি নিয়েই থাকব সবাই।

বলতেই হবে, আনন্দ পাওয়া সহজ হয়ে গেছে। বুদ্ধি লাগে না, চিন্তা লাগে না। দূরদর্শনে অনেক দূর পর্যন্ত দর্শন করা যাচ্ছে—মানসিক প্রতিবন্ধী সমাজে নয় নয় করে আজ নয় কাল গড়ে উঠবেই। ধৃতরাষ্ট্রকে ঘরে বসেই ধ্বংসের খবর দিচ্ছিলেন সঞ্জয়, সে ঘরে টেলিভিশন ছিল কিনা ব্যাসদেব বলেন নি। তবে আমরা দূরদর্শনে আজকের কুরুক্ষেত্র জুড়ে যে দুর্দশা তা দেখতে পাচ্ছি। কেবল যখন লোডশেডিং হয়, তখন সে সব দেখতে পাই না, তখন শুধুই অন্ধকার।

সবার আপন বিজ্ঞাপন

আপনার কি যখন তখন মাথা ধরে? গলা খুসখুস করে? সর্দিতে কষ্ট পান?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনি বিজ্ঞাপনে পেয়ে যাবেন। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি শুধু নয়, রাস্তায়-রাস্তায় ট্রামে-বাসে সর্বত্র আপনাকে যা দেখতে শুনতে বা পড়তে হবেই তা হল বিজ্ঞাপন। যতই পণ করে থাকুন, বিজ্ঞাপন না দেখে আপনার উপায় নেই। বিজ্ঞাপনই এখন আপনার আপন। কারণ সে-ই আপনাকে বলে দিচ্ছে কখন কি করতে হবে, কখন কি খেতে হবে, কোন অসুখে কি চিকিৎসা করবেন। শীগ্‌গিরই মনে হয়, অসুখ হলে আমাদের আর ডাক্তার লাগবে না। সব অসুখেরই ওষুধ পাওয়া যাবে বিজ্ঞাপনে। সেগুলো বলবেন আবার অষ্টাদশী চিত্রাভিনেত্রী। কোন ডাক্তারের বলার চেয়ে অনেক ভাল লাগবে ঐ তরুণীর গলা। তখন হয়ত একটা নিয়ম হবে এইরকম। কাগজে সারাসপ্তাহে কোন বারে কি অসুখের ওষুধের খবর থাকবে, তা আগে জানিয়ে দেওয়া হবে। এইভাবেই রেডিও বা টিভিতে বলা থাকবে, কবে ক্যানসারের ওষুধ দেওয়া হবে, কবে টাইফয়েডের বা কবে কলেরার।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন যুগ এসে যাবে। ভেবে দেখুন ডাক্তারের চেম্বারে ভিড় নেই, শুধু যে যার টিভি খুলে ওষুধ জেনে নিচ্ছে সুন্দরী মহিলাদের মুখ থেকে। ভাবলেই অসুখ অনেকটা কমে যায়। যদি কারো এমার্জেন্সি অবস্থা হয়, তবে সেদিন দোকান থেকে এমার্জেন্সি ক্যাসেট এনে ভি সি আর-এ চালিয়ে দেখে নিলেই হল।

এখন তো কোন পানীয় খেলে আপনার ক্লান্তি দূর হবে, তা জানা যাচ্ছে ঐ বিজ্ঞাপন থেকে। যতদিন না ওটা দেখেছি, ততদিন ক্লান্তি দূর করার জন্য এক গেলাস জল খেয়ে টানটান হয়ে খানিকটা শুয়ে থাকলেই চলত। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের যুগ। আর বিজ্ঞাপনের হুজুগ। এখন ঐ বিশেষ পানীয়টিই চাই।

বিজ্ঞাপন আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দেবার দেবার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। আপনি তাতেই ব্যতিব্যস্ত। বৌ যে শাড়ি চায়, মেয়ে যে ফ্রক চায়, ছেলে

যে প্যাণ্ট চায়, সব ঐ বিজ্ঞাপনের হাতছানি। আপনার চোখে ছানি পড়লে কি হবে, আপনার পরিবারের সবাই এখনো তরুণ-তরুণী। আপনার অবস্থা যত করুণই হোক।

'বাসি লুচি অমুক ঘিতে ভাজা হলেও খাবেন না',—অমুক ঘি-এর এই আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়। ইংরেজি পোস্টার,—'অমুক চুরুট হলেও এখানে ধূমপান নিষিদ্ধ'—এরই ছায়ায় তৈরি ঐ বাংলা বিজ্ঞাপন। তবু ভোলার নয়।

রাজশেখর বসু একটি বিজ্ঞাপনের কথা বলেছিলেন,—'রাত উপোসী থাকবেন না। এই পানীয় খেয়ে শুয়ে পড়ুন।' ঠেসে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেও শুতে যাবার সময়ে মনে হয়, কি জানি দরকার নেই। ঐ পানীয় এক কাপ খেয়ে নিলেই হয়।

বিজ্ঞাপনদাতা মিথ্যে কথা বলেন না, তবে ছলের আশ্রয় নেন। আমাদের তৈরি জিনিসে অমুক জিনিস থাকে না, এর মানে হল, অন্য কারো তৈরি বস্তুতে ঐ অমুক জিনিস থাকতেও পারে। লোকের ধোঁকা লেগে যায়, তারা ভাবে, ঝুঁকি না নিয়ে এইটি নেওয়াই ভাল।

আপনার জীবনযাত্রা এখন নিয়ন্ত্রণ করছে বিজ্ঞাপন। কোন সাবান মাখবেন, কোন তেল কিনবেন, এগুলো ঠিক করতে হয় বিজ্ঞাপন দেখেই। কোনটা যে ভাল, শুধু তাই ভাবলেই চলে না, কারা তাদের সঙ্গে কটা মগ বিনামূল্যে দিচ্ছে, সেটাও বিচার্য। চারটে কিনলে একটা ফাউ, এই শুনে একজন বলেছিল, শুধু ফাউটাই নেবো তাই দিন। বিনামূল্যের ফাউটা হলেই চলবে এখন।

শুধু ফাউটাই চাই, এ কথায় একটা বিজ্ঞাপন মনে পড়ে গেল। এটা কোন জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত, বা পাত্র-পাত্রী সংবাদ বলতে পারেন। সেটি ছিল এইরকম—

যদি দশ হাজার টাকা দেন, তবে পাত্রী সুশ্রী চাই। যদি বিশ হাজার টাকা দেন, তবে সুশ্রী না হইলেও চলিবে। যদি ত্রিশ হাজার টাকা দেন, তবে পাত্রী কানা হইলেও চলিবে। যদি চল্লিশ হাজার দেন তবে পাত্রী খোঁড়া হইলেও চলিবে। যদি পঞ্চাশ হাজার দেন তবে পাত্রী না হইলেও চলিবে।

যাই হোক, আমাদের ফাউয়ের লোভ দেখিয়ে মাল বিক্রি হচ্ছে। আপনার বাড়িতে কেমন ফার্নিচার মানাবে, কি রং করবেন ঘরের দেওয়ালে, বাড়ি বানাবেন কাকে দিয়ে সব বলে দিচ্ছে এরাই। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, সুন্দরী রমণীর কথামৃত তো অপরাজেয়। বিয়ের বিজ্ঞাপন এখনো রেডিও টিভিতে শুরু হয়নি তবে বিয়ের আগে পরে যা লাগে তা অতি খোলাখুলি

দেখানো হচ্ছে টিভির বিজ্ঞাপনে। বিয়ে না করেও, ইয়ে কাকে বলে তা জেনে ফেলেছে সবাই। যা পরে লাগে তাই আগে কেউ ব্যবস্থা করছে কিনা কে বলতে পারে। তবু বিজ্ঞাপনের কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। যা ঢেকে রাখলেই ভাল হতো, তাই গুর গুর করে বেজে উঠছে ঢাকের মতো। বিজ্ঞাপনে বিখ্যাত লোকেদের মন্তব্য জোগাড় করার চেষ্টা চিরকালই হয়ে আসছে। ক্রিকেট-খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, সাহিত্যিক, কেউই • বাদ যান না। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সদাশয় ছিলেন বলে শোনা যায়। তিনি অকাতরে সার্টিফিকেট বিলোতেন। কেবল ব্লেডের বিজ্ঞাপন তাঁকে দিয়ে

দেওয়ানো হয়নি। এ বিষয়ে একটা গল্প আছে, সেইটে শোনা যাক। রবীন্দ্রনাথ একদিন বসে বসে একটি বই পড়ছেন মন দিয়ে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে চামচে করে দই খাচ্ছেন একটু একটু। খানিকটা বাদে তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, বাঃ। শুনেই তাঁর সেক্রেটারি ঐ 'বাঃ' শব্দটি পাঠিয়ে দিলেন দুজনকে। এক কপি বইওয়ালাকে, এক কপি দইওয়ালাকে। দুজনের বিজ্ঞাপনেই লেগে গেল কথাটি।

কিছুকাল আগে কাগজে 'বান্ধবী চাই' বলে বিজ্ঞাপন বেরোত। পশ্চিম

দেশের ছোঁয়াচ হয়তো। সেটা আজকাল উঠে গেছে। কেন বন্ধ হল জানিনা। কেউ কি মরালিটির দোহাই দিয়েছেন? কিন্তু যখন কোন মরালীর মতো মেয়ের ছবি দিয়ে টিভিতে কেউ বিজ্ঞাপন দেয়, অথবা ব্যানার লাগায় রাস্তা জুড়ে, তখন তো আপত্তি হয় না। পদ্মমিতালীর বিজ্ঞাপন যদি চলতে পারে, মিতালী কেন চলবে না? জীবনে তালি লাগিয়েই চলেছি, এখন এই বিজ্ঞাপন যদি এক ফালি আশা দেয়, তবে দিক্ না!

মোট কথা, বিজ্ঞাপন এখন আমাদের সবকিছু জানাচ্ছে। বিজ্ঞাপনই আমাদের শিক্ষক। বিজ্ঞাপন ছাড়া সংবাদপত্র কল্পনাই করা যায় না। বাড়ি বসে শুধু কাগজ পড়ে, রেডিও শুনে বা টিভি দেখে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, বুদ্ধি সব রক্ষা করছি। রাস্তার মোড়ে আকাশে ছড়ানো হোর্ডিং দেখে মুগ্ধ অথবা লুব্ধ হচ্ছি। কেবল চোখ বুলিয়ে আর কানে শুনেই আমাদের শিক্ষা। অডিয়ো ভিস্যুয়াল ট্রেনিং।

হয়তো এ সব বিজ্ঞাপনের অনেকটাই সাজানো, অনেকটাই মিথ্যে। তবু যাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে গিয়েছে তাদের চিত্তে তো সুখ এনে দিচ্ছে এরা। যদি কেউ বলে ওই পানীয় খেলেই আপনি জোয়ান হবেন, আর জোয়ানের আরক খেতে হবে না, তবে তো বিশ্বাস করতেই হবে। যদি কেউ বলে অমুক সাবান মাখলে আপনার শরীরে মেমসাহেবের জেল্লা আসবে, তবে তো কেল্লা ফতে। ঐ তেল মাখলে টাক পড়বে না, এজন্য টাকা দেবে না কে? ঐ ক্রীম মেখে ঘুমোলে ভোরবেলা আপনাকে ফিলিম স্টারের মত দেখাবে, একথা গাঁজায় ছিলিম না চড়ালে বিশ্বাস হওয়া শক্ত, তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? পঞ্চাশ পেরিয়ে বনে যাব না যৌবনে ফিরব, দেখি না একবার।

এই তেল মাখলে চুল ওঠে,—একথার অবশ্য দুটো মানে হয়। এই তেলে চুল গজায়, না কি চুল উঠে যায়? যার যেমন কপাল তাই তো হবে। যার চুল উঠে যাবে তার তখন মাথার পুরোটাই কপাল, হয়তো অন্যদিক দিয়ে কপাল খুলেই গেল তার।

অবকাশে নিযুক্ত আছি

একদল আমেরিকান ট্যুরিস্ট এসেছে তাজমহল দেখতে। হাতে সময় নেই। অগত্যা তারা নিজেদের দু'ভাগে ভাগ করে নিল—You see inside, we see outside and we will settle in the plane অর্থাৎ এতটাই সময়ের অভাব তাদের যে পুরো তাজমহলটা দেখে নেবার অবকাশ তাদের নেই। অথচ না দেখলেও নয়, তাই এরও একটা প্রকল্প তৈরি হল ঐভাবে—একদল ভেতরটা দেখবে, একদল বাইরেটা, পরে তারা অন্য দলের কাছে বর্ণনা শুনে নেবে।

এরকম লোকই এখন বেশি হয়ে যাচ্ছে। কাজ এত বাড়ছে, চাহিদা বড় হচ্ছে এত, সময় সে হিসেবে বাড়ছে না। এখন দু লাইনের বেশি তিন লাইনের যোগ করতে গেলে আমাদের ভুল হয়ে যায়, ক্যালকুলেটর না হলে দু'শো গ্রাম আলুর দামও বার করতে পারি না। কম্পিউটার এসে গিয়েছে, এতে কাজ কমেছে এমন কথা বলা যায় না, এতে শুধু সৃষ্টি হয়েছে আরো কাজের সম্ভাবনা। কম্পিউটার কাজ কমায় না, ঘাড় ধরে অনেক বেশি কাজ করিয়ে নেয়।

এবার এক কাজ পাগল মানুষের গল্প শোনা যেতে পারে এখানে। ভদ্রলোক সকাল আটটার মধ্যে কাজে বেরিয়ে যান। যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ব্রেকফাস্ট সারেন, ততক্ষণ কাজের কাগজপত্রেই চোখ বুলোন, হিসেব করেন। সারাদিন কাজ করে যখন রাত আটটায় বাড়ি ফেরেন, তখনো গাড়িতে বসে ফাইলেই চোখ ডুবিয়ে রাখেন। গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। যন্ত্রের মতো গাড়ি থেকে নেমে হাতের ফাইল উল্টোতে উল্টোতে লিফ্‌টে এসে ঢোকেন। ঠিক জায়গাতে দরজা খুলে দেয় লিফ্‌টম্যান, ভদ্রলোক ফাইলে চোখ রেখেই পায়ে পায়ে ঘরে যান। চেয়ারে বসে টাই খুলতে খুলতে ফাইল দেখেন, তাঁর স্ত্রী এগিয়ে দেয় কফির পেয়ালা, মুখ না তুলেই কাপে চুমুক দেন তিনি। স্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'আজ সারাদিন অফিসে কি হল ?'

রোজই এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন ভদ্রলোকের মনে হল, স্ত্রীর গলাটা যেন অন্যরকম লাগছে। তখন চোখ তুলে দেখলেন যে ভুল করে

তিনি অন্য ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছেন। তবে তাতে কিছু আটকায়নি। এখানেও তাঁকে কফি দিয়ে জিগ্যেস করা হয়েছে, 'আজ সারাদিন অফিসে কি হল?'

এই শ্রেণীর লোকই এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আমরাও এই ধাঁচেই চলতে চাই। ছুটি পেলে আমরা বেকায়দায় পড়ে যাই, রিটায়ারমেণ্টের পরে চাই এক্সটেনশন, শুধু যে পয়সার জন্য তা নয়, সময় কাটাতে জানি না বলে। কাজ না থাকা মানে জীবন থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া।

অবসর কাটাবার উপায় শেখাবার জন্য একটা ক্লাস খুললে কেমন হয়? কাজ শেখানোর নানা ধরন আছে, নানা কোর্স। ছুটি কাটাবার উপায় জানে কজন? সবচেয়ে বড় কথা, সারাজীবন কাজের জন্য দৌড়ে দৌড়ে অবসর কাটাবার কথা কেউ ভেবে উঠতে পারে না। তাই অবসরের দিন সবাইকে দুঃখী করে তোলে। তার রোজগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে নয়, এখন সে সারাদিন কী করবে, তাই ভেবে উঠতে পারে না বলেই।

এ জন্য অবসর কাটাবার ক্লাশে তারাই যোগ দেবে, যাদের অবসর নেবার সময় এখনো হয়নি। অন্তত দশ বছর বাকি থাকা চাই রিটায়ারমেণ্টের, কারণ কাজের জন্য তৈরি হতে লাগে প্রায় কুড়ি বাইশ বছর—কাজ ছেড়ে দেবার জন্য তো কম করেও দশ বছর সময় লাগা উচিত।

এইখানে একটা আপত্তি আসবে, আমি জানি। যাদের রিটায়ারমেণ্ট নেই, যারা ব্যবসা করে, তাদের কি অবকাশ হবে না? হবে, যদি তারা কাজের মধ্যেই অবকাশ বার করে নিতে পারে। সে শিক্ষা নেবার জন্য তারাও এই ক্লাশে ভর্তি হবে। তার কঠিনতম কর্মমুহূর্তেও মধুরতম অবকাশ থাকবে। কাজের চাপে দিশাহারা হবার সময়েও প্রজাপতির দিকে যদি তাকাতে পাই, কোনো সুন্দরী মেয়ের চলনের মধ্যে নৃত্যের আবেগ যদি চোখে পড়ে তবে এ জীবন সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে যে পংক্তি ক'টি নেই, সে ক'টি ছিল ঐ নাটকের পূর্বপাঠ 'নন্দিনী'তে। সেটি এইরকম ঃ

—মহারাজ কি কোন কাজে নিযুক্ত আছেন?

—চিরকাল কি কাজেই নিযুক্ত থাকতে হবে? আজ আমি অবকাশে নিযুক্ত আছি।

এই অবকাশে নিযুক্ত থাকার কৌশল শেখাবার জন্য এই ক্লাশ। চল্লিশ পেরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ছুঁই ছুঁই হলেই এই ক্লাশে ঢুকে পড়তে হবে। ষাট পেরিয়ে আবার একবার আসতে পারেন, তখন হবে একটি রিফ্রেশার কোর্স। মনে রাখতে হবে, এই অবসরেই আপনার আসল বাঁচা। উপার্জনের জন্য বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য উপার্জন। সুতরাং নিজের জন্য অবকাশ বের করে

নিতে হলে সেজন্য তৈরি হতেই হবে। যাঁরা বাণিজ্য করে খান, তাঁদেরও ইজ্জত খানখান হবে না, যদি তাঁরা অবসর কাটাতে শেখেন। আপাতত তাঁরা এক কক্‌টেল পার্টি থেকে আর এক কক্‌টেল পার্টিতে শাট্‌ল ককের মতো ঘুরে বেড়ান—এক ক্লান্তি থেকে আরেক শ্রান্তি তাঁদের পাওনা হয়। অবকাশ কাটাতে জানলে উৎসাহের পুনর্নবীকরণ ঘটবে। চোখে জ্বলবে আলো। সে আলো চশমার কাঁচে ঠিকরে পড়া টিউব লাইটের রিফ্লেক্টেড গ্লোরি নয়।

কী করবেন আপনি, তা কম বয়সেই ঠিক করে নিতে হবে। কেউ কেঁউ এসবে অল্প বয়সেই ওস্তাদ হন, অল্পেই বোঝা যায় ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

জীবন ভোগের উপাদান দানাদারের মতো তিনি বানিয়ে তুলতে পারেন। কোনদিকে যাবেন, কী করবেন, এসব আপনার প্রবণতা অনুযায়ী হবে, তবে আপনাকে সাহায্য করা যেতে পারে।

আপনার যদি খেলা ভাল লাগে তাহলে তাই করুন। খেলা মানে ক্লাবের কাজ, কোচিং সবই হতে পারে। শিল্পকলা বলতে ছবি আঁকা, গান গাওয়া, ফিল্ম দেখা, বাজনা বাজানো, প্রদর্শনী সাজানো। এসব আপনি করতে পারেন, না পারলে উপভোগ করতে পারেন। লিখতে পারেন, আলোচনা চালাতে পারেন নিয়মিত। মিউজিয়াম আছে অনেক ধরনের। প্রত্যেকটিই হতে পারে আকর্ষক। নতুন নাটক দেখে পুরোনো দিনের কথা মনে হবে। একইসঙ্গে দুই যুগকে পেয়ে যাবেন।

ভ্রমণের জন্য শরীরের তাগদ চাই। চাই ধকল নেবার ক্ষমতা। আরো চাই ধানের শীষে শিশির বিন্দু খুঁজে পাওয়ার অভ্যাস।

যিনি ফার্স্ট এড জানেন, জানেন চিকিৎসার প্রাথমিক সংবাদ, তিনি মানুষের বন্ধু হয়ে উঠবেন তাড়াতাড়ি। কোনো সেবা প্রতিষ্ঠান করে তিনি সার্থক হবেন।

পাড়ায় লাইব্রেরি, নাইট স্কুল, এ সবের জন্য কর্মী প্রয়োজন। ভেবে দেখাবেন সেকথা। বই পড়ার তো কোনো বিকল্প হয় না। বউ নিয়ে আনন্দ এক বছর, বই নিয়ে আনন্দ সারাজীবন। বই পড়ুন, আরো বই।

যা কিছু করবেন, তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই, শুধু ভালো লাগার জন্য করবেন।

চিঠি লেখা একটি বড়ো আর্ট। অনেকেই চিঠি লিখতে পারেন না। বাংলায় কথা বললেও চিঠি লেখেন ইংরেজিতে। অনেকে তাও পারেন না। খুব জোর Please discuss, এইটুকুই তাঁদের পত্রাবলী। বলি বলি করেও তাঁরা আর কিছুই লিখে বলতে পারেন না। কিন্তু যাঁরা পারেন, তাঁদের জন্য রয়েছে সমস্ত পৃথিবী। এই ভুবনই তাঁদের নিজস্ব ভবন। অবশ্য তাঁদের একজন উপযুক্ত জুড়ি চাই। যিনি এ চিঠির দোয়ারকি দেবেন। শুধু ইয়ার্কি নয়, একজনের কথা আরেকজনের কথকতা হয়ে উঠবে। জীবনের অন্যতম অলৌকিক ঘটনা হল কোনো লৌকিক চিঠি। চিঠি পাওয়ার অপেক্ষায় থেকে থেকেই প্রাণ চলে গিয়েছিল অমলের, চিঠি পায় বলেই আজো বেঁচে আছে বিমল আর কমল।

যিনি আড্ডা দিতে পারেন, এখন তো তাঁরই চাহিদা। যিনি শুধু কাজ করেছেন, চোখ রাঙিয়েছেন, আজ তাঁর বলার মতো কোনো কথা নেই। অথচ জীবনের সব কাজেই যাঁর উদ্যম, এখন তো হরদম তাঁরই কথা বলা।

এই সবই শিখে নিতে হবে। শুধু ধরা নয়, ছাড়াও শিখতে হয়। মহাভারতে যুধিষ্ঠির যা পেরেছিলেন, সারা ভারতে তা কেউ পারে না। আমি একজন মহিলাকে দেখেছিলাম, যিনি চুটিয়ে সংসার করেছেন। যখন তাঁর স্বামী চলে গেলেন, তিনি সরে এলেন বাড়ির নিভৃত ঘরটিতে। ঘরের চাবি ফেলে দিলেন, কারণ শেষ জীবনের অশেষ চাবিকাঠি তাঁর পাওয়া হয়ে গিয়েছে।

অবসরেই জীবনের সরটুকু ভাসছে। তাকে স্বাদু করে তোলাই হল জীবনের শেষ শিক্ষা। এজন্য অভ্যাস শুরু করতে হবে আগেই। এতদিন কাজ করেছেন, বাঁচেননি কখনো।

কেউ যদি নির্দোষ পরচর্চা করেন, আপত্তি নেই। এই পরচর্চায় কোন খর্চা

নেই। কেবল অভ্যাসে যাতে মরচে না পড়ে তাই একটু সত্যান্বেষণ। যা কেউ জানে না, তা আমি জানি, এইটুকুই এর মজা।

অবশ্য অবসর কাটাবার ভাল উপায় হল প্রেমে পড়া। এতদিন পরে প্রেমের শক্তিতে সত্যিই বিশ্বাস হবে আপনার। দীর্ঘদিন সংসারের নানা দাবী মিটিয়েও স্ত্রীর সব প্রত্যাশা আপনি পূরণ করতে পারেননি, নিজেকে কেমন ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। এমতাবস্থায় নতুন কোনো প্রেম আপনাকে চাঙ্গা করে তুলবে, মনে হবে জীবনটা নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি। এখন আর অল্প বয়সের উন্মাদনা নেই, কোনো পরিণতির জন্য নেই ব্যস্ততা, শুধু আছে অনুভবের তৃপ্তি। ছোটবেলায় যে মেয়েটির প্রতি দুর্বল ছিলেন, দেখবেন হয়তো সে আপনার সব খোঁজই রাখে এখনো।

আর আপনি যদি স্ত্রীলোক হন, তাহলে স্বামীকে কেমন বামন হয়ে যেতে দেখছেন—এখন যদি কাউকে পান, যার কাছে আপনার সব কথাই নির্দেশতুল্য এবং সব নির্দেশই অবশ্য পালনীয়, তাহলে নতুন করে আবার আপনি কিশোরী হয়ে উঠতে পারবেন।